স্বাধীনতার

রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা

চার টাকা

নিবেদন

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের নিবেদনে যাহা বলা হইয়াছে, বর্ত্তমান দ্বিতীয় খণ্ডেরও মূল বক্তব্য তাহাই। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সশস্ত্র দিকটাই এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য—নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিষয় অপেক্ষাকৃত গৌণ; কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামের সামগ্রিক গতি ও ধারার পর্য্যালোচনায় যাহাতে বিঘ্ন-সৃষ্টি না হয়, সে জন্য বিপ্লবান্দোলনের সঙ্গত পরিপূরক অংশ হিসাবে প্রকাশ্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিষয়ও যথাস্থানে আবশ্যকমত আলোচনা করা হইয়াছে।

এই সশস্ত্র সংগ্রামে যাঁহারা লিপ্ত ছিলেন এবং আপনাদের জীবনদান করিয়া যাঁহারা আমাদিগকে স্বাধীনতার সুখাস্বাদনে সমর্থ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ যতদূর সম্ভব বিশদভাবে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, যাঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে লেখা হইয়াছে, তাঁহাদের অধিকাংশেরই জীবন-কাহিনী তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই বিবৃত হইয়াছে। ইতি—

কলিকাতা,
২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭।

বিনীত
শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য



পাঠ-নির্দ্দেশ

বিক্ষুব্ধ ভারত

দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে—
প্রস্তুত হ'তেছে ঘরে ঘরে।

—রবীন্দ্রনাথ

ভারত-শাসন আইন—১৯১৯

প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবাসীরা অর্থ ও লোকবল দ্বারা বৃটিশের সাহায্য করিয়াছিল এবং আশা করিয়াছিল যে, ইহার বিনিময়ে যুদ্ধশেষে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে। ভারতবাসীদিগকে কতটুকু ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়, সে সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য ১৯১৭ সালের ১০ই নভেম্বর ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু দলবলসহ ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। ভারতীয় অবস্থা পর্য্যালোচনান্তে এই দেশের শাসন-ব্যবস্থায় কতকগুলি আবশ্যক পরিবর্ত্তনাদির বিষয়ে সুপারিশ করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। ১৯১৮ সালের ২৩শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মিঃ মণ্টেগু ভারতে ছিলেন এবং নূতন শাসন-তন্ত্র সম্পর্কে তিনি যে রিপোর্ট দাখিল করেন—তাহা ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ও তৎকালীন বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের স্বাক্ষরযুক্ত এই রিপোর্ট মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট নামে অভিহিত। এই রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়াই ১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের জন্য এক নূতন শাসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইল। ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার ব্যাপারে এই আইনে কিন্তু বিশেষ কিছুই সুবিধা হইল না।

রৌলট আইন

ভারতে যে বিপ্লবান্দোলন বিস্তৃত হইতেছিল—ভারত-সরকার তাহাতে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধকালে দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রচুর ক্ষমতা দিয়া ভারতরক্ষা-আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সকলের বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধকালীন জরুরি

অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার জন্যই মাত্র আইনটি রচিত হইয়াছে ; কিন্তু একবার রক্তের আস্বাদ পাইলে নেকড়ে বাঘ যেমন আরও লোলুপ হইয়া উঠে, তদ্রূপ ভারত-রক্ষা আইনের সুবিধা কয়েক বৎসর ভোগ করিবার পর ভারত-সরকারের দমনপ্রিয়তাও যেন অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ভারতরক্ষা-আইনের কতকগুলি ধারাকে স্থায়ী করিবার জন্য তাঁহারা আর একটি নূতন দমনমূলক আইন বিধিবদ্ধ করিবার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিপ্লবান্দোলনের প্রকৃতি নিরূপণ এবং উহা দমনকল্পে কি কি ক্ষমতা সরকারের হস্তে থাকা প্রয়োজন—তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ১৯১৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর একটি কমিটি গঠিত হইল। উক্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইলেন লণ্ডনের King's Bench Division-এর জজ মিঃ রৌলট এবং তাঁহারই নামানুসারে উক্ত কমিটির নাম হইল রৌলট কমিটি। নভেম্বর মাসে মিঃ মণ্টেগুকে ভারতবর্ষ-এ প্রেরণের পশ্চাতে বৃটিশের যে প্রকৃতপক্ষে কোন আন্তরিকতা বা শুভেচ্ছা নাই, তাহা ডিসেম্বর মাসে রৌলট কমিটি গঠনেই প্রকট হইয়া উঠিল। উপরন্তু ১৯১৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতীয় আইন-সভায় বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ঘোষণা করিলেন যে, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হইবে।

১৯১৮ সালের ১৫ই এপ্রিল রৌলট কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিলেন এবং তাহাতে ভারতরক্ষা-বিধানের বহু ধারা স্থায়ী করিয়া একটি ব্যাপক আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা হইল। সেই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ্চ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি আইন সরকারী সদস্যদের ভোটাধিক্যে পাশ করাইয়া লওয়া হইল—উহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ... করা হইল না। আইনটির নাম হইল রৌলট আইন। কোনও ব্যক্তিকে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করিবার ও তাহাকে নির্ব্বাসন দিবার

ক্ষমতা এই আইনে সরকারকে দেওয়া হইল এবং জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার অধিকার ইহার দ্বারা খর্ব্ব করা হইল; কোনও অঞ্চলকে আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গকারী ঘোষণা করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদের প্রতি তদনুরূপ আচরণ করিবার অধিকারও গভর্ণমেণ্ট এই আইনের বলে প্রাপ্ত হইলেন। আরও নানাবিধ কঠোর দমন-ব্যবস্থা আইনটির মধ্যে রহিল। আইনটির মেয়াদ অবশ্য তিন বৎসর হইবে বলিয়া



লোহার সিঁড়ির সহিত হাত-পা বাঁধিয়া কাসুর রেল ষ্টেসনে
জনৈক ব্যক্তিকে কষাঘাত করা হইতেছে

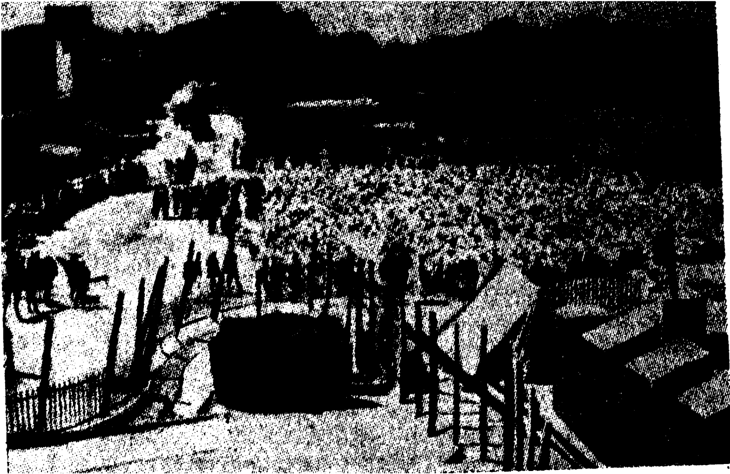
ব্যবস্থা হইল। এইরূপ আইন পাশ হওয়ার প্রতিবাদে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, জনাব মহম্মদ আলি জিন্না প্রভৃতি নেতৃগণ ভা[illegible] ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন শাসন-সংস্কার আইন পাশ হওয়ার পূর্ব্বেই এই আইনটি পাশ হওয়ায় ভারতীয়-গণের হস্তে ক্ষমতা-হস্তান্তর সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছায় সকলের যৎপরোনাস্তি সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং সকলেই পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিল যে, নূতন আইনেও ভারতীয়গণের স্বাধীনতার পথে বিশেষ কোনও অগ্রগতি সাধিত হইবে না। রৌলট আইন ভারতীয়গণের চরম লাঞ্ছনা এবং ইহা তাহাদিগের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তাই এই আইনের বিরুদ্ধে ভারতে শীঘ্রই তীব্র গণ-বিক্ষোভ দেখা দিল। যুদ্ধের পর নিজেদের দেশ শাসনের জন্মগত অধিকার লাভের সুখময় স্বপ্নে ভারতীয়গণ যখন আনন্দে বিভোর, তখন ইংরাজগণ নিজেদের প্রতিশ্রুতির অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদিগের অধীনতার নাগপাশ আরও দৃঢ় করিবার ব্যবস্থা করিল। অনাবশ্যক রূঢ় আঘাতে ভারতীয়গণ তাহাদের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে হইল সচেতন এবং বুঝিল যে, যুদ্ধের সময়কার অবস্থা ও তাহার পরবর্ত্তী অবস্থা এক নহে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও কিন্তু বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয়গণেরও মানসিক অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যে বিপ্লবান্দোলন দমনকল্পে আইনটি মুখ্যতঃ রচিত, সেই বিপ্লবান্দোলন তৎকালে আপনা হইতেই স্তিমিত হইয়া পড়ায়, উহা দমনের জন্য ঐরূপ কঠোর আইন নূতন করিয়া প্রণয়নেরও কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

কংগ্রেসে এই সময় বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। ছয় বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া ১৯১৪ সালে তিলক মুক্তিলাভ করেন এবং ১৯১৫ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও এই সময় কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন এবং লালা লাজপৎ রায়ও আবার ফিরিয়া গেলেন কংগ্রেসে। ১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসে বোম্বাই-এ সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসের

একটি বিশেষ অধিবেশনের অনুষ্ঠান হইল এবং উহাতে রৌলট কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপিত হইল।

কিছুদিন ধরিয়াই দেশে পুনরায় প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন মাথা তুলিতেছিল। ১৯১৬ সালে মিসেস্ এনি বেসাণ্ট এবং তিলকের প্রচেষ্টায় "হোমরুল লীগ" স্থাপিত হইয়া দেশে প্রচার করিতেছিল স্বরাজের আদর্শ। এই স্বরাজ-আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করায় গভর্ণমেণ্ট সচকিত



সন্দেহভাজন লোকদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য কাসুর-এ নির্মিত খোঁয়াড়। ইহার উপরে কোনও আবরণ ছিল না এবং বাহির হইতে জনসাধারণ ভিতরের আবদ্ধ লোকগুলিকে দেখিতে পাইত

হইয়া উঠিলেন। তিলক ও বিপিন পালের দিল্লী ও পাঞ্জাব-প্রবেশ এবং মিসেস্ এনি বেসাণ্টের বেরার ও মধ্যপ্রদেশ-প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। শেষ পর্য্যন্ত ১৯১৭ সালের ১৬ই জুন মিসেস্ এনি বেসাণ্ট, বি, পি, ওয়াদিয়া ও

জি, এস্, এরাণ্ডেলকে করা হইল অন্তরীণ। জনসাধারণ সভা-সমিতি করিয়া দেশের সর্ব্বত্র এই দমন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। অবশেষে মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারত-শাসনের ভবিষ্যৎ নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে যে ঘোষণা করেন, তাহার প্রতি ভারতীয়দিগের অনুকূল মনোভাব পোষণের পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য সঙ্গীদ্বয়সহ বেসাণ্টকে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকেই মুক্তি প্রদান করা হয়।

ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মাজীর প্রবেশ

ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর প্রবেশ এই সময় ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘ বিশ বৎসরকাল সত্যাগ্রহ-আন্দোলন পরিচালিত করিয়া মহাত্মা গান্ধী ১৯১৫ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিহারের চম্পারণ জেলায় যে সামান্য কয়জন নীলকর তখনও অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের অত্যাচারে এই সময় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। আবেদনের দ্বারা ফল না হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী ১৯১৭ সালে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত করেন। তখন কর্ত্তৃপক্ষ মহাত্মা গান্ধীসহ কয়েকজনকে লইয়া একটি কমিশন গঠন করিতে বাধ্য হইলেন এবং উক্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আইন করিয়া নীলকরদিগের অত্যাচার বন্ধ করা হইল। গুজরাটের খেড়া জেলার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাদের খাজনা মকুব করাইবার জন্য ১৯১৮ সালে গান্ধীজী পুনরায় সত্যাগ্রহ পরিচালিত করিয়া সাফল্যলাভ করিলেন। ভারত-সরকার যখন রৌলট আইন পাশ করাইতে বদ্ধপরিকর, তখন ১৯১৯ সালের ১লা মার্চ্চ মহাত্মাজী ঘোষণা করিলেন যে, উক্ত আইনটি গৃহীত হইলে তিনি উহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন সুরু করিবেন।

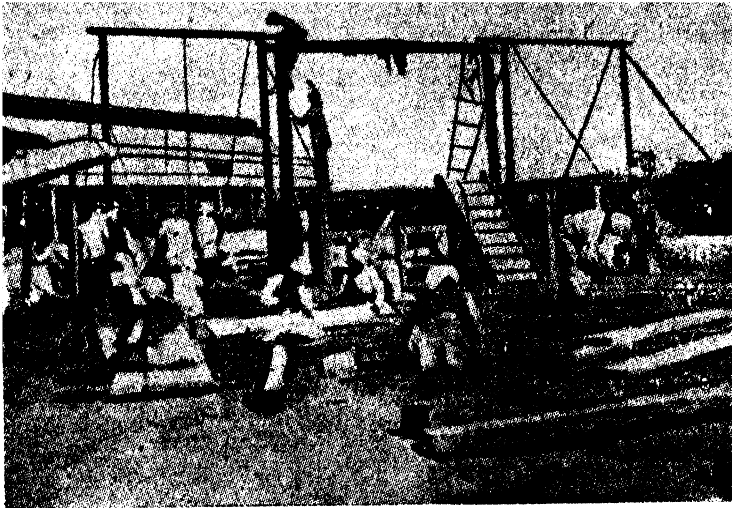
রৌলট আইনের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ

যাহা হউক, জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধেই সরকারী সদস্যদের ভোটাধিক্যে রৌলট আইন পাশ হইয়া গেল। মহাত্মাজী তখন বোম্বাই-এ সত্যাগ্রহ-সভা গঠন করিয়া বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ৩০শে মার্চ্চ সকল স্থানে হরতাল পালনের জন্য এক আবেদন জানাইলেন। হরতাল পালনের তারিখ পরে পরিবর্ত্তিত করিয়া ৩০শে মার্চ্চের স্থলে ৬ই এপ্রিল নির্দ্দিষ্ট হইল। এই হরতাল পালনের জন্য গান্ধীজীর আহ্বানে সমগ্র ভারতবর্ষ সাড়া দিল আশাতীতভাবে। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে সারা ভারতব্যাপী প্রকাশ্য গণ-আন্দোলন এই সময় হইতেই সুরু হইল।

তারিখ পরিবর্ত্তনের সংবাদ কিন্তু সকল স্থানে সময়মত পৌছিল না। সেই জন্য দিল্লী ও পাঞ্জাবের কোনও কোনও স্থানে ৩০শে মার্চ্চও হরতাল পালিত হইল। উক্ত দিনে প্রায় পঁচিশ হাজার মুসলমান দিল্লীর জুম্মা-মসজিদে সমবেত হইয়া নমাজ পাঠ করিলেন এবং নমাজ শেষ হইলে তাঁহাদের আহ্বানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ঐ মসজিদে গিয়া হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সত্যাগ্রহ সম্পর্কে বক্তৃতা দান করিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সময়ে যে অভূতপূর্ব্ব ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা দেখিয়া বৈদেশিক শাসকবর্গও বিচলিত হইয়া পড়েন। বক্তৃতা শেষে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এক বিরাট্ শোভাযাত্রা দিল্লীর বড় বড় রাজপথগুলি পরিভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হয়। শোভাযাত্রা সম্পূর্ণরূপে শান্তই ছিল। পুলিশ কিন্তু সেই শান্ত শোভাযাত্রার উপরই চালাইল গুলি, যাহার ফলে বহু লোক সাংঘাতিকভাবে আহত হইল।

ইহার ফলে সেই বিরাট্ ক্ষুব্ধ জনতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। সেই ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত করিতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়।

৬ই এপ্রিল ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে হরতাল প্রতিপালিত হইল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পাঞ্জাব হইতে যে জঘন্য উপায়ে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহাতে কর্তৃপক্ষের উপর তথাকার জনমত বিরূপ হইয়াই ছিল; সুতরাং পাঞ্জাবের হরতাল হইল সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত। এই হরতাল পালনের কয়েকদিন পরেই যে রাম-নবমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ডাঃ কিচলু এবং ডাঃ সত্যপালের চেষ্টায় অমৃতশহরের হিন্দু ও



কাসুর-এ নির্ম্মিত ফাঁসি-কাঠ

মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই আনন্দের সহিত যোগদান করেন। সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া পাঞ্জাবের কুখ্যাত গভর্ণর সার মাইকেল ও'ডায়ার প্রমাদ গণিলেন। রৌলট আইনের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনই তিনি কঠোর হস্তে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

৯ই এপ্রিল পুলিশ ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সফিউদ্দীন কিচলুকে গ্রেপ্তার করিয়া পরদিনই অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করিল। প্রিয় জননেতাদ্বয়ের এই গ্রেপ্তারের সংবাদ যখন দ্রুতগতিতে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল—তখন জনসাধারণের চিত্ত হইয়া উঠিল অতিশয় চঞ্চল। ১০ই এপ্রিল অমৃতশহরের সর্ব্বত্র ইহার প্রতিবাদে হরতাল পালিত হইল। হাজার হাজার নর-নারী উক্ত দিবসে শহরের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইয়া তথা হইতে এক বৃহৎ শোভাযাত্রা বাহির করিল। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ—তিনটি সম্প্রদায়ই যোগদান করিয়াছিল এই শোভাযাত্রায়। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারে শোকের চিহ্ন-স্বরূপ শোভাযাত্রীদের মস্তক ছিল অনাবৃত এবং পদ নগ্ন। নেতাদ্বয়ের মুক্তির দাবী জানাইবার উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রাটি ডেপুটি কমিশনারের আবাসগৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

পুলিশ শোভাযাত্রার গতিরোধ করিল মাঝপথেই। জনতা পুলিশের বাধা মানিতে চাহিল না। ইহার ফলে সেই শান্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ শোভাযাত্রীদের উপর দুইবার গুলিবর্ষণ করিল। গুলিবর্ষণের পর জনগণ আর শান্ত রহিল না—নিমেষে অন্তর্হিত হইল তাহাদের সকল শৃঙ্খলা ও সংযম। তখন আরম্ভ হইল অপমানিত ও আহত জনতার ভয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলা। ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত জনগণ কতকগুলি সরকারী কার্য্যালয় ও ব্যাঙ্ক-এ অগ্নিপ্রদান করিল ও ইংরাজদের উপর চড়াও হইয়া কয়েকজনকে নিহত করিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড

১১ই এপ্রিল শহরে সৈন্য মোতায়েন করিয়া শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইল জেনারল ডায়ারের উপর। সকল প্রকার সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া ১২ই তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইল বটে, কিন্তু

অধিকাংশ লোকই এই ঘোষণার বিষয় কিছুই জানিতে পারিল না। ইতিমধ্যেই ১৩ই তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগে নেতৃদ্বয়ের মুক্তির দাবীতে একটি সভা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল ; সুতরাং নির্দ্দিষ্ট তারিখে অপরাহ্ণে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ লইয়া গঠিত দশ সহস্রাধিক লোকের এক জনতা—যাহারা উক্ত বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই—ঐ সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত হইল।

জালিয়ানওয়ালাবাগ একটি ক্ষুদ্র বাগান—প্রায় চতুর্দ্দিকেই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহার ভিতরে যাইবার ও বাহিরে আসিবার জন্য একটি মাত্র প্রশস্ত ফটক আছে। উক্ত ফটক দিয়া এক সঙ্গে দুই তিন জনের অধিক লোক ভিতরে যাইতে বা বাহিরে আসিতে পারে না। অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় সভারম্ভের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও বহু পূর্ব্ব হইতেই নর-নারীতে সভাস্থল পূর্ণ হইয়া গেল।

সভা আরম্ভের অল্প পূর্ব্বে জেনারল ডায়ার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যদল লইয়া সহসা আসিয়া আবির্ভূত হইলেন এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার জন্য সামান্য কয়েক মিনিট মাত্র সময় দিলেন। সকলে তাঁহার আদেশের বিষয় জানিতেও পারিল না এবং ঐ অল্প সময়ের মধ্যে সকলের সেই অপ্রশস্ত পথ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়াও সম্ভব ছিল না। ডায়ার কিন্তু সে সকল বিষয় বিবেচনার মধ্যেও আনিলেন না। বাগের অভ্যন্তরস্থ উচ্চ স্থান হইতে তিনি সৈন্যগণকে জনতার প্রতি গুলিবর্ষণের আদেশ দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবল গুলিবর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল। যাতায়াতের যে একটিমাত্র প্রশস্ত ফটক ছিল—উহা লক্ষ্য করিয়াই সৈন্যদল গুলি চালাইতে লাগিল—যেন জনতা ছত্রভঙ্গ করা অপেক্ষা নরহত্যা করাই প্রধান উদ্দেশ্য। নিমেষমধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রবাহিত হইল রক্তের নদী। ভীত ও সন্ত্রস্ত নিরস্ত্র শান্ত জনতা পলায়নের পথ না পাইয়া ক্ষুদ্র বাগানটির

ভিতরেই ধাক্কাধাক্কি করিয়া গুলির আঘাতে অসহায়ের মত প্রাণ দিতে লাগিল। গুলিবর্ষণ তথাপি বন্ধ হইল না।

ডায়ার ক্ষান্ত হইলেন দশ মিনিট অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের পর। পরে তিনি অবশ্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"গুলি ফুরিয়ে না গেলে আমি সব শেষ ক'রে দিতাম ; মেসিনগান নিয়ে যেতে পারলে মেসিনগান চালাতাম।"

গুলিবর্ষণ সমাধা করিয়া ডায়ার সদলবলে প্রস্থান করিলেন—পশ্চাতে ফেলিয়া গেলেন মৃতদেহের স্তূপ, আর আহত ও রক্তমোক্ষণকারী মুমূর্ষু নরনারী। মৃতদেহগুলিকে অপসারিত করিবার অথবা আহতদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোনও ব্যবস্থাই করা হইল না। সারারাত্রি আহত জনগণ অন্ধকারে পড়িয়া গোঙাইতে লাগিল।

এই ঘটনায় আহত ও নিহতের যে সরকারী বিবরণ পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে জানা যায় যে, সেদিনের গুলিবর্ষণে নিহত হইয়াছিল ৩৭৯ জন ও সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছিল ১৫০০ জন। বে-সরকারী মতে নিহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০।

এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবার পর পাঞ্জাবের তৎকালীন গভর্ণর সার মাইকেল ও'ডায়ারের সেক্রেটারি টেলিগ্রাম করিয়া জেনারল ডায়ারকে জানাইলেন,—"আপনার কাজ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ; গভর্ণর বাহাদুর এর সমর্থন করছেন।"

পাঞ্জাবে ইংরাজ-সরকারের চণ্ডনীতি

এই অমানুষিক নির্ম্মম অত্যাচারের পরও পাঞ্জাবের জনগণ রেহাই পাইল না। ১৫ই এপ্রিল তারিখে লাহোর ও অমৃতশহরে এবং কয়েকদিন পরে আরও কয়েকটি অঞ্চলে সামরিক আইন জারি করা হইল। এ সম্বন্ধে

সংবাদপত্রে কোনও খবর প্রকাশ করা হইল নিষিদ্ধ এবং বাহিরের কোনও লোককে পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। বহির্জগৎ হইতে পাঞ্জাব রহিল সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া।

পাঞ্জাবের নানাস্থানে গোলমাল চলিতে লাগিল—গ্রেপ্তার করার কাজও চলিল পুরাদমে। লালা হরকিষণলাল ও রামভুজ দত্তচৌধুরীকে লাহোর হইতে নির্ব্বাসিত করা হইল। সি, এফ্, এণ্ডরুজ পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া ধৃত হইলেন এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য পাঞ্জাবে যাইবার চেষ্টা করিয়াও সফল হইলেন না।

সামরিক আইন জারি করার পর পাঞ্জাবে যে লোমহর্ষক অত্যাচার ইংরাজগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তাহা সভ্য জাতির ইতিহাসে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। পীড়ন-নীতির চরমতম কুৎসিত বীভৎস রূপ আত্মপ্রকাশ করিল। ছাত্র, শিক্ষক ও নেতৃবৃন্দ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন নির্ব্বিচারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগকে জোর করিয়া বৃটিশ পতাকা অভিবাদন করান হইতে লাগিল—একটি বিশেষ রাস্তায় জনসাধারণকে বাধ্য করা হইতে লাগিল হামাগুড়ি দিয়া যাইতে। উন্মুক্ত স্থানে জনগণকে বেত্রাঘাত করা, হাত-পা কোমর শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোককে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখা, একটা খোঁয়াড়ে বহু বন্দীকে একত্র আবদ্ধ করিয়া রাখা—ইত্যাদি জঘন্যতম পীড়ন-প্রণালী পাঞ্জাবে অনুসৃত হইতে লাগিল। মানুষকে জোর করিয়া টানিয়া নামানো হইল ইতর প্রাণীর পর্য্যায়ে।

দেশবাসীর লাঞ্ছনায় রবীন্দ্রনাথের উপাধি-ত্যাগ

নিজের দেশবাসীর এই লাঞ্ছনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেকেও সমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করিয়া ইহার প্রতিবাদে নিজের

"নাইট" উপাধি ত্যাগ করিয়া বড়লাটকে এক পত্র লিখেন। সেই পত্র-খানি একখানি ঐতিহাসিক দলিলের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"The time has come when badges of honour make our shame glaring in the incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn, of all special distinctions by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings."

একমাত্র তাঁহার এই তীব্র প্রতিবাদের ফলেই সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম পাঞ্জাবের ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট হইল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বহু অন্তরঙ্গ ইংরাজ বন্ধু তাঁহার এই আচরণের জন্য তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেন। পাঞ্জাবে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক আইন জারি করার প্রতিবাদে বড়লাটের শাসন-পরিষদের তৎকালীন একমাত্র ভারতীয় সদস্য সার চিত্তর শঙ্করণ নায়ারও পদত্যাগ করিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর দিল্লী ও পাঞ্জাব-প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি হইয়াছিল। দিল্লীর পথে তিনি ধৃত হইলেন এবং তাঁহাকে বোম্বাই-এ লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনিবা-মাত্র দিল্লী, আহমেদাবাদ ইত্যাদি স্থানে আরম্ভ হইয়া গেল দাঙ্গা-হাঙ্গামা। গান্ধীজী তখন আহমেদাবাদে গমন করিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় আবার সর্ব্বস্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। গান্ধীজী তখনকার মত তাঁহার সত্যাগ্রহ-আন্দোলন বন্ধ রাখিলেন।

পাঞ্জাবের অত্যাচার লইয়া সারা ভারতে যখন বিক্ষোভ উপস্থিত হইল, তখন সরকার পক্ষ অক্টোবর মাসে লর্ড হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত

কমিটি গঠন করিতে বাধ্য হইলেন। এই কমিটির তদন্তের ভরসায় না থাকিয়া কংগ্রেসের তরফ হইতে একটি পৃথক্ তদন্ত কমিটি গঠিত হইল।

কংগ্রেস-নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল ১৯২০ সালের ২৫শে মার্চ্চ। রিপোর্টে বলা হইল যে, পাঞ্জাবে এমন কোনও বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহার জন্য সামরিক আইন জারি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড, পাঞ্জাবের গভর্ণর সার মাইকেল ও'ডায়ার, জেনারল ডায়াবএবং আরও বহু ছোট-বড় কর্ম্মচারীকে পাঞ্জাবের অত্যাচারের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী করা হইল।

হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট বাহির হইল ১৯২০ সালের ২৮শে মে তারিখে। কমিটির দুইজন ভারতীয় সদস্য স্বতন্ত্র রিপোর্ট প্রদান করিয়া সামরিক আইন জারির যৌক্তিকতা অস্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তও রচিত হইল উহারই উপর ভিত্তি করিয়া। কমিটির অধিকাংশ সভ্য (ইংরাজ) কিন্তু সামরিক আইন জারির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন। তাঁহারাও অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, বৃটিশ-রাজের বিরুদ্ধে কোনও বিদ্রোহের ষড়্‌যন্ত্র পাঞ্জাবে হয় নাই এবং আফগান যুদ্ধের সহিতও ইহার কোনও যোগাযোগ ছিল না। অত্যাচারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যের মৃদু সমালোচনা তাঁহারা করিলেন এবং অধিকক্ষণ ধরিয়া গুলিবর্ষণ করিয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়াটা ডায়ারের পক্ষে উচিত হয় নাই—ইহাও স্বীকার করিলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারীদের দুষ্কৃতি যথাসম্ভব লঘু করিয়া দেখাইবার প্রয়াস তাঁহাদের এই রিপোর্টে সুপরিস্ফুট।

হাউস অফ কমন্স-এ পাঞ্জাব-সংক্রান্ত ব্যাপারের আলোচনায় ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব কেবলমাত্র বলিলেন যে, ডায়ারের গুরুতর বিচারবিভ্রম ঘটিয়াছিল। অবশ্য ডায়ারকে ভারত-সরকারের অধীন কোনও নূতন পদে আর নিযুক্ত করা হইবে না বলিয়া তিনি আশ্বাস দিলেন। ভাব দেখিয়া

মনে হইল, যেন তাঁহার এই ঘোষণার দ্বারাই ভারতবাসীর সকল ক্ষয়-ক্ষতির পূরণ হইয়া গেল এবং সকল ব্যাপারের সুমীমাংসা হইল! হাউস্ অফ কমন্স-এর ঐ সামান্য সহানুভূতিটুকুও কিন্তু অভিজাত হাউস অফ লর্ডস-সভা বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা হাউস্ অফ কমন্স-এর উক্ত সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং ডায়ারের কার্য্যাবলীর জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। ইংরাজ মহিলারাও ডায়ারের বীরত্বকে স্বীকার করিয়া লওয়ার ব্যাপারে পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন না। বিপুল উদ্যমে তাঁহারা তিন লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ তাহা ডায়ারকে উপহার দিলেন।

রৌলট আইন এবং পাঞ্জাবের লোমহর্ষক অত্যাচার আঘাত করিল জনসাধারণের মর্ম্মমূলে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের কোটি কোটি নরনারী আবার নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিল তাহাদের স্বাধীন সত্তাকে।

খিলাফৎ-আন্দোলন ও অসহযোগ-আন্দোলন

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে মিত্রশক্তি তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ করেন এবং তুর্কী সুলতানের উপর নানা অপমানজনক সন্ধি-সর্ত্তও আরোপ করেন। ইহারই ফলে ভারতীয় মুসলমান সমাজ হইলেন বিক্ষুব্ধ এবং খিলাফৎ-আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। ১৯২০ সালের ২৮শে মে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ-সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইতিপূর্ব্বেই গান্ধীজী নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এলাহাবাদ অধিবেশনে অসহযোগের অর্থ ও কার্য্যকারিতা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের সহিত একযোগে কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তা ভারতবর্ষের মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই সময় অনুভব করেন। ইহার ফলে জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাইল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অমৃতশহর অধিবেশনে পাঞ্জাবের অত্যাচার-অনাচারের নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে বৃটিশ-প্রস্তাব অসন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইল। কংগ্রেসের সহিত মুসলিম লীগেরও যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতেও উক্তরূপ প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে সূচনা করিল এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের। সরকারের সাহায্য ও আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে আত্মশক্তির উপর নির্ভরতাই অসহযোগের প্রধান কথা।

সরকারী বিদ্যালয়, আইনসভা, বিচার-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বর্জ্জনের বাণী লইয়া গান্ধীজী এই আন্দোলনের সূচনা করিলেন। মাদক-দ্রব্য ও বিদেশী পণ্য বর্জ্জন এবং স্বদেশী প্রচারের মন্ত্রে সমগ্র দেশ যেন প্রাণময় হইয়া উঠিল। প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স-এর ভারত-আগমন উপলক্ষে ১৯২১ সালের ২১শে নভেম্বর ঘোষিত হইল হরতাল। এই উপলক্ষে ঐদিন হইতে কয়েক দিন যাবৎ বোম্বাই-এ ভীষণ দাঙ্গা চলিতে লাগিল। দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে প্রায়োপবেশন করিতে হইল।

অর্ডিনান্স রচনা করিয়া এই সময় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, জওহরলাল প্রভৃতি নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হইলেন। মাহাত্মাজী সিদ্ধান্ত করিলেন বার্দ্দোলীতে প্রথম করবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিতে।

কিন্তু ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। উক্ত দিবসে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর জেলায় পুলিশের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত একদল

লোক চৌরীচৌরা নামক থানার একজন দারোগাকে একুশজন কনষ্টেবল-সহ অগ্নি-দগ্ধ করিয়া হত্যা করিল। অহিংসায় চির-বিশ্বাসী গান্ধীজী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য দেশ তখনও প্রস্তুত হয় নাই। ইহার ফলে, ১২ই ফেব্রুয়ারি বার্দ্দোলীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে বার্দ্দোলীতে করবন্ধ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল এবং গান্ধীজী তাঁহার অসহযোগ-আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

সন্ত্রাসবাদের পুনরাবির্ভাব

গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য যাঁহারা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের সময় তাঁহাদের অনেককে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সকল মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের অনেকে এবং এতদিন যাঁহারা আত্মগোপন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ কংগ্রেসের গণ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া পুনরায় কর্ম্মে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কম্যুনিষ্ট দল গঠন করিবার জন্য মানবেন্দ্রনাথ রায় এই সময় অবনী মুখোপাধ্যায়কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন এবং দেশের মধ্যে কম্যুনিষ্ট মতবাদও প্রচারিত হইতে থাকে। যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালেই সমগ্র ভারতে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সূচনা হয় এবং নানা গণ-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিপ্লবীরা যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছিলেন, গান্ধীজী উক্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করায় তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের মনে সৃষ্ট হইল তীব্র প্রতিক্রিয়ার। আন্দোলন দমনকল্পে কর্ত্তৃপক্ষ যে চণ্ডনীতির অনুসরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতেও দেশের আবহাওয়া পুনরায় বিষাক্ত হইয়া

উঠিল। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র (যিনি ১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পুলিশের গুলিতে হিজলী বন্দীনিবাসে প্রাণ দিয়া শহীদ হইয়াছেন) প্রভৃতির নেতৃত্বাধীন দলের দ্বারা দুইটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদিগেরও ইঁহাদের সহিত যোগাযোগ ছিল বলিয়া জানা যায়।

১৯২৩ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে বরেন্দ্র ঘোষ অন্য তিন জন সঙ্গীসহ অপরাহ্নকালে কলিকাতার শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিসে প্রবেশ করেন এবং পোষ্টমাষ্টার অমৃতলাল রায়ের নিকট অর্থ দাবী করেন। বিপ্লবীদিগের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র আর মুখে ছিল মুখোস। পোষ্টমাষ্টার ইতস্ততঃ করিলে তাঁহার প্রতি গুলি বর্ষিত হয় এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিপ্লবীদের পলায়ন-কালে পোষ্ট অফিসের দুইজন কর্ম্মচারী তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ার-এ গিয়া আগ্নেয়াস্ত্রসহ বরেন্দ্রকে ধরিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়।

বরেন্দ্রের বাসস্থান খানাতল্লাস করিয়াও পুলিশ দুইটি রিভলভার হস্তগত করে। ঘটনার মাত্র তিনমাস পূর্ব্বে বরেনের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ পায়।

হাইকোর্টে বিচারের সময় বরেন্দ্র দোষ স্বীকার করেন এবং তৎকাল-প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সে ক্ষেত্রে তাঁহার দ্বীপান্তর দণ্ড হওয়াই উচিত ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে পর্য্যাপ্ত প্রমাণও ছিল না; কিন্তু বিচারপতি মিঃ পেজ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ইহার পর হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে পুনর্বিচারে এবং প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করিয়াও কোন ফল হইল না। শেষ পর্য্যন্ত রাজানুকম্পায় তাঁহার প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

এই ঘটনার পর সন্তোষ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজনের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র

মামলা খাড়া করা হয়, কিন্তু জুরিরা অভিযুক্তদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত করায় জজ শ্রী এস্, কে, ঘোষ তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করেন। আসামী-দের পক্ষে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি মামলা পরিচালিত করিয়াছিলেন।

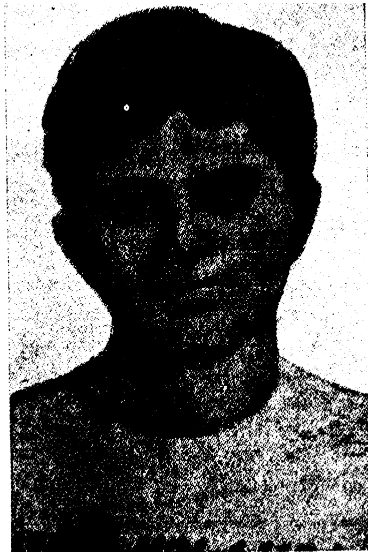
১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন-বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র দত্ত, জ্যোতিষ ঘোষ প্রভৃতিকে ১৮১৮ সালের ৩নং আইনে আটক করা হইল।

গোপীনাথ সাহা

দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড সাধিত করিলেন বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা। মিঃ আর্নেষ্ট ডে নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ মেসার্স কিলবার্ণ এণ্ড কোম্পানিতে কাজ করিতেন। তিনি বাস করিতেন লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত লর্ডস বোর্ডিং হাউসে। প্রতিদিনের ন্যায় ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখে তিনি সকাল বেলা যথারীতি প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া যখন চৌরঙ্গীতে হল এণ্ড এণ্ডার্সনের দোকানের সম্মুখে শো-কেসে জিনিষপত্র দেখিতেছিলেন, তখন অতর্কিতভাবে গোপীনাথ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। চার্লস টেগার্ট বলিয়া ভুল করিয়াই গোপীনাথ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গুলিতেই মিঃ ডে সংজ্ঞা হারাইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন, কিন্তু গোপীনাথ তথাপি ক্ষান্ত হইলেন না। উপর্য্যুপরি আরও কয়েকটি গুলি তিনি সাহেবটির উপর বর্ষণ করিলেন। মোট সাতটি গুলি মিঃ ডে-র শরীরে বিদ্ধ হইয়াছিল।

গুলিবর্ষণ শেষ হইলে গোপীনাথ পার্ক ষ্ট্রীট ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। জনৈক ট্যাক্সি-চালক ট্যাক্সি লইয়া তাঁহার অনুসরণের চেষ্টা করিলে তিনি

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার উপরও গুলি চালাইলেন। গুলি তাহার তলপেট ভেদ করিয়া গেল। পার্ক ষ্ট্রীট ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে গোপীনাথ একখানি মোটরগাড়ী দেখিতে পাইলেন এবং গাড়ীর চালককে বলিলেন—তাঁহাকে লইয়া ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটের দিকে গাড়ী হাঁকাইতে। গাড়ীর চালক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় তিনি তাহার উপরও গুলি চালাইলেন। ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে একজন দরোয়ান তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়া আহত হইল।



গোপীনাথ সাহা

ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট ও রিপণ ষ্ট্রীট যেখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেখানে আসিয়া গোপীনাথ একখানা গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। মিঃ এ, ডব্‌লিউ, অগ্‌ নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার হাতে

আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়া এই সময় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কয়েকজন কনষ্টেবলও আসিয়া এই ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিল। গোপীনাথের শরীর তল্লাসী করিয়া পাওয়া গেল—একটি মশার পিস্তল, একটি পাঁচঘরা রিভলভার, কতকগুলি কার্তুজ এবং কার্তুজের খোল।

ঘটনার দিনেই অপরাহ্নে মিঃ ডে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রাণত্যাগ করিলেন। অপর যে দুই ব্যক্তি আহত হইয়াছিল, তাহাদেরও অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখিয়া তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল।

মিঃ ডে-র মৃত্যুতে কলিকাতার সাহেব মহলে রীতিমত উত্তেজনার সঞ্চার হইল। এম্পায়ার থিয়েটারে ১৯ই জানুয়ারি কলিকাতার ইউরোপীয় এবং এংলো-ইণ্ডিয়ান অধিবাসীদের এই উপলক্ষে এক প্রতিবাদ-সভা হইল এবং বক্তৃতাও দেওয়া হইল তীব্র ভাষায় এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়া। একটি প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে কোনও আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া দৃঢ় থাকিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইল এবং গভর্ণমেণ্টের উক্ত অনমনীয়তার নীতিতে ইউরোপীয় ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হইল।

মিঃ রক্সবার্গ তখন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার এজলাসে ১৪ই জানুয়ারি গোপীনাথের মামলা উঠিল। মিঃ ডে-কে ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা এবং অপর তিনজন ভারতীয়কে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত হইল। গোপীনাথকে আদালতে হাজির করা হইল কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায়। পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু সরকার পক্ষে মামলার উদ্বোধন করিলেন। গোপীনাথের পক্ষে কোনও আইনজীবী দণ্ডায়মান হন নাই। গোপীনাথ নিজেই মধ্যে মধ্যে সাক্ষীদের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামপুরে গোপীনাথ যে বাড়ীতে বাস করিতেন—মণিমোহন দাস

ছিলেন সেই বাড়ীরই একজন ভাড়াটিয়া। তাঁহার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, গোপীনাথের পিতার নাম বিজয়কৃষ্ণ সাহা, গোপীনাথরা চার ভাই এবং তাঁহাদের জননী তখনও জীবিত। গোপীনাথ তাঁহার ভ্রাতা শ্যামাচরণের সহিত শ্রীরামপুরের ক্ষেত্রমোহন সাহা লেনে বাস করিতেন এবং শ্যামাচরণই তাঁহার ভরণপোষণ করিতেন। শ্রীরামপুরের ইউনিয়ন ইন্‌ষ্টিটিউটে নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত গোপীনাথ পড়াশুনা করিয়াছিলেন।

ডেপুটি কমিশনার মিঃ বেভিন-এর সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইল যে, শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিসে হানা দেওয়ার সময় যে রকমের কার্ত্তুজ ব্যবহৃত হইয়াছিল, গোপীনাথের নিকট হইতে প্রাপ্ত কার্ত্তুজও তাহারই অনুরূপ।

আদালতে যখন মামলার শুনানি চলিত, তখন গোপীনাথ বসিয়া থাকিতেন নির্ব্বিকারভাবে চুপ করিয়া। তাঁহারই বিরুদ্ধে যে হত্যার অভিযোগে মামলা চলিতেছে, তাহা তাঁহার হাব-ভাব দেখিয়া বুঝা যাইত না। তুচ্ছ সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিল না। টেগার্ট সাহেবকেও শুনানির সময় আদালতে আসিতে হইয়াছিল। সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ সমাপ্ত হইলে গোপীনাথ আদালতে এক বিবৃতি দিলেন। সে বিবৃতি যেমন নির্ভীক—তেমনই চাঞ্চল্যকর।

গোপীনাথ তাঁহার বিবৃতিতে পাবলিক প্রসিকিউটরের উক্তির প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বেও লালবাজারে ঘুরাফিরা করিতে দেখা গিয়াছে এবং একজন লোকের সহিত বহুবাজারের কোন একটি বাড়ীতে পুলিশ তাঁহাকে একদিন প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে—পাবলিক প্রসিকিউ-টরের এই উক্তি সত্য নয় বলিয়া তিনি জানাইলেন। তিনি বলিলেন, সকল সময় তিনি একাই বাহির হইতেন এবং সর্ব্ব সময়ই টেগার্ট সাহেবকে নিহত করার জন্য তাঁহার লক্ষ্য থাকিত (এই কথাগুলি বলিবার সময় তিনি কঠোর

দৃষ্টিতে আদালতে উপস্থিত মিঃ টেগার্টের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের হাস্য করিলেন)। গোপীনাথ জানাইলেন, টেগার্ট সাহেবকে তিনি খুব ভাল-ভাবেই চিনিতেন, কিন্তু টেগার্টেরই মত দেখিতে এক নিরপরাধ ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে। টেগার্ট সাহেব পরিত্রাণ পাওয়ায় তাঁহার দেশের একজন শত্রুকে নিপাত করিতে না পারার জন্য তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে তিনি এই আশা ব্যক্ত করিলেন যে, যদিও তাঁহার ভুল হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশের মধ্যে অন্য কোনও দেশ-প্রেমিক যুবক থাকিলে তাহার দ্বারা তাঁহার অসম্পন্ন কার্য্য অধিকতর দক্ষতার সহিত নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হইবে।

শুনানির পর গোপীনাথের মামলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক হাইকোর্টের দায়রায় প্রেরিত হইল। তাঁহার রায় শ্রবণ করিয়া গোপীনাথ পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বিচারপতি পিয়ার্সনের এজলাসে হাইকোর্টে ১১ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার মামলার পুনরায় শুনানি আরম্ভ হইল।

গোপীনাথের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিম্ন আদালতে কোনও আইনজীবী না থাকার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হাইকোর্টের দায়রায় বিচারের সময় কয়েকজন আইনজীবী তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। তাঁহারা যুক্তি দেখাইলেন যে, যেহেতু গোপীনাথ সুস্থমস্তিষ্ক নন, সেহেতু তাঁহার বিচার চলিতে পারে না।

জুরি মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল আটজন ভারতীয় ও একজন ইউরোপীয় লইয়া। আসামী সুস্থমস্তিষ্ক কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার তখন জুরিদের উপর ন্যস্ত হইল। জুরিগণ গোপীনাথকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পরদিন সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রদান করিলেন যে, আসামী সম্পূর্ণ সুস্থমস্তিষ্ক। যাহা হউক, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়া গোপীনাথ জানাইলেন, তিনি নিরপরাধ। সরকার পক্ষের সওয়াল

জবাবের পর তিনি আদালতে এক বিবৃতি দিলেন। তাহাতে তিনি ঘোষণা করিলেন, টেগার্ট সাহেবকে তিনি বহুবার দেখিয়াছেন এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রসহ তিনি বহুবার তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন; এমন কি, একবার তিনি গুলিবর্ষণের জন্যও উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু মাতৃআদেশ না পাওয়ার জন্যই তিনি তখন গুলি করেন নাই। ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি অতিশয় মানসিক উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন। গৃহের মধ্যে আর থাকিতে না পারিয়া তিনি বাহির হইয়া গড়ের মাঠে উপস্থিত হন এবং চলিতে চলিতে বহুদূর অগ্রসর হইয়া যান। তারপর সহসা একজন সাহেবকে দেখিয়া তাঁহার টেগার্ট বলিয়া ধারণা জন্মে এবং তাঁহার উপরই তিনি গুলি নিক্ষেপ করেন। গোপীনাথ ইহাও জানাইলেন যে, জেলে জীবন যাপন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া যেন তদনুযায়ী তাঁহার প্রতি দণ্ডবিধান করা হয়। তিনি তাঁহার মাতার নিকট গমন করিতে উৎসুক।

আসামী পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইলে গোপীনাথকে যখন আসামীর কাঠগড়া হইতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, সেই সময় তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"টেগার্ট সাহেব হয় তো মনে করেন যে তিনি খুব নিরাপদ—কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়; আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয়ে থাকলেও আমার অসম্পূর্ণ কাজের ভার আমার দেশবাসীর ওপরই দিয়ে গেলাম।"

তাহার পরদিন—অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারি জুরিরা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিলেন। গোপীনাথকে তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে দোষী স্থির-করিয়াছিলেন। জজ জুরিদের অভিমত গ্রহণ করিয়া আদেশ দিলেন গোপীনাথের মৃত্যুদণ্ডের। সেদিনও কাঠগড়া হইতে লইয়া যাওয়ার সময় গোপীনাথ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমার

রক্তের প্রতি ফোঁটায় ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ রোপিত হোক।”

জেলে থাকিবার সময় কানাইলালের মত গোপীনাথের শরীরের ওজনও পাঁচ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও দুশ্চিন্তা ছিল না এবং হাসি তাঁহার মুখে লাগিয়াই থাকিত। আসন্ন মৃত্যুর জন্য যিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন—তাঁহার এত নিশ্চিন্তভাব আসে কি করিয়া, ইহা ভাবিবা সকলকে বিস্মিত হইতে হইত।

প্রেসিডেন্সি জেলে ১লা মার্চ্চ তারিখে গোপীনাথের ফাঁসি হইয়া গেল। শব-সৎকারের সুবিধা দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির চেষ্টায় শব-সৎকারের অনুমতি মিলিল, কিন্তু জেলের বাহিরে শবদেহ লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর হইল না। কর্ত্তৃপক্ষ জানাইলেন যে, জেলেব অভ্যন্তরে চারিজন আত্মীয় গিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ফাঁসির সময় জেল-গেটে উপস্থিত ছিলেন—ভিতবে প্রবেশের অনুমতি তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। ফাঁসি শেষ হওয়ার বহুক্ষণ পরে বেলা প্রায় সাড়ে আটটার পর গোপীনাথের আত্মীয়-দের জেলের মধ্যে যাইতে দেওয়া হইল। শব-সৎকারের পর গঙ্গায় নিক্ষেপ অথবা গয়ায় পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে নাভি বা অস্থি-গ্রহণ করিতে দেওয়া হইল না।

গোপীনাথের দেশপ্রেম এবং তাঁহার কর্ম্মপন্থার সমর্থনের ব্যাপার লইয়া বাংলার কংগ্রেসে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সিরাজগঞ্জে এই সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে গোপীনাথের কার্য্যের প্রশংসামূলক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়; কিন্তু গান্ধীজী উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন না করায় পর বৎসর ফরিদপুর অধিবেশনে উক্ত গৃহীত

প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গোপীনাথের প্রশংসাসূচক এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে অনেকগুলি ভোটও লাভ করিয়াছিলেন। গোপীনাথের নাম তখন সারা ভারতেই সাড়া তুলিয়াছিল।

চট্টগ্রামে এক ডাকাতির দ্বারা বিপ্লবীরা এই সময় ১৭ হাজার টাকা হস্তগত করেন এবং কলিকাতা ও ফরিদপুরে দুইটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়।

বিপ্লববাদকে বাংলা দেশে পুনরায় প্রসার লাভ করিতে দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। ইহার ফলে ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর অর্ডিনান্স জারি করিয়া ৬৩ জন বিপ্লবীকে করা হইল অন্তরীণ। সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও অনিলবরণ রায় ১৮১৮ সালের ৩ আইনে আটক হইলেন।

শ্রীরাম রাজুর বিদ্রোহ

এক তহশীলদারের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রীরাম রাজু এই সময় দক্ষিণ ভারতে এক বিদ্রোহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার দলবল-সহ তিনি কয়েকটি থানা আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করেন এবং বন্দুক প্রভৃতি হস্তগত করেন। গভর্ণমেণ্টের সহিত ছয়বার সংঘর্ষের পর অবশেষে ১৯২৪ সালের মে মাসে তিনি পরাজিত হন। গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, শেষবারের সংঘর্ষে রাজু নিহত হইয়াছেন; কিন্তু সেখানকার অনেকের বিশ্বাস এই যে, রাজু নিহত হন নাই—তিনি আত্মগোপন করিয়া আছেন মাত্র।

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা

বাঙ্গালী বিপ্লবীদের নেতৃত্বে যুক্তপ্রদেশেও পুনরায় এই সময় একটি শক্তিশালী গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছিল। রাসবিহারী বসুর ভারত-ত্যাগের পর ১৯১৫ সালে যে বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার সৃষ্টি হয়, তাহাতে অভিযুক্ত হইয়া বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্তির বিষয় ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার আইন প্রবর্ত্তনের সময় ১৯২০ সালে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি বাংলায় আসেন। কিছুদিন পরে তাঁহারই প্রচেষ্টায় যতীন দাস প্রভৃতির নেতৃত্বে দক্ষিণ কলিকাতায় একটি বিপ্লবী দল গঠিত হয়।

কিন্তু স্বয়ং শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নেতৃত্বে কাশী ও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরে যে নূতন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হইল, তাহাই হইয়া উঠিল সেই সময়কার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান। এই সমিতির আদর্শ ও গঠন-পদ্ধতি ইত্যাদির বিষয় বিবৃত করিয়া শচীন্দ্রনাথ যে শ্বেতপত্র সাধারণ্যে প্রচারিত করিলেন, তাহার ফলে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাঁকুড়ায় তাঁহার দুই বৎসরের কারাদণ্ড হইল। ইতিপূর্ব্বেই যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও ১৯২৪ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় অন্তরীণাবদ্ধ করা হইয়াছিল।

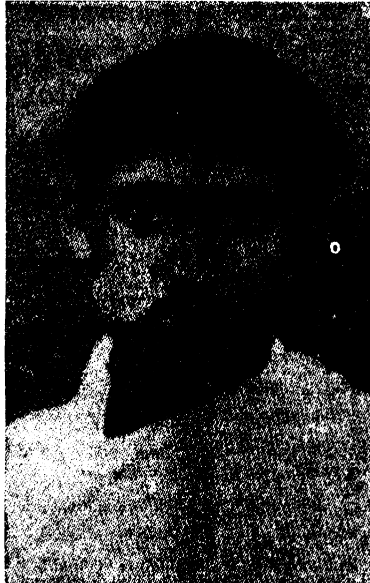
যাহা হউক, নূতন বিপ্লবী দলটি কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু কার্য্য চালাইয়া যাইবার ও অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য প্রয়োজন অনুভূত হইল অর্থের, সুতরাং স্বদেশী ডাকাতি পুনরায় আরম্ভ হইল। প্রথম ডাকাতি হইল ১৯২৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর পিলভিত জিলার অন্তর্গত রামরৌলি

গ্রামের বলদেও প্রসাদের গৃহে। এই অভিযানের সময় বলদেও আহত এবং আর এক ব্যক্তি নিহত হইল। অন্যান্য কয়েকটি ডাকাতিতেও কয়েকজন হইল হতাহত; কিন্তু এইভাবে অনুষ্ঠিত সব কয়টি ডাকাতি ও লুণ্ঠন-কার্য্যের মধ্যে কাকোরী ট্রেণ ডাকাতিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলপথে আলমনগর ষ্টেসনে ট্রেণ-ডাকাতি করিবার জন্য বিপ্লবীরা দুই দিন সমবেত হইয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হইলেন। ইহার পর পুনর্ব্বার প্রচেষ্টা হইল ১৯২৫ সালের ৯ই আগষ্ট। উক্ত রেলপথের ৮নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ তখন আলমনগরের পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেসন কাকোরীতে আসিত আনুমানিক সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময়। ঐ তারিখে উক্ত ট্রেণ কাকোরী ষ্টেসন ত্যাগ করিয়া আলমনগরের দিকে মাইলখানেক অগ্রসর হইবার পর বিপ্লবীরা শিকল টানিয়া ট্রেণের গতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ আগ্নেয়াস্ত্রসহ গার্ডের গাড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া একটি লোহার সিন্দুক বাহির করিয়া ফেলিলেন। কতকগুলি ষ্টেসন হইতে সংগৃহীত প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা ঐ সিন্দুকে রক্ষিত ছিল। বিপ্লবীরা সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু এই উপলক্ষে যে গোলমাল হইল তাহাতে বিপ্লবীদের গুলিতে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হইল।

এই সকল ডাকাতি ও লুণ্ঠন, বিস্ফোরক পদার্থ প্রাপ্তি এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যাল রচিত নানা প্রচারপত্র প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেণ্ট কয়েক-জনকে গ্রেপ্তার করিয়া যে মামলা দায়ের করেন—তাহাই কাকোরী ষড়্‌যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত। আসফাক্ উল্লা, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং শচীন্দ্র বক্সী ধরা না দিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। বিচারকার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুলিশের কঠোর উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনে দামোদরস্বরূপ জেলখানায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

আসামীগণ দায়রায় সোপর্দ্দ হইবার পর স্পেশ্যাল জজ মিঃ হ্যামিল্টনের আদালতে লক্ষ্ণৌ শহরে ১৯২৬ সালের ৩রা মে মামলার বিচার আরম্ভ হইল। এই সময় অভিযুক্তগণ তিন সপ্তাহকাল অনশন পালন করেন। মোকদ্দমায় দুইজন রাজসাক্ষী হয়। যাহা হউক, এই ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি শেষ হয় ১৯২৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি এবং রায় প্রদত্ত হয় ৬ই



অনন্তহরি মিত্র

এপ্রিল তারিখে। রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রৌসন সিং এবং রামপ্রসাদ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন; আর শচীন্দ্রনাথ সান্যালের প্রতি পুনরায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল। অন্যান্য কয়েকজনের হইল পাঁচ হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড।

আসফাক্ উল্লা এবং শচীন্দ্র বক্সী পরে ধরা পড়িবার পর স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের বিচার হইল। বিচারে আসফাক্ উল্লার প্রতি আদেশ হইল মৃত্যু দণ্ডের।

স্বল্প প্রমাণ এবং সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া যে চারি জনের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইল, সেই চারিজনের পক্ষ হইতে আপিল করা হইল লক্ষ্ণৌ-এর জুডিসিয়্যাল কমিশনার সার লুই ষ্টুয়ার্টের নিকট। পুনর্ব্বিচারেও মৃত্যুদণ্ডই বহাল রহিল। প্রিভিকাউন্সিল-এ আপিলের জন্য আবেদন মঞ্জুর হইল না।

১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর গোণ্ডা জেলে প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত চারিজনের ফাঁসি হইয়া গেল। ইহার ফলে বিপ্লবীদের সঙ্কল্প আরও দৃঢ়তর হইল।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা

১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি মীরাটে বিপ্লবীদিগের একটি গুপ্ত অধিবেশন হইয়াছিল এবং তাহাতে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীকে বাংলাদেশে বোমা তৈয়ারি শিখিবার জন্য পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। তদনুযায়ী কাকোরী ডাকাতিতে অংশ গ্রহণের পর রাজেন্দ্রনাথ ধৃত হইবার পূর্ব্বেই বাংলায় চলিয়া আসেন। কলিকাতায় শোভাবাজার ষ্ট্রীটে এবং দক্ষিণেশ্বরে দুইটি বাড়ীতে তখন কয়েকজন বিপ্লবী বোমা তৈয়ারির প্রণালী শিক্ষা করিতেন। ১৯২৫ সালের ১০ই নভেম্বর পুলিশ সংবাদ পাইয়া দক্ষিণেশ্বরের বাড়ীটি ঘেরাও করিয়া ফেলে এবং খানাতল্লাস করিয়া বিস্ফোরক পদার্থ, রিভলভার ও বোমা প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। সেই বাড়ী হইতেই রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, অনন্তহরি মিত্র প্রমুখ নয় জন বিপ্লবী ধৃত হইলেন। ইহার পর শোভাবাজারের বাড়ীটিও খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ

প্রাপ্ত হইল নাইট্রিক এসিড ইত্যাদি এবং একজন সঙ্গীসহ তথা হইতে গ্রেপ্তার করিল প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীকে।

দক্ষিণেশ্বরে বোমার কারখানায় ধৃত নয়জন বিপ্লবীর প্রতিই ১৯২৬ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখে দণ্ডাদেশ ঘোষিত হইল। রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, অনন্তহরি মিত্র প্রভৃতি তিন জনের হইল দশ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ড এবং অন্যান্য সকলের হইল দুই অথবা পাঁচ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড। রাজেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তখন কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা উপলক্ষে ওয়ারেণ্ট ঝুলিতেছিল। দক্ষিণেশ্বর মামলার বিচারের পরই কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁহার বিচারের জন্য তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে তাঁহার প্রাণদণ্ড প্রাপ্তি এবং ফাঁসি হইয়া যাওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শোভাবাজার বাটী হইতে ধৃত দুই জনেরও পাঁচ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

ভূপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণনাশ

রাজেন্দ্রনাথকে লক্ষ্ণৌ-এ পাঠাইয়া দক্ষিণেশ্বর ও শোভাবাজারের বাটী হইতে ধৃত এবং দণ্ডপ্রাপ্ত মোট এগারজন বিপ্লবীর অবশিষ্ট দশ জনকে রাখা হইয়াছিল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের বোমা ইয়ার্ডে। বোমা ইয়ার্ডের উত্তরদিকে যে ষ্টেট ইয়ার্ড ছিল, অন্তরীণে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীগণকে সেখানে রাখা হইত। গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের আশায় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই ষ্টেট ইয়ার্ডে মাঝে মাঝে যাতায়াত করিতেন। বিপ্লবীরা তাঁহার উপর তুষ্ট ছিলেন না। ১৯২৬ সালের ২৮শে মে তারিখে সন্ধ্যার অল্প পরে তিনি যখন ষ্টেট ইয়ার্ডে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া প্রস্থান করিবার জন্য ষ্টেট

ইয়ার্ডের বাহিরে আসিয়াছেন, অমনি বোমা ইয়ার্ডের কয়েকজন বিপ্লবী ওয়ার্ডারের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক চাবি কাড়িয়া লইয়া তদ্দ্বারা দরজা উন্মুক্ত করিয়া বাহির হইয়া আসেন এবং লৌহদণ্ডের আঘাতে ভূপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সেইখানেই নিহত করেন।

এই হত্যাকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া ১৯২৬ সালের ৯ই জুন আলিপুর ট্রাইব্যুন্যালে তিনজন বিচারকের নিকট দশ জনের পুনরায় বিচার আরম্ভ হইল। এই মামলার বিচারে অনন্তহরি মিত্র, প্রমোদ চৌধুরী ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফাঁসির আদেশ হইল, আর অবশিষ্ট সাতজনের হইল দ্বীপান্তর দণ্ড।

কলিকাতা হাইকোর্টে যখন এই মামলার পুনর্ব্বিচার হইল, তখন বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পাঁচ জন অভিযুক্ত আসামী নিরপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন; অনন্তহরি মিত্রের প্রাণদণ্ডই সমর্থিত হইল; তিন জনের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং প্রমোদ চৌধুরীর দণ্ড লইয়া দুইজন বিচার-পতির মধ্যে উপস্থিত হইল মতদ্বৈধতার। একজন বিচারপতি তাঁহাকে দ্বীপান্তর দণ্ডে এবং অপর জন তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিলেন। ফলে প্রমোদ চৌধুরীর মামলাটি প্রধান বিচারপতির নিকট প্রেরিত হইল এবং তিনি তাঁহার মৃত্যুদণ্ডই সমর্থন করিলেন। ১৯২৬ সালের ৯ই আগষ্ট এই রায় প্রদত্ত হইল।

দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলাতেও এই সময় কয়েকজন দণ্ডপ্রাপ্ত হন।

এদিকে চৌরীচৌরার ঘটনার পরই যে গণ-আন্দোলন অনেকটা নিস্তেজ হইয়া পড়িল, পূর্ব্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯২২ সালের ১৩ই মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধীও গ্রেপ্তার হইলেন। তিনটি অপরাধের জন্য দুই বৎসর হিসাবে তাঁহার ছয় বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

খিলাফৎ সমস্যার এই সময় অনেকটা সমাধান হইয়া যাওয়ায় একদল

স্বার্থপর লোক হিন্দু-মুসলমানে পুনরায় বিভেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। ইহার ফলে ১৯২২ সালে মহরম উপলক্ষে মূলতানে উভয় সম্প্রদায়ে বাধিল দাঙ্গা। ১৯২৩ সালে বাংলা দেশ ও পাঞ্জাবেও ব্যাপকভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিল। ইহার পর হইতেই মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে দাঙ্গা চলিতেই লাগিল। ১৯২৬ সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লীতে নিজ ভবনে একজন মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন।

স্বরাজ্য-দল

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতৃগণ কারামুক্তির পর বাহিরে আসিয়া গঠন করিলেন স্বরাজ্য-দল এবং তাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিলেন। ইহার ফলে আইন সভার নির্ব্বাচনে বাংলা দেশে এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে স্বরাজ্য-দল বিশেষ সাফল্যলাভ করিল।

সাইমন কমিশন

মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন-সংস্কার আইনে এইরূপ একটি বিধান ছিল যে, উক্ত শাসন ব্যবস্থা চালু হইবার দশ বৎসর পরে ভারতীয় শাসন ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হইবে এবং ঐ কমিশন আবশ্যক পরিবর্ত্তনাদির বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য দাখিল করিবে; কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাইতেছে দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে একটি কমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। ভারতীয়দের দাবী মিটাইবার পক্ষে কিন্তু মাত্র একটি কমিশন প্রেরণের ঘোষণায় কিছুই কাজ হইল না। চালু

শাসন-ব্যবস্থার সামান্য কিছু রদ্ বদল তখন ভারতীয়গণের কাম্য নহে—তাহারা তখন সর্ব্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতালাভের জন্য অধীর এবং ব্যাকুল। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইল, তাহাতে "পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাসীর লক্ষ্য" এই মর্ম্মে গৃহীত হইল একটি প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট-প্রেরিত উক্ত কমিশন সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনের। কাকোরী মামলায় গুরুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের প্রতিও সুবিবেচনার দাবী জানান হইল।

যাহা হউক, ঘোষণা অনুযায়ী ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি কমিশন ভারতে আসিল। তাহাতে সদস্য ছিলেন সর্ব্বশুদ্ধ সাত জন। কমিশনের সভাপতি সাইমনের নামানুসারেই কমিশনের নাম হইল সাইমন কমিশন।

লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যু

উক্ত কমিশনে কিন্তু একজনও ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা হয় নাই। যাহাদের শাসনব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য এই কমিশন, তাহাদেরই মধ্য হইতে কোনও প্রতিনিধি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ অনুভব করিলেন না। এই স্বৈরাচার এবং ধৃষ্টতার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত-ব্যাপী প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইল। কমিশন ৩রা ফেব্রুয়ারি বোম্বাই-এ পদার্পণ করিলে "Go back Simon" লিখিত কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শিত ও সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হইল। কমিশন লাহোরে উপস্থিত হইলে সেখানে এক বিরাট বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা বাহির হয়। লালা লাজপৎ রায়, ডাঃ সত্যপাল, ডাঃ আলম প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এই শোভাযাত্রা পরিচালিত করেন। লাহোরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্কট ও তাঁহার সহকারী মিঃ সাণ্ডার্স পুলিশদল লইয়া বেপরোয়াভাবে লাঠি চালাইয়া ঐ শোভাযাত্রা

ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে এক অতি শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল। পুলিশের লাঠিতে স্বয়ং লালা লাজপৎ রায় বুকে, মাথায় ও শরীরের অন্যান্য স্থানে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এই আঘাত-প্রাপ্তির ফলে লালাজী সাংঘাতিকভাবে পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহার ফুসফুসে যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। এইভাবে ভুগিতে ভুগিতে ইহা উপলক্ষ করিয়াই ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। লক্ষ্ণৌ-এ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও পুলিশের হস্তে নিগৃহীত হইলেন।

দিল্লীতে সর্ব্বদল-সম্মেলন ও কলিকাতা কংগ্রেস

এদিকে কমিশনকে বর্জ্জন করিয়া কংগ্রেস ভারতের দাবী প্রস্তুতের জন্য নিজেরাই হইলেন উদ্যোগী। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লীতে এক সর্ব্বদল-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। উক্ত সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে যে কমিটি গঠিত হইল, তাহাতে করা হইল ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের দাবী। এই বৎসর কলিকাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় নেহেরু-রিপোর্টই সমর্থিত হইল এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই দাবী পূরণের ব্যবস্থা না করিলে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সুরু করিয়া জনসাধারণকে কর প্রদান বন্ধ করিতে অথবা অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে নির্দ্দেশ দিবেন।

চরমপন্থী দল কিন্তু এই ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের দাবীতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহাদের মুখপাত্র হিসাবে সুভাষচন্দ্র (পরে নেতাজী) ও পণ্ডিত জওহরলাল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীই উত্থাপন করেন। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু গান্ধীজীর প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের এই কলিকাতা অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্রের পরিচালনা ও অধিনায়কত্বে এক বিরাট্‌ স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সংগঠিত হইয়াছিল। যতীন দাস ছিলেন এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সহকারী। এই অধিবেশনের আর একটি গুরুত্ব হইল এই যে, ভারতের নানা স্থান হইতে বিপ্লবীরা আসিয়া এই অধিবেশনে সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা একত্রে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের পরবর্ত্তী কর্ম্মপন্থা নির্ণয়ের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ভগৎ সিং, যতীন দাস, সূর্য্য সেন প্রভৃতি অগ্নি-সাধকগণের এই অধিবেশন উপলক্ষেই একত্র যোগাযোগ হইয়াছিল।

গোপীনাথ সাহা, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রভৃতির ফাঁসির পর হইতেই অসন্তোষের বহ্নি পুনরায় ধূমায়িত হইতেছিল। তদুপরি সাইমন কমিশনের ভারতে আগমন ও অবস্থান উপলক্ষে চতুর্দ্দিকে যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা দমন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট রুদ্র-নীতি অবলম্বন করায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটিল। বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর আবির্ভাব এই সময়কার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভগৎ সিং

ভগৎ সিং ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী সর্দ্দার অজিত সিং-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার পিতার নাম কিষেণ সিং। অল্প বয়স হইতেই বিপ্লবীদিগের সহিত ভগৎ সিং-এর মেলামেশা ছিল। ১৯২০-২১ সালের গণ-আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর যখন ধীরে ধীরে দেশ আবার বিপ্লবান্দোলনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন ভগৎ সিং অন্যান্য সহকর্ম্মীর সহিত পাঞ্জাবে 'নওজোয়ান সভা' নামে এক বিপ্লবী সমিতির সংগঠন করিতেছিলেন। এদিকে কাকোরী মামলার অভিযুক্ত বিপ্লবীরা যে "হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান এশোসিয়েসন" গঠিত করিয়াছিলেন, নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় চন্দ্রশেখর আজাদ

তখনও তাহাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছিলেন। এই চন্দ্রশেখর আজাদকে পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও বহুদিন যাবৎ গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। অবশেষে ১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ শহরের এলফ্রেড পার্কে পুলিশ যখন তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করে, তখন একটি ছোটখাট লড়াই বাধিয়া যায়। ইহাতে একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্ম্মচারী গুরুতররূপে আহত হয় এবং চন্দ্রশেখর আজাদ শেষ পর্য্যন্ত ধরা না দিয়া নিজের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতেই নিজে আত্মহত্যা করেন।



ভগৎ সিং

যাহা হউক, ভগৎ সিং প্রভৃতি বিপ্লবীরাও চন্দ্রশেখর আজাদ-নিয়ন্ত্রিত দলের সংস্পর্শে আসায় বিপ্লবীদিগের শক্তি ও কর্ম্মতৎপরতা পুনরায় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল। স্বদেশী ডাকাতি আবার সুরু হইল পুরাদমে। লাহোরের কাশ্মীরী বিল্ডিং এবং সাহারাণপুর, আগ্রা ইত্যাদি স্থানে বোমা তৈয়ারির কারখানা স্থাপিত হইল।

বিপ্লবীদিগের কার্য্যের নানারূপ পরিকল্পনা রচিত হইতে লাগিল। কাকোরী ষড়্যন্ত্র মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে যে ট্রেণে লইয়া যাওয়া স্থির হইয়াছিল, সেই ট্রেণ হইতে তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইবারও একবার সঙ্কল্প করা হয়। আর একটি পরিকল্পনা এইরূপ ছিল যে, উক্ত মামলার রাজসাক্ষীদিগকে হত্যা করা হইবে। সাইমন কমিশনের সভ্যগণ যে ট্রেণে যাইবেন, তাহা ডিনামাইট-সংযোগে বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়াও একবার স্থির হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য উক্ত পরিকল্পনাগুলিকে আর কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই।

সাণ্ডার্স-হত্যা

মিঃ স্কট ও মিঃ সাণ্ডার্সের নেতৃত্বে লাহোরে বিক্ষোভ-শোভাযাত্রার উপর পুলিশের লাঠি-চালনা এবং তাহাতে আহত হইয়া ভুগিতে ভুগিতে লালাজীর মৃত্যুর বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিপ্লবীদের দৃষ্টি এইবার তাঁহাদের উপর পড়িল। ১৯২৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর কতিপয় বিপ্লবীর হস্তে লাহোরের কোর্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে অপরাহ্নকালে মিঃ সাণ্ডার্স ও তাঁহার সঙ্গী চম্পালাল প্রাণ হারাইলেন। ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মিঃ ফার্ণ আততায়ীদের ধরিবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তাঁহার উপরও গুলি বর্ষিত হইল। হস্তে গুলির আঘাত পাইয়া তিনি পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ভগৎ সিং এবং তাঁহার দলবলের দ্বারাই এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল।

দিল্লীর আইন-পরিষদে বোমা

সাণ্ডার্স-হত্যার কয়েকমাস পরেই ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল দিল্লীর আইন-পরিষদ ভবনেও এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পরিষদের সভাপতি যখন

Public Safety Bill সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন অকস্মাৎ পরিষদের দুই স্থানে সশব্দে ঘটিল বোমার বিস্ফোরণ। ইহার ফলে কয়েকজন আহতও হইলেন। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের দ্বারাই এই বোমা বিস্ফোরিত হইয়াছিল। ইহার পর ভগৎ সিং দুইবার গুলিও ছুড়িলেন। প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা ব্যতীত অবশ্য এই সকল কার্য্যকলাপের আর অন্য উদ্দেশ্য ছিল না।

বিস্ফোরক আইনের তিন ধারা অনুযায়ী এবং হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের বিচার হইল। বিচারে দুই জনের প্রতিই প্রদত্ত হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড।

লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা

পরিষদে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার কয়েকদিন পরেই পুলিশ লাহোরের কাশ্মীরী বিল্ডিং খানাতল্লাস করে এবং বহু পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। শুকদেব, কিশোরীলাল প্রভৃতি কয়েকজন সেইখানেই গ্রেপ্তার হইলেন। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের স্বীকারোক্তির ফলে পুলিশ সকল ব্যাপার জানিতে পারিল এবং নানা প্রদেশ হইতে গ্রেপ্তার করিল বহু বিপ্লবীকে। পরে এই সকল ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা নামে রুজু হইল এক বিরাট মামলা। যতীন দাস, শুকদেব, কিশোরীলাল প্রভৃতি বহু বিপ্লবীকে এই মামলায় আসামী করা হইল। ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তও আবার নূতন করিয়া এই মামলায় অভিযুক্ত হইলেন। মুক্তিলাভের আশায় ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজন হইল রাজসাক্ষী।

১৯২৪সাল হইতে ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার্থ অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র ও লোকজন প্রভৃতি সংগ্রহ এবং এতদুদ্দেশ্যে সমিতি-গঠন ইত্যাদির অভিযোগ আসামীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইল। মামলার শুনানি আরম্ভ হইল ১৯২৯

সালের জুলাই মাসে। রাজবন্দীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ইতিমধ্যেই জেলখানায় প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনশনের ফলে ভগৎ সিং এই সময় খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ষ্ট্রেচারে করিয়া আদালতে আনা হইতে লাগিল।

ঐতিহাসিক অনশন

মামলা চলিতে থাকার সময় অভিযুক্ত বিপ্লবীরা আদালতে একত্রে মিলিয়া তাঁহাদের পরবর্ত্তী কর্ম্মপন্থা নিরূপিত করিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে উত্তম খাদ্য, সংবাদপত্র ও পুস্তকপ্রাপ্তি এবং সকলের একই শ্রেণীতে অবস্থান ইত্যাদির দাবীতে প্রায়োপবেশন সুরু করিবেন। পরামর্শমত আরম্ভও হইল সেই ঐতিহাসিক অনশন, যাহার পরিণতিতে জীবন দিয়া শহীদ হইলেন বাংলার মৃত্যুঞ্জয়ী সন্তান যতীন দাস।

বাংলার দধীচি যতীন্দ্রনাথ দাস

১৯০৪ সালে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বঙ্কিমবিহারী দাস। শৈশবকালেই যতীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়।

১৯২০ সালে তিনি ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে তখন অসহযোগ আন্দোলন সুরু হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথ কলেজে ভর্ত্তি হইলেন বটে, কিন্তু পড়াশুনা বেশিদিন চালাইতে পারিলেন না। দেশসেবার আহ্বান তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল এবং দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির অধীনে তিনি কর্ম্মে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯২১ সালে পশ্চিম বঙ্গে বন্যার প্লাবন ঘটিলে যতীন্দ্রনাথ বন্যাপীড়িত এলাকায় সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যতীন্দ্রনাথকে প্রথম কারাদণ্ড ভোগ

করিতে হয়। এই বৎসরই জুলাই মাসে তিনি পুনরায় দ্বিতীয়বার তিন মাসের জন্য কারাবরণ করেন। তিনি যখন জেল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, তখন অসহযোগ আন্দোলনের বেগ অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে। পুনরায় শিক্ষা-লাভের উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ আশুতোষ কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৯২৪



যতীন্দ্রনাথ দাস

সালে তিনি সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির এবং বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সহিতও এই সময় তাঁহার যোগাযোগ ঘটিল। ইহার ফলে তিনি অন্যান্য সহকর্মীদের সহায়তায় 'দক্ষিণ কলিকাতা

তরুণ সমিতি' নামে একটি সমিতি সংগঠিত করিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য হইল দেশের তরুণ যুবকগণের শক্তিকে সংহত করিয়া তাহাদের মনে উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চার দ্বারা বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের উপযোগী করিয়া তুলা।

গণ-আন্দোলন বন্ধ হইয়া গেলে দেশে যখন বিপ্লববাদ আবার প্রসার লাভ করিতে লাগিল, তখন ১৯২৩ ও ১৯২৭ সালে যে বহু নেতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯২৪ সালের ৫ই নভেম্বর রাত্রিকালে যতীন্দ্রনাথকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। গ্রেপ্তার করিয়া প্রথমে তাঁহাকে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়--পরে স্থানান্তরিত করা হয় মেদিনীপুর জেলে। সেখানে অবস্থানকালে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলে তাঁহাকে ঢাকা জেলে পাঠান হইল।

এই ঢাকা জেলে থাকিতে থাকিতেই যতীন্দ্রনাথ প্রথমবার অনশন অবলম্বন করিয়াছিলেন। জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের গর্হিত আচরণের প্রতিবাদে এই সময় তিনি বিশ দিন উপবাস পালন করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তাঁহার অভিযোগের প্রতিকার করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করেন। অতঃপর তিনি প্রেরিত হন পাঞ্জাবের এক জেলে এবং সেখান হইতে তাঁহাকে আনিয়া পরে আবার চট্টগ্রাম জেলার এক গ্রামে কিছুদিন অন্তরীণে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। অবশেষে ১৯২৮ সালের ৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

মুক্তি পাইয়া তিনি শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ভর্ত্তি হইলেন বঙ্গবাসী কলেজে। এখানে তিনি বি-এ পড়িতে লাগিলেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়, তদুপলক্ষে গঠিত বিরাট্ স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সংগঠন ব্যাপারেও যতীন্দ্রনাথ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

এই অধিবেশনের সময় ভারতের নানা স্থানের বিপ্লবীরা আসিয়া একত্রে যুক্তি-পরামর্শের সুযোগ পান এবং নূতন কর্ম্মোদ্যোগের সূচনা হয়। সম্মিলিত প্রধান প্রধান বিপ্লবীদিগের সহিত যতীন্দ্রনাথও ছিলেন।

১৯২৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির রংপুর অধিবেশনের প্রাক্কালে বাংলার নেতৃস্থানীয় তরুণ বিপ্লবীরা সমবেত হইয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম নিরূপিত করেন। স্থির হয় যে, কয়েকটি জেলার অস্ত্রাগার প্রভৃতি আক্রমণ এবং ছোট ছোট ঘাঁটিগুলি অধিকার করার চেষ্টা করা হইবে। চট্টগ্রামে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরবর্ত্তীকালে ঘটিয়াছিল —তাহা ছিল এই পরিকল্পনারই অন্যতম অংশ।

অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ এবং উত্তর ভারতের বিপ্লবী দলগুলির সহিত যোগাযোগ রক্ষার ভার পড়িয়াছিল যতীন্দ্রনাথের উপর। বোমা তৈয়ারিতেও যতীন্দ্র-নাথের দক্ষতা ছিল। সাণ্ডার্স-হত্যার পর পলায়িত অবস্থায় গোপনে ভগৎ সিং কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়া-কলাপ চালাইবার জন্য বাংলার বিপ্লবীদিগের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র প্রার্থনা করেন। দিল্লীর আইন-পরিষদ ভবনে বোমা নিক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করিলেন। প্রার্থনা মত কিছু পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র বাংলার বিপ্লবীরা ভগৎ সিং-কে দিলেন—কিন্তু ভগৎ সিং-এর বোমা ও অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন ছিল প্রচুর। এ বিষয়ে ভগৎ সিং যতীন্দ্রনাথের সহায়তা প্রার্থনা করায় তিনি বোমা তৈয়ারি করিয়া দিয়া ভগৎ সিং-এর দলবলকে সাহায্য করিবার জন্য উত্তর ভারতে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করিতে থাকেন। ইহার পর দিল্লীর আইন-পরিষদ ভবনে বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং পরে লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলা উপলক্ষে অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত যতীন্দ্রনাথকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

অনশন অবলম্বনের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে যখন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার

বন্দীদিগের মধ্যে আলোচনা হয়—তখন এইরূপ অনশনের বিরুদ্ধেই যতীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, অস্ত্রের সাহায্যে অত্যাচারী বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান সংঘটিত করা যে বিপ্লবীদিগের কার্য্য এবং উদ্দেশ্য, তাঁহাদের পক্ষে অহিংস প্রায়োপবেশন অবলম্বন করিয়া অভিযোগের প্রতিকারের উপায় অন্বেষণ করা ঠিক হইবে না; বরং সংগ্রামের পথে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনের কার্য্যকরী পন্থা অনুসরণ করাই অধিকতর শ্রেয়ঃ হইবে। যতীন্দ্রনাথের এই অভিমত অনেকে সমর্থন করিলেন বটে, কিন্তু অনেকে আবার তাহাকে উপহাসও করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, অনশন অবলম্বনের ভয়েই বোধহয় যতীন্দ্রনাথ ঐরূপ যুক্তি দেখাইতেছেন।

সেদিন যাঁহারা যতীন্দ্রনাথকে চিনিতে ভুল করিয়াছিলেন—তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়াছিল ইহারই কয়েক মাস পরে—১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে।

পরামর্শের পর বিপ্লবীরা স্থির করিলেন যে, অভাব-অভিযোগের প্রতিকারকল্পে তাঁহারা প্রায়োপবেশন সুরু করিবেন এবং এই উপলক্ষে তাঁহাদের প্রদত্ত বিবৃতিতে অভাব-অভিযোগের বিষয় থাকিবে বটে—কিন্তু বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই বিবৃতি রচিত হইবে। ভগৎ সিং পরে এই বিবৃতি আদালতে পাঠ করিয়াছিলেন। অনশন-ধর্ম্মঘট আরম্ভ করার সময় যতীন্দ্রনাথ সহকর্ম্মীদিগকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া লইলেন যে, দাবী পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

ইহার পরই সুরু হইল বন্দীদিগের অনশন-ধর্ম্মঘট। কখনও ভয় দেখাইয়া, কখনও প্রলোভন দেখাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের উপবাস ভঙ্গ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না।

প্রায়োপবেশন আরম্ভের কয়েকদিন পরেই যতীন্দ্রনাথের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৮ই জুলাই যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণ দাস এ

বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন—তাঁহারা কিন্তু অবিচলিত। অনশনের দ্বাদশ দিবসে চেষ্টা করা হইল জোর করিয়া খাওয়াইবার। নাক এবং মুখ দিয়া দুইটা নল প্রবিষ্ট করাইয়া সেই নলের সাহায্যে দুগ্ধ প্রভৃতি তরল খাদ্য যতীন্দ্রনাথের পাকস্থলীতে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করা হইল। ইহার ফল হইল অতিশয় মারাত্মক। গলার নলটি শ্বাসনলী দিয়া ফুসফুসের দিকে চলিয়া যাওয়ায় ঢালিয়া দেওয়া তরল পদার্থ উদরে না গিয়া ফুসফুসে গিয়া সঞ্চিত হইল এবং তাহার ফলে তাঁহার ফুসফুসে উপস্থিত হইল দারুণ যন্ত্রণা। তাঁহার শ্বাসক্রিয়া প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইল—নাক দিয়া পড়িতে লাগিল রক্ত। ডাক্তারের জোর-জবরদস্তির ফলে তাঁহার পাকস্থলীও জখম হইল। যতীন্দ্রনাথ শীঘ্রই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল।

তিন দিন যতীন্দ্রনাথ অচৈতন্য অবস্থায় রহিলেন। ইন্‌জেক্‌সন প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া তিন দিন পরে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনা গেল বটে, কিন্তু নিউমোনিয়ার লক্ষণ তাঁহার শরীরে পরিস্ফুট হইল। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইতে থাকিলেও তিনি ঔষধ বা পথ্য গ্রহণে সম্মত হইলেন না।

অনশনের অষ্টাদশ দিবসে যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সহোদরকে তাঁহার নিকট থাকিবার জন্য কর্তৃপক্ষ অনুরোধ জানাইলেন এবং তখন হইতে কনিষ্ঠ কিরণচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় রত হইলেন। নিকটে থাকিতে অনুমতি দিবার পূর্বে যতীন্দ্রনাথ কিন্তু কিরণচন্দ্রকে একটি কঠোর সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া লইলেন। কিরণচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইল যে, সজ্ঞান বা অজ্ঞান যে কোন অবস্থায় যতীন্দ্রনাথ যদি খাদ্য বা পানীয় চাহিয়া বসেন, তথাপি তিনি তাহা দিবেন না। কক্ষে জলের

কুঁজা থাকিলে যদি কোনও সময় তাহা দেখিয়া তিনি জলপানের জন্য প্রলুব্ধ হন, সেইজন্য জলের কুঁজা যতীন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথের কঠোর সাধনা এইভাবে সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হইতেছিল।

এদিকে তাঁহার শারীরিক অবস্থা দিনের পর দিন অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ওজন কমিয়া গেল ২৫ পাউণ্ড – ৫ই আগষ্ট নাগাদ নাড়ীর গতিও নামিয়া গেল পঞ্চাশের নীচে। প্রসিদ্ধ জন-নায়কগণের কেহ বা তাঁহাকে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ জানাইলেন, কেহ বা পত্র লিখিলেন কারা-কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া—আবার কেহ বা বন্দীদিগের প্রতি সরকারী আচরণ ও ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা করিয়া সংবাদপত্রে দিলেন বিবৃতি। ৬ই আগষ্ট রাত্রি ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত যতীন্দ্রনাথ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কাটাইলেন। ২২শে আগষ্ট হইতে তাঁহার তিন দিন অতিবাহিত হইল অর্দ্ধচেতন অবস্থায়। তখনও পর্য্যন্ত যতীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্কল্পে অটল। তাঁহার মুক্তির দাবীতে দেশের নানা স্থানে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

অনশনের ৫২তম দিবসে যতীন্দ্রনাথের বাঁচিবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। পাঞ্জাবের ছোটলাট কিরণচন্দ্রকে ডাকিয়া যতীন্দ্রনাথকে জামিনে মুক্তি দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিরণচন্দ্র জানাইলেন যে, তাঁহার ভ্রাতাকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি না দিলে তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করা যাইবে না এবং সেরূপ অবস্থায় যাহাই ঘটুক না কেন, তিনিও তাঁহার ভ্রাতাকে অনশন ত্যাগ করিবার জন্য পরামর্শ দিতে পারিবেন না। কর্ত্তৃপক্ষ অতঃপর গোপনে যতীন্দ্রনাথকে জামিনে খালাস দিবার ব্যবস্থা করিলেন। যতীন্দ্রনাথ তাহা জানিতে পারিয়া মুমূর্ষু কণ্ঠেই জানাইলেন তাঁহার দৃঢ় প্রতিবাদ। তখন সশস্ত্র পুলিশদল আসিল জোর করিয়া তাঁহাকে মুক্ত

করিয়া দিতে। তিনি জানাইলেন, ঐরূপ করিতে গেলেও তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—জীবিত অবস্থায় সরকার তাঁহাকে জামিনে মুক্ত করিয়া দিতে পারিবেন না। অগত্যা সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

৫৮তম দিবসে যতীন্দ্রনাথের অন্তিম সময় যেন আরও নিকটবর্ত্তী হইল। এইবার আরম্ভ হইল হিক্কা এবং দমও যেন মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। শেষ পর্য্যায় যে সুরু হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও আর বাকি রহিল না। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু ক্ষীণ হাসির রেখা তাঁহার অনশনক্লিষ্ট মুখের উপর ফুটাইয়া তুলিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইতে তখনও বিলম্ব আছে। ৬২তম দিবসে প্রাতঃকালে সকলকে নিকটে ডাকিয়া হৃষ্টচিত্তে তিনি ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। গান শুনিতে চাহিলে তাঁহাকে গান শুনান হইল—গোলাপফুল পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে জেল-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে গোলাপ ফুল পাঠাইয়া দিলেন। সকলের সহিত তিনি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক নানা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সহকর্ম্মিগণকে এক সময় বলিলেন,—"আমার তো সময় ঘনিয়ে এসেছে; বিপ্লবী-জীবনের মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে তোমরা যেন সকলে বাঁচ্‌তে পারো।"

৬৩তম দিবসে প্রাতঃকাল হইতেই হিক্কার বেগ আরও বাড়িয়া উঠিল—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃই যেন হইয়া আসিতে লাগিল শিথিল ও অবসন্ন; কথা বলিবারও আর শক্তি রহিল না। হৃৎপিণ্ড এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে কয়দিন যাবতই উহার ক্রিয়া চলিতেছিল কিনা বুঝা যাইতেছিল না। ইঙ্গিতে যতীন্দ্রনাথ গান শুনিতে চাহিলে কনিষ্ঠ কিরণচন্দ্র গান গাহিয়া শুনাইলেন। তাঁহার মুখে তৃপ্তির ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা যাইতে লাগিল। মধ্যাহ্ন ১২টা ৫৫ মিনিটের সময় একবার তিনি সহসা "বন্দেমাতরম্" বলিয়াই একেবারে স্থির হইয়া গেলেন। সহকর্ম্মীরা তাড়াতাড়ি নীচু

হইয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে, সবই শেষ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু তাঁহাদের অশ্রুতে সিক্ত হইয়া উঠিল।

১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, যতীন্দ্রনাথ চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেশবাসী সেদিন বিমূঢ় হইয়া তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শুনিল ; শুনিল যে যতীন্দ্রনাথ দেশের জন্য ৬৩ দিন ধরিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন। পরলোকগত মহান্ আত্মার অনমনীয় দৃঢ়তার উদ্দেশে তাহারা শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

ঐ দিনই অপরাহ্নকালে জেল-কর্ত্তৃপক্ষ যতীন্দ্রনাথের ভ্রাতার হস্তে যতীন্দ্রনাথের শবদেহ অর্পণ করিলেন। বিরাট জনতা ইতিমধ্যেই ব্যগ্র হইয়া কারা-প্রাচীরের বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতেছিল। লাহোরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হ্যামিল্টন হার্ডিং সেই বিরাট্ জনতার সমক্ষেই তাঁহার টুপি খুলিয়া মহান্ বিপ্লবীর শবদেহের প্রতি তাঁহার শেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন।

তাঁহার শবদেহের সৎকার যাহাতে কলিকাতাতেই সম্পাদিত হয়, জীবিত থাকিতেই এইরূপ ইচ্ছা যতীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ জননেতাগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া শবদেহসহ সেই বিরাট্ জনতার শোকযাত্রা ষ্টেসনের দিকে চলিল। কলিকাতার পথে বহু ষ্টেসনে নরনারী সমবেত হইয়া যতীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশে তাহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করিতে লাগিল। পণ্ডিত জওহরলাল শবাধারের নিকট গিয়া আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর শবদেহ বহন করিয়া লাহোর এক্সপ্রেস আসিয়া পৌঁছিল হাওড়া ষ্টেসনে। সেখান হইতে শোকযাত্রা করিয়া শবদেহ হাওড়া টাউন হলে লইয়া যাওয়া হইল। সুভাষচন্দ্র তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক

রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি। শোকযাত্রা পরিচালনার সকল খুঁটিনাটি এবং হরতাল পালন সম্বন্ধে ১৪ই তারিখেই তিনি এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত করিয়াছিলেন। ১৫ই তারিখে সকাল আটটার সময় হাওড়া টাউন হল হইতে মৃতদেহ লইয়া এক সুদীর্ঘ শোকযাত্রা বাহির হইল—কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে পৌছাইতে সেই শোকযাত্রার প্রায় ২টা বাজিয়া গেল। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মৃতদেহ একটি উচ্চ বেদীর উপর স্থাপন করিয়া সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার অধীন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী যতীন্দ্রনাথের পার্থিব দেহের প্রতি তাঁহাদের শেষ অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে চিতায় অগ্নিপ্রদান করিতেই অল্পক্ষণ মধ্যেই যতীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

যতীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন—কিন্তু পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন তাঁহার অক্ষয় স্মৃতি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কম্পিত করিয়া তাঁহার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প নিজের জয় ঘোষণা করিল।

এদিকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের যখন প্রাথমিক বিচার চলিতেছিল, তখন হইতেই তাঁহাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন সুরু হইল। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখেই সময় সময় আসামীদের উপর পুলিশ নির্য্যাতন চালাইত। আসামীগণ দায়রা-সোপর্দ্দ হইলে Lahore Conspiracy Case Ordinance নামে একটি আইন পাশ হয় এবং উক্ত আইনে ঘোষণা করা হয় যে, লাহোর ষড়্যন্ত্র মামলার বিচার একটি স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালের নিকট হইবে। মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত দিবার ক্ষমতা ট্রাইব্যুন্যালের উপর ন্যস্ত করা হইল, কিন্তু আইনের মধ্যে এই অদ্ভুত বিধান রহিল যে, ট্রাইব্যুন্যালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল চলিবে না। আসামী বা আইনজীবীদিগের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও

যাহাতে বিচারকার্য্য চলিতে পারে, সেইরূপ বিধানাবলীও আইনের মধ্যে রহিল।

ইহার পর লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে বিচারপতি কোল্ডষ্ট্রীম সাহেবকে চেয়ারম্যান করিয়া মোট তিনজন বিচারক লইয়া একটি বিশেষ আদালত গঠিত হইল এবং তাহাতেই চলিতে লাগিল লাহোর ষড়্যন্ত্র মামলার বিচার। শ্লোগান দেওয়ার ব্যাপার লইয়া মামলা আরম্ভের কিছুদিন পরেই একদিন আদালতের মধ্যেই পুলিশ ও বন্দীদিগের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। সেদিন বন্দীরা তাঁহাদের শ্লোগান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বহু পুলিশ এক-যোগে তাঁহাদের আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। নিরস্ত্র বিপ্লবীরা যতদূর সম্ভব তাহাদের সহিত লড়াই করিলেন এবং পুলিশের হস্তে জনকয়েক গুরুতররূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। ট্রাইব্যুন্যালের একমাত্র ভারতীয় সদস্য জনাব আগা হায়দার পুলিশের এই নারকীয় নিষ্ঠুরতার নিন্দা করিয়া এক বিবৃতি দান করিলেন এবং তিনি ও কোল্ডষ্ট্রীম সাহেব এই অত্যাচারের প্রতিকার না হওয়ায় মামলার বিচার করিতে অস্বীকার করিলেন। ফলে ট্রাইব্যুন্যালের পুনর্গঠন আবশ্যক হইল। অবশিষ্ট বিচারপতি হিল্টন সাহেবকে চেয়ারম্যান করিয়া জনাব আগা হায়দার ও কোল্ডষ্ট্রীম সাহেবের স্থলে অপর দুইজন বিচারপতি নিযুক্ত করিয়া নূতন ট্রাইব্যুন্যাল গঠিত হইল।

আসামীগণ আর আদালতে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করায় তাঁহাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার-প্রহসন চলিতে লাগিল এবং রায় প্রদত্ত হইল ১৯৩০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে। রায় প্রদানের সময় সংবাদপত্র বা জনসাধারণের কোনও প্রতিনিধি আদালত-গৃহে উপস্থিত ছিলেন না।

মামলার ফলাফল—ভগৎ সিং-এর ফাঁসি

স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালের বিচারে ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু এবং

শিবরাম-এর প্রতি মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইল, সাতজনের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং একজনের সাত ও আর একজনের পাঁচ বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড হইল। তিনজন আসামী নিরপরাধ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পাইলেন।

রায়ের বিরুদ্ধে কোনও আসামীই আপিল করিলেন না। ভগৎ সিং ছিলেন আপিল করার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। প্রদত্ত প্রাণদণ্ড যাহাতে অবিলম্বে কার্য্যকরী করা হয়, তজ্জন্যই বরং তিনি উদ্‌গ্রীব ছিলেন। ফাঁসি না দিয়া তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া মারিবার জন্য প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত বিপ্লবীরা কর্তৃপক্ষের নিকট এক আবেদন করিলেন। কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাঁহাদের এই আবেদন মঞ্জুর করেন নাই।

গভর্ণমেণ্টের সহিত কংগ্রেসের একটা আপোষ-রফার আলোচনা এই সময় চলিতেছিল বলিয়া দেশবাসী আশা করিয়াছিল যে, প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত আসামীদের দণ্ড বোধ হয় আর কার্য্যকরী করা হইবে না। মহাত্মা গান্ধীও এই ব্যাপারে তাঁহার প্রভাব প্রয়োগ করিয়া মৃত্যুদণ্ডকে দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই অবস্থায়ই সহসা ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ্চ বেলা এগারোটার সময় কর্তৃপক্ষ ভগৎ সিং-এর পিতাকে আত্মীয়-স্বজনসহ জেলে ভগৎ সিং-এর সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং ঐদিনই সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি হইয়া গেল।

ফাঁসির পর জেল প্রাঙ্গণেই শবদেহের সৎকার সমাধা হয় এবং ভস্মাবশেষ শতদ্রু নদীতে নিক্ষেপের অনুমতি দেওয়া হয়। লাহোরে এই উপলক্ষে সমগ্রভাবে হরতাল প্রতিপালিত হইল এবং সহস্র সহস্র লোকের বিরাট্ শোক-যাত্রা "ভগৎ সিং জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুলিল।

ভগৎ সিং প্রভৃতির বিয়োগ-ব্যথা অন্তরে লইয়াই ইহার পর

করাচীতে আরম্ভ হইল কংগ্রেসের অধিবেশন। উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার প্যাটেল যখন করাচীর কয়েক মাইল দূরে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন, তখন কৃষ্ণ পতাকা লইয়া একদল লোক ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসির জন্য বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহাত্মা গান্ধী তাহাদের নিকটে ডাকিলেন—তাহাদের লইয়া আসা কালো ফুল দুই হাতে তুলিয়া লইয়া ধারণ করিলেন বক্ষে। দেখিয়া বোধ হইল যে, নীলকণ্ঠ যেন পৃথিবীর যাবতীয় ক্ষোভ, গ্লানি ও বিষকে আপনারই কণ্ঠে ধারণ ও সংহত করিয়া পৃথিবীকে গ্লানিমুক্ত করিতে চাহিতেছেন।

কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে ভগৎ সিং প্রভৃতির সাহস, দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গের উচ্চ প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গভর্ণমেণ্ট পক্ষ তাঁহাদের আচরণের দ্বারা জনসাধারণের সহযোগিতালাভের পথ রুদ্ধ করিতে থাকায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় যে যুব-সম্মিলনী হয়—তাহাতে সভাপতি হইয়া সুভাষচন্দ্র ভগৎ সিং-এর দেশপ্রেম ও কার্য্যাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার মতে এই সময় ভগৎ সিং-এর নাম মহাত্মা গান্ধীর নামের তুল্য জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল।

ভারতের কম্যুনিষ্টদিগকেও দমন করিবার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্ট এই সময় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কম্যুনিজম প্রচার এবং সোভিয়েট রাশিয়ার আদর্শে ভারতে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টার অভিযোগে ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ্চ বহু শ্রমিক-নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করা হয়। ইহাই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলা

১৯২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রে কলিকাতার মেছুয়াবাজার

ষ্ট্রীটে কলাবাগান বস্তীতে একটি বাড়ীতে হঠাৎ খানাতল্লাস হইল এবং তাহার ফলে পুলিশ কতকগুলি লাল ইস্তাহার, বোমা তৈয়ারির ফর্ম্মুলা ইত্যাদি প্রাপ্ত হইল। নিরঞ্জন সেন, সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, রমেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবী ঐ বাড়ীতেই গ্রেপ্তার হইলেন। সুধাংশু দাশগুপ্ত নামে একটি যুবক ভোরবেলা একটি সুটকেসে করিয়া বোমা ও রিভলভার লইয়া ঐ বাটীতে উপস্থিত হইলে পুলিশ তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিল। আশ-পাশের আরও কয়েকটি বাড়ী তল্লাস করিয়া পাওয়া গেল নানা রকমের বিস্ফোরক পদার্থ ও বোমা তৈয়ারির সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি। ইহা লইয়া সুরু হইল মেছুয়াবাজার বোমার মামলা।

ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ইত্যাদি নানা স্থানের বহু বিপ্লবী এই মামলার আসামী হইলেন। মিঃ সাঙ্কি, রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ এবং এন, কে, বসুকে লইয়া গঠিত একটি স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালে ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস হইতে আলিপুরে এই মামলার শুনানি আরম্ভ হইল। মিঃ সাঙ্কি-ই প্রথমতঃ ট্রাইব্যুন্যালের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার স্থলে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন মিঃ এইচ, বি, লেথব্রিজ।

বিচার শেষে দণ্ডপ্রাপ্ত হইলেন ষোলজন বিপ্লবী। নিরঞ্জন সেন ও সতীশচন্দ্র পাকড়াশীর হইল সাত বৎসর হিসাবে দ্বীপান্তর দণ্ড। সুধাংশু দাশগুপ্ত ও রমেশচন্দ্র বিশ্বাস যথাক্রমে সাত ও পাঁচ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। দণ্ডিত আর সকলের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হইল। অবশিষ্ট সকলে মুক্তি পাইলেন।

বড়লাটকে হত্যার চেষ্টা

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়লাট লর্ড আরউইনের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হইল। নূতন দিল্লীর প্রায় মাইলখানেক দূরে পুরাতন কেল্লার

নিকটে লাইনের নীচে বোমা রাখিয়া বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে দূর হইতে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া বড়লাটেব ট্রেণ ধ্বংস করিয়া দিবার চেষ্টা চলে। বড়লাট অক্ষত শরীরে রক্ষা পাইলেন—তাঁহার দুইজন আৰ্দ্দালী ইহাতে সামান্য আহত হইল। ট্রেণের ভোজনের কামরাটিও কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

এদিকে এই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দানের জন্য কংগ্রেসের দাবীর মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছিল। বড়লাট লর্ড আরউইন ইংলণ্ডে গিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়া ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে ভারত-শাসনে বৃটেনের লক্ষ্য সম্বন্ধে এক ঘোষণা প্রচার করিলেন; কিন্তু সে ঘোষণায় কোনও নূতনত্ব রহিল না—অতীত ঘোষণাবই তাহা পুনরাবৃত্তি মাত্র। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সম-মর্য্যাদাসম্পন্ন অংশীদার হিসাবে ভারতবর্ষ যাহাতে ধাপে ধাপে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয—ভারত-শাসনে যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তাহাই একমাত্র লক্ষ্য—ইহাই বলা হইল বড়লাটের ঘোষণায; কিন্তু এই ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার পর্য্যায় যে কতদিনে নাগাদ সমাপ্ত হইবে, সে সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কিছুই বলা হইল না। দুই-চারি বৎসরেও তাহা হইতে পারে—আবার অনন্তকাল ধরিয়াও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে ধাপে ধাপে অগ্রসর করাইয়া দেওয়ার পুণ্যকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন। যাহা হউক, ঐ বৎসরই ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বড়লাটের সহিত কয়েকজন নেতার একটি আলোচনা-বৈঠকের ব্যবস্থা হইল এবং সকলে আশা করিলেন যে, বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ আলোচনার দ্বারা হয় তো কোন সুফল লাভ হইতে পারে; কিন্তু পূর্ণ তিন ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনাব পর শেষ পর্য্যন্ত আপোষ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে স্বাধীনতার দাবী

সুতরাং ইহার পরই দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সুরু হইল কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। তিনি তাঁহার সভাপতির বক্তৃতায় ওজস্বিনী ভাষায় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চরম দাবীর কথাই ব্যক্ত করিলেন। পূর্ব্ব বৎসর কলিকাতা অধিবেশনের প্রাক্কালে বামপন্থীদের দ্বারা যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপিত হইয়াছিল—লাহোর অধিবেশনে তাহাই হইল গৃহীত। চলিত অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের দ্বারা যে কোনও ফল-লাভের সম্ভাবনা নাই—প্রস্তাবে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলেন—

"**And in pursuance of the resolution passed at the Calcutta Congress last year this Congress now declares that Swaraj in the Congress creed shall mean complete Independence, and therefore further declares the Nehru Scheme of Dominion Status to have lapsed, and hopes all parties in the Congress will devote their exclusive attention to the attainment of complete Independence and hopes also that those whom the tentative solution of the communal problem suggested in the Nehru constitution has prevented from joining the Congress or actuated them to abstain from it, will now join or rejoin the Congress and zealously prosecute the common goal."

প্রস্তাবে আইন-পরিষদের সদস্যগণকে আইন-সভা বর্জ্জন করিতে অনুরোধ জানান হইল এবং কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যসূচী অনুসরণ

করিতে জাতিকে আহ্বান জানান হইল। প্রয়োজন এবং অবস্থা অনুযায়ী করবন্ধ সহ আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার অধিকারও এই প্রস্তাবের দ্বারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর ন্যস্ত হইল।

বিপুল উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হইল। প্রতি বৎসর স্বাধীনতার সঙ্কল্প-বাক্য পাঠের সিদ্ধান্তও এই অধিবেশনেই গৃহীত হয় এবং তদনুযায়ী সর্ব্বপ্রথম এই সঙ্কল্প-বাক্য পঠিত হয় ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি।

তাহার পর আসিল ১৯৩০ সাল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এই বৎসরটি যেমন ঘটনাবহুল—তেমনই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে লর্ড আরউইন এই সময় পুনবায় আইন-পরিষদে এক বক্তৃতা দিলেন। বড়লাটের বক্তৃতার উত্তরে গান্ধীজী "Young India" পত্রে গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষ-আলোচনা চালাইবার ভিত্তিরূপে ১১টি সর্ত্তের উল্লেখ করিলেন,—যথা, লবণ-কর তুলিয়া দেওয়া, সেনা-বিভাগের ব্যয়-সঙ্কোচসাধন, উচ্চ বেতনের সরকারী কর্ম্মচারিগণের বেতন হ্রাস করা, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান, গোয়েন্দা-বিভাগ তুলিয়া দেওয়া, বিদেশী বস্ত্রের উপর রক্ষণ-শুল্ক ধার্যকরণ ইত্যাদি। উপরোক্ত দাবীগুলি যদি পূর্ণ করা হয়, তাহা হইলে আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে না বলিয়াও তিনি জানাইলেন। অন্যথায় অসহযোগ-আন্দোলন সুরু করা হইবে। বড়লাটের নিকট হইতে কিন্তু আর কোনও সাড়া আসিল না।

আইন-অমান্য আন্দোলন

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সবরমতী আশ্রমে অধিবেশন বসিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির। এই অধিবেশনে মহাত্মাজীর প্রস্তাব পরিপূর্ণ-

রূপে অনুমোদিত হইল এবং আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য পরিপূর্ণ কর্তৃত্বও তাঁহাকে দেওয়া হইল। আলোচনার পর স্থির হইল যে, লবণ-আইন ভঙ্গ করা হইবে।

ভারতের সুবিস্তৃত সৈকতভূমি থাকিলেও এবং সমুদ্র হইতে লবণ সংগ্রহের যথেষ্ট সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিলাতী লবণ কাটাইবার জন্য লবণ-প্রস্তুত আমাদের দেশে নিষিদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। গান্ধীজী নিজেই অগ্রে লবণ তৈয়ারি করিয়া এই আইন ভঙ্গ করিতে মনস্থ করিলেন।

আন্দোলন আরম্ভ করার পূর্ব্বে আর একবার শেষ চেষ্টা হিসাবে মহাত্মা গান্ধী একজন ইংরাজ যুবকের মারফতে বড়লাটের নিকট পুনরায় একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন; কিন্তু সে পত্রেরও উত্তর আসিল হতাশাব্যঞ্জক। আইনভঙ্গকর এবং জনসাধারণের শান্তির বিঘ্নকর কার্য্যপন্থা গান্ধীজী অনুসরণ করিতে সঙ্কল্প প্রকাশ করায় বড়লাট তাঁহার পত্রে দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

মহাত্মাজী ইহার প্রত্যুত্তর দিলেন "Young India" পত্রিকায়। তিনি লিখিলেন,—"On bended knees I asked for bread and I received stone instead. * * The Viceregal reply does not surprise me. But I know that the salt-tax has to go and many other things with it if my letter means what it says. * * I contemplate a course of action which is clearly bound to involve violation of law and danger to public peace. In spite of the books containing rules and regulations the only law that the nation knows is the will of the British administrators. The only public peace the nation knows is the peace of

the public prison. India is one vast prison house. I repudiate this law and regard it as my sacred duty to break the mournful monotony of compulsory peace that is choking the heart of the nation for want of free vent."

ডাণ্ডি-অভিযান

ডাণ্ডিতে লবণ প্রস্তুত করিয়া লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার জন্য গান্ধীজী প্রস্তুত হইলেন। ডাণ্ডি সমুদ্র-তীরবর্ত্তী একখানি গ্রাম। সবরমতী আশ্রমের একদল মনোনীত কর্ম্মী লইয়া দুই শত মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া ডাণ্ডি যাওয়া স্থির হইল। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ্চ সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে এই ঐতিহাসিক অভিযান সুরু হইল। সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া প্রত্যক্ষ করিল গান্ধীজীর এই অদ্ভুত অভিযান।

যে সকল গ্রাম অতিক্রম করিয়া গান্ধীজীর যাওয়ার কথা ছিল—কিছুকাল যাবৎ সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সেগুলিতে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ঘুমন্ত গ্রামগুলিকে গান্ধীজীর অভিযান সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহার ফলে তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। যাহা হউক, গান্ধীজী যেখানেই গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন, সেখানেই লাভ করিতে লাগিলেন জনগণের বিপুল সম্বর্দ্ধনা। গান্ধীজীর আদর্শ ও বাণীকে তাহারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করিল।

গ্রামবাসিগণের উপর পুলিশের অত্যাচার এইবার আরম্ভ হইল। তাহাতেও কিন্তু তাহাদের অটুট মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল না। কটিবস্ত্র-পরিহিত বৃদ্ধ সেনাপতি জাতিকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দৃঢ়পদবিক্ষেপে ডাণ্ডির দিকে অগ্রসর হইয়াই চলিলেন—লবণ-আইন প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আর সবরমতীতে ফিরিবেন না—ইহাই তাঁহার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প।

৫ই এপ্রিল প্রাতঃকালে গান্ধীজী দলবলসহ ডাণ্ডিতে উপনীত হইলেন। পরদিন আইন ভঙ্গ করা স্থির হইল। ৬ই এপ্রিল সকাল ৬টার সময় পরম গাম্ভীর্য্যময় পরিবেশের মধ্যে সত্যাগ্রহী সহকর্ম্মীদের সঙ্গে লইয়া তিনি প্রথমতঃ সমুদ্র-স্নান সমাধা করিলেন। হাজার হাজার দর্শক তাঁহার এই লবণ-আইন-ভঙ্গ অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। বেলা ৮টা ৩০ মিনিটের সময় একটি ক্ষুদ্র স্তূপ হইতে এক তাল লবণ তুলিয়া লইয়া তিনি ইংরাজের রচিত আইন ভঙ্গ করিলেন। ইহার পর তিনি এক বিবৃতি দিলেন। তাহাতে তিনি জানাইলেন যে, আইন-অমান্য করিয়া যাহারা দুঃখ-বরণ করিতে অথবা অভিযুক্ত হইবার ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত আছে—তাহারাই সম্ভবমত যেখানে খুসি সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী লবণ প্রস্তুত করিতে এবং উহা ব্যবহার বা বিক্রয় করিতে পারে।

আন্দোলনের প্রসার এবং সরকারী চণ্ডনীতি

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গান্ধীজীর এই আহ্বানে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকল প্রদেশেই লবণ-আইন ভঙ্গ করা সুরু হইয়া গেল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন না। এই আন্দোলন দমন করিতে তাঁহারাও তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। দলে দলে দেশের লোক কারারুদ্ধ হইতে লাগিল—আহত হইতে লাগিল পুলিশের লাঠিতে—অথবা বন্দুকের গুলিতে তাহারা জীবন বিসর্জ্জন দিতে লাগিল অকাতরে।

জনসাধারণের উপর এই নিষ্ঠুর পীড়নে মহাত্মা গান্ধী ব্যথিত হইলেন। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি বড়লাটের নিকট পুনরায় পত্রও লিখিলেন। গভর্ণমেণ্টের অবলম্বিত এই দমন-নীতিই যে তাঁহাকে ক্রমশঃ আরও দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার প্রেরণা যোগাইতেছে—ইহা

লিখিয়া তিনি বড়লাটকে আরও জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার সত্যাগ্রহী দল লইয়া ইহার পর ধারসানার লবণের গোলা দখল করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

গান্ধীজীকে আর বাহিরে রাখিতে ভারত-সরকার সাহস করিলেন না; সুতরাং ইহার অব্যবহিত পরেই ৫ই মে তারিখে রাত্রি ১টা ১০ মিনিটের সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় প্রকাশ্য দিবা-লোকে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে ইংরাজ-কর্তৃপক্ষ ভীত হইলেন। গ্রেপ্তারের পর তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল যারবেদা জেলে।

দেশবাসীর দৃষ্টি এইবার ধারসানা লবণের গোলার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ২১শে মে তারিখে প্রায় ২৫,০০০ সত্যাগ্রহী বিভিন্ন দিক হইতে ধারসানা লবণের গোলা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন উহা দখল ও লুঠ করিবার জন্য। পুলিশ উক্ত স্থানে যাইবার সকল পথ বন্ধ করিয়া দিয়া উহার চতুর্দ্দিকে রচনা করিল এক সুদৃঢ় বেষ্টনী এবং আগত সত্যাগ্রহীদের উপর নির্ম্মমভাবে লাঠি চালাইতে লাগিল। শত শত স্বেচ্ছাসেবক প্রহারে হইলেন জর্জ্জরিত —কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে কেহ একটিও আঙ্গুল তুলিলেন না। গান্ধীজীর অহিংসাদর্শের মূর্ত্ত প্রতীকরূপে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজক মুহূর্ত্তেও তাঁহারা সকলে শান্ত হইয়া রহিলেন। এই ধারসানা লবণের গোলায় সত্যাগ্রহীদের অভিযান এবং তাহার জন্য তাঁহাদের উপর পুলিশের পীড়ন সম্পর্কে মিঃ ওয়েব মিলার তাঁহার "New Freeman" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—"I have never witnessed such harrowing scenes as at Dharsana. Sometimes the scenes were so painful that I had to turn away momentarily. One surprising feature was the discipline of the volunteers. It seemed they were imbued with Gandhi's non-violence creed."

ওয়াদালা, শিরোদা, শানে-কত্তা প্রভৃতি স্থানের লবণের গোলা অধিকারেরও একই প্রকারের চেষ্টা চলিল—সে সকল স্থানেও অনুষ্ঠিত হইল ঐ একই ধরণের অত্যাচার। ভারতের বাজারে বিদেশী বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য অচল হইয়া গেল—ইহার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে পিকেটিং ও বর্জ্জন-আন্দোলন চলিতে লাগিল। কোথাও কোথাও কর-বন্ধ আন্দোলন বা বন-আইন ভঙ্গ আন্দোলনও চালান হইল। ছাত্ররা করিল স্কুল-কলেজ ত্যাগ। গভর্ণমেণ্ট ক্ষিপ্ত হইয়া আন্দোলন দমনকল্পে একের পর আর এক অর্ডিনান্স জারি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা সমগ্র ভারতে বিস্তারলাভ করিল।

সোলাপুরে স্বেচ্ছাসেবকগণ পুলিশের হস্ত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেন। এই উপলক্ষে পুলিশের সহিত তাঁহাদের যে সংঘর্ষ হইল, তাহাতে জনকয়েক পুলিশ হইল নিহত। ইহার ফলে সেখানে জারি করা হইল সামরিক আইন এবং জনসাধারণের উপর অশেষ নির্য্যাতন চালান হইতে লাগিল। একদল গাড়োয়ালী সৈন্যকে দিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি নিরস্ত্র শান্ত জনতার উপর গুলি বর্ষণের ব্যবস্থা হইলে—সৈন্যগণ গুলি চালাইতে সম্মত না হইয়া কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিল। ইহার ফলে তাহাদিগকে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিচারে তাহাদের প্রতি প্রদত্ত হয় ১০ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড।

প্রদত্ত সরকারী হিসাব হইতে জানা যায় যে, ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে মোট ৫৪,০৪৯ জনকে এই আন্দোলন উপলক্ষে দণ্ডিত করা হয়—তন্মধ্যে বাংলা দেশেই দণ্ডিতের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—প্রায় ১১,৪৬৩ জন। এপ্রিল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত চারি মাসে পুলিশের গুলিতে ১০১ জন নিহত এবং ৪২৭ জন আহত হয়।

প্রায় মাস পাঁচেক ধরিয়া আন্দোলন চলিবার পর একটা সম্মানজনক আপোষ-রফায় পৌঁছাইবার জন্য পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইল।

নেতৃবৃন্দের সহিত জেলে সাক্ষাৎ করিয়া মিটমাটের আলোচনা চালাইবার জন্য সার তেজবাহাদুর সপ্রু ও এম, আর, জয়াকর যে প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন—বড়লাট তাহাতে সম্মত হইলেন। অন্যান্য জেল হইতে তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও ডাঃ মামুদ প্রভৃতিকে আলোচনার জন্য গান্ধীজীর নিকট যারবেদা জেলে আনা হইল এবং সপ্রু ও জয়াকরও আলোচনায় যোগদান করিলেন; কিন্তু সপ্রু-জয়াকর দৌত্যেও সফল হইল না। আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক

এদিকে শিবহীন যজ্ঞের মত কংগ্রেসকে বাদ দিয়াই বিলাতে ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বসিল ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর। উহার প্রতিবাদে ঐদিন ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হইল এবং সরকারী আইন অমান্য করিয়া নানাস্থানে বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা বাহির ও প্রতিবাদ-সভার অনুষ্ঠান হইল। এই উপলক্ষেও অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাইতে পুলিশ কসুর করিল না। নয় সপ্তাহ যাবৎ অধিবেশন চালাইয়া নানা মত-বৈষম্যের মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে না পৌছাইয়াই প্রথম গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্ত হইল।

প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের এই পট-ভূমিকাতেই ১৯৩০ সালে বহু দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় যেমন গুপ্ত বিপ্লবান্দোলন স্থগিত ছিল—এবারে আর তদ্রূপ রহিল না। প্রকাশ্য অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত সন্ত্রাসবাদও পুরাদমে চলিতে লাগিল। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইল। এই অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন যেমনই অভিনব—তেমনই চাঞ্চল্যকর।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
—রবীন্দ্রনাথ



সূর্য্য সেন

চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের মহানায়ক ছিলেন বিপ্লবী সূর্য্য সেন। সহকর্মী ও অনুগামীদের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন প্রিয় "মাষ্টার-দা" নামে। বিপ্লবী দল সংগঠনের ব্যাপারে তাঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ এবং সকলের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল অপরিসীম। কি প্রচণ্ড তেজ যে তাঁহার মধ্যে সংগুপ্ত ছিল, তাহা তাঁহার মত স্বল্পভাষী, গম্ভীরপ্রকৃতি ও খর্ব্বাকৃতি লোককে বাহির হইতে দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিত না।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের নোয়াপাড়া গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমণি সেনের পুত্র ছিলেন সূর্য্য সেন। শৈশবাবস্থায় তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ ছাত্র। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম কলেজে ও পরে বহরমপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং শেষোক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতেই তিনি ১৯১৮ সালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বহরমপুর কলেজে অধ্যয়নের সময় হইতেই তিনি "যুগান্তর" দলের সহিত সংশ্লিষ্ট হন এবং তাঁহার মন বিপ্লবের পথে ধাবিত হয়।

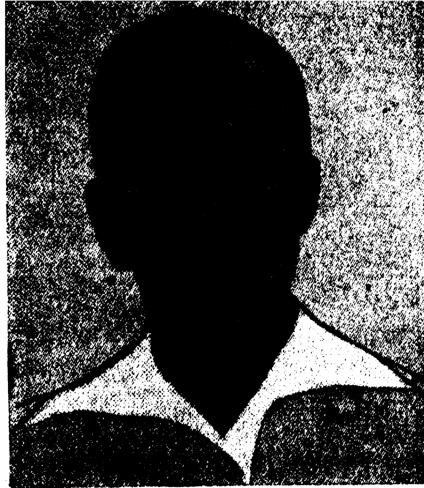
বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি চট্টগ্রাম ন্যাশন্যাল হাইস্কুলে গণিতের শিক্ষক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন। তাঁহার আশা ছিল যে, এই শিক্ষাদানের কার্য্যে ব্রতী থাকিয়াই তিনি দেশের তরুণদের উপযুক্ত-ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। শিক্ষকতার যে সামান্য বেতন তাহার দ্বারা তাঁহার খরচ চলিত না; তথাপি কিন্তু তিনি নিরুৎসাহিত হন নাই। স্বতন্ত্রভাবে ছাত্র পড়াইয়া তিনি যতদূর সম্ভব ব্যয় সঙ্কুলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী-সংগঠন

১৯২০-২১ সালের অসহযোগ-আন্দোলনের সময় সূর্য্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদকরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। নিজ বাসগৃহেই তিনি "সাম্যাশ্রম" নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠার মূল অভিপ্রায় ছিল কর্ম্মী-গঠন। অসহযোগ-আন্দোলন চট্টগ্রামে পুরা দমেই চলিতে লাগিল। অবশেষে যখন এই আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল, তখন চট্টগ্রামের বহু কর্ম্মীর পক্ষে পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সাধারণ জীবন-যাপন করা আর সম্ভব হইল না। বহু ছাত্রের পক্ষে স্কুল-কলেজে পুনরায় যোগদান করাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা তখন দেশ-সেবার কার্য্যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, ফিরিয়া যাইবার আর উপায় ছিল না এবং ব্যর্থতার গ্লানি বহন করিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্যও তাঁহারা দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন নাই। এই অবস্থায় চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবী-সমাজের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিয়া উহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার গুরুদায়িত্ব আসিয়া পড়িল নেতা সূর্য্য সেন এবং কর্ম্মী নির্ম্মল সেনের উপর। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিপ্লবিগণ তাঁহাদের দলের শক্তি ও কর্ম্মক্ষমতা বর্দ্ধিত করিলেন।

এইভাবে নেতা সূর্য্য সেনের দক্ষ পরিচালনায় চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবীরা জেলার নানা স্থানে তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং পরম উৎসাহে কর্ম্মী, অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। দলের কর্ম্মীরা নিজেরাই সাধ্যমত দলের অর্থ-ভাণ্ডারে অর্থ-সাহায্য করিতেন; কিন্তু গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের যে বিপুল ব্যয়—তাহা এইভাবে সংগৃহীত সামান্য অর্থের দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া সম্ভব ছিল না। এদিকে আবার

ডাকাতিব দ্বাবা অর্থ-সংগ্রহ কার্য্যেব সূর্য্য সেন ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি তাঁহাব পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতায ইহা লক্ষ্য কবিযাছিলেন যে, ডাকাতি কবিযা পুলিশেব দৃষ্টিকে এড়াইযা চলা বিপ্লবী দলগুলিব পক্ষে সম্ভব হয না এবং নিজেদের কার্য্যেব দ্বাবা বিপ্লবীবা জনসাধাবণের নিকটও আপনাদিগকে অপ্রিযভাজন কবিযা তুলেন, উপবন্ত কোনও স্থানে ডাকাতি কবিবাব পব উহাব জেব মিটাইতেই বিপ্লবীদলকে ব্যতিব্যস্ত হইযা উঠিতে হয,



সূর্য্য সেন

যাহাব ফলে আসল কাজ কবা তাঁহাদেব পক্ষে আর বিশেষ সম্ভব হয না। ডাকাতি করিতে গিযা এইভাবেই অনেক সময মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হইযা যায়।

এদিকে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের ভাব যাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত ছিল—টাকার

অভাবে তাঁহারাও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। বিদেশী জাহাজের নাবিকগণের নিকট হইতেই সাধারণতঃ উচ্চ মূল্যে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা খানিকটা সম্ভব ছিল—ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থান হইতেও প্রচুর অর্থব্যয়ে কিছু কিছু অস্ত্র-শস্ত্র গোপনে আমদানী করান যাইত ; কিন্তু অর্থের অভাবে কোন কিছুই সম্ভব নহে। শেষ পর্য্যন্ত এবিষয়ে ইতিকর্ত্তব্য নিরূপণ করিবার জন্য বিপ্লবীদলের উচ্চস্তরের কর্ম্মিগণের এক আলোচনা বৈঠক বসিল এবং দেশের লোকের উপর ডাকাতি না করিয়া যদি সরকারী অর্থ লুণ্ঠন প্রভৃতি সম্ভব হয়—তবে একমাত্র সেইরূপ ডাকাতিতে অবশেষে সূর্য্য সেন সম্মতি দান করিলেন।

তরুণ বিপ্লবী-নেতা সন্তোষ মিত্রের দল কলিকাতার শাঁখারীটোলার ও উল্টাডিঙ্গির পোষ্ট অফিসে হানা দিয়া অর্থ-লুণ্ঠনের চেষ্টা করার ফলে পুলিশ সন্দেহক্রমে বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিয়া যে মামলা দায়ের করে—তাহাই দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা। অনেকে এই সময় পুলিশকে ফাঁকি দিয়া গুপ্ত-জীবনও যাপন করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে তৎকালে যাঁহারা আত্মগোপন করেন, তাঁহাদের মধ্যে দেবেন দে ছিলেন অন্যতম। তাঁহাকে পাইলে কার্য্যের অনেক সুবিধা হইবে বুঝিয়া চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা তাঁহাকে চট্টগ্রামে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দেবেনবাবুও তাঁহাদের আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে টাকা লুঠ

ইহার পর, ১৯২৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর পথে প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় এক দুঃসাহসিক ডাকাতি সংঘটিত হইল। পাহাড়তলী অঞ্চলের রেলকর্ম্মচারীদের বেতন

দিবার জন্য চট্টগ্রামের রেল-অফিস হইতে প্রায় ১৭,০০০৲ টাকা লইয়া জনকয়েক কর্ম্মচারী এই সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া ঐ পথ অতিক্রম করিতেছিল। পথিমধ্যে সহসা একস্থানে দেবেন দে, অনন্ত সিংহ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও রাজেন্দ্র দাস অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তাহাদের গতিরোধ করিলেন। দেবেন দে ও অনন্ত সিংহের হস্তে রিভলভার দেখিয়া ভীত হইয়া চালক গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। বিপ্লবীরা তখন গাড়ীর আরোহী-দিগকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিলেন এবং টাকার থলিসহ গাড়ীটি লইয়া হাজির হইলেন গিয়া আপনাদের গুপ্ত আস্তানায়। দেবেনবাবুই নিপুণ চালকের মত ঘোড়ার গাড়ীটি চালাইয়া লইয়া গেলেন।

এই ঘটনার পরই চট্টগ্রামে অতিরিক্ত মাত্রায় পুলিশী-কর্ম্মতৎপরতা আরম্ভ হইল, কিন্তু বিপ্লবীরা তাঁহাদের পরবর্ত্তী কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সূর্য্য সেন তখন অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীদের লইয়া শহরের উপকণ্ঠে একটি মাটির কুঁড়ে ঘরে গিয়া ছদ্ম-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন নিরুদ্বেগেই কাটিয়া গেল। কয়েক-দিন পরে সহসা কিন্তু একদিন অতি প্রত্যূষেই জনৈক ব্যক্তি গিয়া তাহাদিগকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিপ্লবীরাও তাঁহাদের মিথ্যা পরিচয় দিলেন। আগন্তুক ব্যক্তিটি আর কেহই নহেন, তিনি ছিলেন সেই এলাকারই থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা স্বয়ং।

আগন্তুক প্রস্থান করিলে তাহারা বুঝিলেন যে, ব্যাপার বিশেষ সুবিধার নহে। তদ্দণ্ডেই তাহারা পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইলেন। গৃহ-ত্যাগ করিয়া তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব্বোক্ত দারোগাটি তাঁহার দলবল লইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছেন। পুলিশদল তাঁহাদিগকে ডাকাত বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় একদল লোকও কৌতূহলী হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। বিপ্লবীরা তখন দৌড়াইতে

আরম্ভ করিলেন, আর তাঁহাদের পিছনে ধাবিত হইল পুলিশদল ও জনতা। জনতাকে পশ্চাদ্ধাবন হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য বিপ্লবীরা তখন এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে যে টাকা ছিল, পথের উপর তাঁহারা তাহা ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন, যাহাতে পশ্চাদ্ধাবনরত জনতা অনুসরণে বিরত হইয়া টাকা কুড়ানোতেই মনোনিবেশ করে। প্রথমটা ইহাতে খানিকটা ফলও ফলিল—কিন্তু শেষে ফল দাঁড়াইল উল্টা। টাকা পাইবার লোভে তাঁহাদের পিছু পিছু যাইবার উৎসাহ লোকের যেন আরও বাড়িয়া গেল। বহু টাকা এইভাবে ছড়াইয়া দিয়াও বিপ্লবীরা দখিলেন যে জনতা তখনও পুলিশের সহিত সমানে তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। বেলা তখন প্রায় অপরাহ্ন।

টাকা ফুরাইয়া গেল। জনতাকে সাবধান করিয়া বিপ্লবীরা তখন তাহাদের ফিরিয়া যাইতে বলিলেন—নতুবা তাহাদের গুলি করা হইবে বলিয়া ভয়ও দেখাইলেন। লোকেরা কিন্তু সে কথা শুনিল না। নিরুপায় বিপ্লবিগণ তখন তাহাদের দিকে দুইটি বোমা নিক্ষেপ করিলেন। সশব্দে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিল এবং নিক্ষিপ্ত টুকরায় কয়েকজন আহতও হইল। এই সময় বিপ্লবীরা সুযোগ পাইলেন খানিকটা দূরে অগ্রসর হইয়া যাইবার। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পুলিশদলকে তখনও পিছনে পিছনে আসিতে দেখিয়া বিপ্লবীরা এইবার তাহাদের দিকে গুলি চালাইতে লাগিলেন। পুলিশও গুলি চালাইয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিল। এইভাবে কিয়ৎকাল ধরিয়া লড়াই চলিবার পর পুলিশদলের উৎসাহ যেন খানিকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিল পৃথিবীর বক্ষে। নিকটের একটি পাহাড়ে আশ্রয় লইবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে পাহাড়টিতে তাঁহারা আশ্রয় লইতে অগ্রসর হইলেন—তাহারই উপর ছিল

মিঃ রেঞ্জার নামক ফরেষ্ট-ডিপার্টমেণ্টের জনৈক সাহেবের বাংলো। তিনি তাঁহার বাংলো হইতে বিপ্লবীদের লক্ষ্য করিয়া সহসা গুলিবর্ষণ সুরু করিলেন। বিপ্লবীরাও বৃক্ষ-লতাদির অন্তরাল হইতে তাঁহার বাংলোর দিকে গুলি চালাইতে লাগিলেন। মিঃ রেঞ্জারের নিক্ষিপ্ত একটি গুলিতে দেবেন দে সামান্য আঘাত পাইলেন। রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইলে পারস্পরিক গুলি-বিনিময় বন্ধ হইল।

রাত্রির অন্ধকারেই পুলিশদল পাহাড়টির পাদদেশ আসিয়া বিপ্লবীদের সন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু তাঁহাদের কোনও সাড়া-শব্দ পাইল না। অগত্যা তাহারা পাহাড়টির একদিকে বৃক্ষ-লতাদিতে করিল অগ্নি-সংযোগ। তাহারা যখন এই কার্য্যে ব্যস্ত—তখন সেই পাহাড়টিরই একাংশে বিপ্লবীরা বিশ্রাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে তাঁহাদের দেহ তখন অবসন্ন—কেহ কেহ একেবারেই চলচ্ছক্তিহীন। কিয়ৎকাল এইভাবে বিশ্রাম করিয়া আবার তাঁহাদিগকে পলায়নের বিষয় চিন্তা করিতে হইল। না করিয়াই বা উপায় কি? সকাল পর্য্যন্ত এইখানে অপেক্ষা করা মানেই পুলিশের হাতে ধরা দেওয়া। আট-দশ মাইল ব্যাপিয়া যে পাহাড়ের শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে—তাহা অতিক্রম করিতে পারিলে হয়ত পুলিশের নজর এড়াইয়া লোকালয়ে পৌছান যাইতে পাবে। সূর্য্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও রাজেন্দ্র দাস সারাদিনের পরিশ্রমে কিন্তু এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহাদের আর নড়িবারও সামর্থ্য ছিল না। দলের অবশিষ্ট তিনজনকে পলায়নের জন্য সূর্য্য সেন তখন পরামর্শ দিলেন; কারণ সকলে মিলিয়া ধরা পড়ায় কোনও লাভ হইবে না। তিনি আরও জানাইলেন যে, একটুখানি শক্তি-সামর্থ্য ফিরিয়া পাইলেই তাঁহারাও পলায়নের চেষ্টা করিবেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মত অনন্ত সিংহ, দেবেন দে ও উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য অগত্যা তাঁহাদের সেখানে রাখিয়াই পুনরায় যাত্রা

সুরু করিলেন। সূর্য্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও রাজেন্দ্র দাস সেইখানেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

রাজেন্দ্র দাসের যখন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল—তখন রাত্রি গভীর হইয়াছে। তাঁহার পার্শ্বেই সূর্য্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর শায়িত দেহ—অসাড় এবং নিঃস্পন্দ। শীঘ্র যে তাঁহাদের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিবে না—তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। রাজেন্দ্র দাস তাঁহার মাষ্টারদা'র পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ অনুযায়ী একাকীই স্থানত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইলেন এবং অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনী আসিল এবং পাহাড়ে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে বিপ্লবীদের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বেশি খোঁজাখুঁজিও তাহাদিগকে করিতে হইল না—অল্প আয়াসেই অর্দ্ধচেতন অবস্থায় সূর্য্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর দেহ পর্ব্বতগাত্রে তাহারা আবিষ্কার করিল। ইহাতে তাহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সেই অবস্থাতেই তাঁহাদিগকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া গোরুর গাড়ীতে তুলিয়া তাহারা শহরে লইয়া চলিল।

পুলিশের সহিত বিপ্লবীদিগের সশস্ত্র সংঘর্ষের কাহিনী ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম শহরে পল্লবিত হইয়া প্রচারিত হইয়া যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। সকলের মুখেই তখন এই একই বিষয়ের আলোচনা। দলের দুইজন বিপ্লবী ধৃত হইয়াছেন শুনিয়া সকলেরই কৌতূহল আরও প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহাদের নাম শুনিয়াও তাহারা কম বিস্ময় বোধ করিল না। সূর্য্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের প্রদত্ত জবানবন্দীতে জানাইলেন যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ; দুইজনে মিলিয়া পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে গিয়া পুলিশের গুলি-বর্ষণে তাঁহারা আহত হন এবং শক্তিহীন হইয়া পাহাড়ের উপরেই পড়িয়া থাকেন; সেই অবস্থাতেই পুলিশ তাঁহাদের

ধরিয়া আনিয়াছে। তাঁহাদের শীর্ণ দেহ দেখিয়া তাঁহাদিগকে দুর্দ্দান্ত বিপ্লবী বলিয়া সন্দেহ করাও শক্ত হইল। উপরন্তু পুলিশও তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তারের সময় তাঁহাদের নিকট হইতে কোনও অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধার করিতে পারে নাই। চট্টগ্রাম ন্যাশন্যাল হাই স্কুলের গণিতের নিরীহ শিক্ষক সূর্য্য সেনকে বিপ্লবী বলিয়াই বা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়? যাহা হউক, সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া জামিন না দিয়া জেল-হাজতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। মামলা চলিতে থাকার সময়ই অনন্ত সিংহও কলিকাতায় গ্রেপ্তার হইলেন এবং তাঁহাকেও বিচারের জন্য চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যে পুলিশের জবরদস্ত দারোগা আব্দুল আজিজ সাহেব বহদ্দার হাটে বিপ্লবীদের যে আড্ডা ছিল—তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। জনসাধারণের উপর কিন্তু বিপ্লবিগণের প্রভাব এতই বিস্তৃত হইয়াছিল যে, আসামীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষী সংগ্রহ করা সরকারপক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িল। সূর্য্য সেন প্রভৃতির মামলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার শেষ পর্যান্ত অভিযুক্ত তিন জন বিপ্লবীই নিরপরাধ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তি পাইলেন।

১৯২৩ সালেই বাংলার বহু নেতাকে ৩নং আইনে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে তাহার উপর আবার পাশ হইল "বেঙ্গল অর্ডিনান্স" এবং বাংলার নানা স্থানের বহু বিপ্লবীকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করিবার জন্য একটা বড় রকমের আয়োজন চলিতে লাগিল। সরকার তরফে এই নূতন আয়োজনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলের বিপ্লবীরাও একযোগে কার্য্য চালাইয়া বিদেশী সরকারকে আঘাত হানিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। ১৯২৫ সালের শেষভাগে

চট্টগ্রামে ধর-পাকড় চলিতে থাকার সময় গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রভৃতি কর্ম্মীরাও গ্রেপ্তার হইলেন। বহু অনুসন্ধান করিয়াও পুলিশ কিন্তু সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন, চারুবিকাশ দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবীর কোনও পাত্তা পাইল না।

যুগান্তর ও অনুশীলনদলের চট্টগ্রাম শাখার মধ্যে এই সময় মিলন সংঘটিত হয়। ইহা সম্ভব হইয়াছিল সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন, নগেন সেন, চারুবিকাশ দত্ত, প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী (যিনি রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হত্যার অভিযোগে পরবর্ত্তীকালে প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) প্রভৃতির আন্তরিক চেষ্টার ফলে। এই নবগঠিত বিপ্লবী দল নূতন উৎসাহ লইয়া কর্ম্মে অবতীর্ণ হইল এবং বাংলার নানাস্থানে ইহার বহু শাখা-প্রশাখাও প্রতিষ্ঠিত হইল। সূর্য্য সেন পরে আসামের কোনও এক চা-বাগানে আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া অন্যান্য কর্ম্মীদের সহায়তায় আসামেরও নানাস্থানে বিপ্লবী-কেন্দ্র স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। শোভাবাজার ও দক্ষিণেশ্বরের বিপ্লবী-কেন্দ্রও এই নূতন বিপ্লবী-সংস্থারই সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। হরিনারায়ণ চন্দ নানা গুপ্ত কেন্দ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দলের কর্ম্মীদিগকে বোমা তৈয়ারির কৌশল শিক্ষাদান করিতেন।

নূতন গঠিত এই বিপ্লবী-সংস্থার সহিত শচীন্দ্র সান্যাল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নেতাগণের যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৯২৫ সালেই। বাংলা ও আসামে বিপ্লবের প্রস্তুতি উপযুক্তভাবে চালাইবার জন্য এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের বিপ্লবী দলগুলির কার্য্যকলাপের সহিত এই অঞ্চলের কর্ম্মিগণের কার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এই সময় শচীন্দ্র সান্যালকে সভাপতি করিয়া সূর্য্য সেন, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, অনন্তহরি মিত্র, চারুবিকাশ দত্ত প্রভৃতি বিপ্লবীদিগকে লইয়া একটি পরিচালক-সংসদও গঠিত হয়। বাংলা ও আসামের প্রায় গুটি দশেক

জেলায় ইংরাজের অস্ত্রাগার আক্রমণ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করা প্রভৃতির পরিকল্পনা এই সময়ই অনেকটা রচিত হইয়াছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই পরবর্ত্তীকালে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। আসাম ও বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানের বিপ্লবীদিগের কার্য্যক্রম নির্ণয়ের ভার অর্পিত হয় বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির উপর।

কিন্তু নূতন কর্ম্মোদ্দীপনার মধ্যে বিপ্লবের প্রস্তুতি যখন পূর্ণ উদ্যমে অগ্রসর হইতেছিল, তখন এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে উহা বাধাপ্রাপ্ত হইল। শচীন্দ্র সান্যাল, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অল্পদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হইলেন। কাকোরী, শোভাবাজার ও দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান প্রধান বহু বিপ্লবী জড়িত হইয়া পড়ায় বহু পরিকল্পনাই গেল নষ্ট হইয়া এবং তখনকার মত বিপ্লবের প্রস্তুতি সেইখানেই অনেকটা স্থগিত হইয়া গেল।

একে একে অনেকেই গ্রেপ্তার হইলেন—কিন্তু পুলিশের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিলেন নেতা সূর্য্য সেন। শোভাবাজারের বাটীতে যেদিন খানাতল্লাস হয়, সেদিন সে সময় সূর্য্য সেনও উক্ত বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। অতি প্রত্যূষেই পুলিশ আসিয়া বাটীতে হানা দিল। উক্ত বাটীর দু'তলার এক কক্ষে ছিল বিপ্লবিগণের আস্তানা। রুদ্ধ দ্বারে পুলিশ আসিয়া আকস্মিকভাবে আঘাত করিতে থাকায় অভ্যন্তরস্থ বিপ্লবীরা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। প্রমোদরঞ্জন দ্বারদেশে পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া পুলিশের ভিতরে প্রবেশে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ধাক্কা-ধাক্কির পর দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং সশস্ত্র পুলিশদল কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রতিটি জিনিষ তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করিল—কোনও স্থান খুঁজিতে তাহারা বাকি রাখিল না; কিন্তু যাঁহার জন্য সারা বাংলার গোয়েন্দা-বিভাগ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত—কোথায় গেলেন সেই সূর্য্য সেন?

সূর্য্য সেন ততক্ষণে কক্ষের পশ্চাৎদ্বার দিয়া দেওয়ালের গা-নল বাহিয়া কোনও মতে নিম্নে অবতরণ করিয়াছেন এবং একটি নোংরা সরু গলি অতিক্রম করিয়া রাজপথে পড়িয়া দ্রুতবেগে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রমোদরঞ্জনের পরামর্শেই তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন এবং প্রমোদরঞ্জনও এই কারণেই দরজা চাপিয়া ধরিয়া পুলিশের ভিতরে প্রবেশে এতক্ষণ বাধা দিতেছিলেন। অন্যান্য বিপ্লবীরা ধরা পড়িলেন বটে—কিন্তু তবুও তাঁহারা একেবারে হতাশ হইলেন না; কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, একমাত্র সূর্য্য সেন জেলের বাহিরে থাকিলেই বিপ্লবের প্রস্তুতিও চলিতে থাকিবে।

বিপ্লবীদের অনেকেই একে একে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন—অথবা বিনা বিচারে কারাগারে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন সুদীর্ঘকালের জন্য। প্রায় বৎসর দুই আত্মগোপন করিয়া থাকিতে সক্ষম হইলেও সূর্য্য সেনও কিন্তু বেশি দিন আর নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতাতেই তিনিও একদিন ধৃত হইলেন। অবশেষে ১৯২৮ সালে বহু রাজনৈতিক বন্দীকে যখন মুক্তি দেওয়া হয় তখন তিনিও মুক্তিলাভ করেন।

ঐ বৎসরই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে কলিকাতায় এবং ভারতের নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ বিপ্লবিগণ তদুপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া সমবেত হন। সূর্য্য সেনও কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনে যোগদান করেন। কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের সমাপ্তির পর রাত্রিকালে কংগ্রেসের মণ্ডপেই বিপ্লবীদিগের এক স্বতন্ত্র আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। বিপ্লবীদিগের একযোগে কার্য্যপরিচালন সম্পর্কে সেই বৈঠকে নানা বিষয় আলোচিত হয় এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা লইয়াও আলোচনা চলে। বাংলার নেতৃবৃন্দের পক্ষে কিন্তু মতবৈষম্য দূরীভূত করিয়া একযোগে কার্য্য করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইল

না। একতাবদ্ধ হইবার এই বিফলতায় সূর্য্য সেন অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইলেন। আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা দেশ-সেবার বাসনাই তাঁহার মনে প্রবল ; সুতরাং তিনি যখন দেখিলেন যে সকলের সম্মিলিত-ভাবে কার্য্য চালাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই—তখন অগত্যা আপন সহকর্ম্মী ও অনুবর্ত্তীদিগকে লইয়া অন্য দলের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র-ভাবেই চট্টগ্রাম-অঞ্চলে ইংরাজের সহিত শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

বিদ্রোহের প্রস্তুতি

সঙ্গীদিগকে লইয়া সূর্য্য সেন আবার ফিরিয়া গেলেন চট্টগ্রামে—সঙ্গে রহিলেন নির্ম্মল সেন, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ। সেখানে তাঁহারা আবার নূতনভাবে দল ও কর্ম্মী-গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। অম্বিকা চক্রবর্ত্তী রহিয়া গেলেন কলিকাতাতেই। সেখানে থাকিয়া তিনি "যুগান্তর" দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের যোগাযোগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে আবার অস্ত্র-শস্ত্রও সংগৃহীত হইতে লাগিল। এই ব্যাপারে বিপ্লবীরা শশাঙ্ক চৌধুরী, অনুকূল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আব্দুল রেজ্জাক খান-এর নিকট হইতে প্রভূত সহায়তা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

চট্টগ্রাম শহরে ও শহরের আশে-পাশে অল্পদিনের মধ্যেই অনেকগুলি ব্যায়াম-কেন্দ্র স্থাপিত হইল। এই সকল ব্যায়ামাগারের পরিচালক নিযুক্ত হইলেন তরুণ কর্ম্মী অনন্তলাল সিংহ। এই কার্য্যের জন্য চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি হইতে তাঁহার জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে ছয় মাসের জন্য এক বৃত্তিরও ব্যবস্থা হইল। অপূর্ব্ব ব্যায়াম-কৌশল ও শক্তিমত্তার জন্য অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলের নাম চট্টগ্রামবাসীদের

নিকট অচিরেই অতি পরিচিত হইয়া উঠিল। এই সকল ব্যায়ামকেন্দ্র-সমূহ হইতেই সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন উপযুক্ত কর্ম্মীদের বাছিয়া বাছিয়া দলে গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

১৯২৮ সালের শেষাশেষি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সাণ্ডার্সের নিহত হওয়া এবং তদুপলক্ষে ভগৎ সিং, যতীন দাস প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের ধৃত হওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া যে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হয়, তাহা চলিতে থাকাকালেই ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বিপ্লবী যতীন দাস দীর্ঘদিন অনশন অবলম্বন করিয়া মৃত্যু বরণ করেন। ইহাতে সমগ্র ভারতব্যাপী যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ উপস্থিত হয়—সেই বিক্ষোভের ঢেউ গিয়া চট্টগ্রামেও পৌছায়। ছাত্র ও যুবকগণের মন ইহার ফলে অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে।

চট্টগ্রাম শহরের জে, এম, সেন হল প্রাঙ্গণে ১৯২৯ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে এক রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এতদুপলক্ষেও চট্টগ্রামে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা চলিতে থাকে। গণেশ ঘোষ এক বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী লইয়া সভাপতিকে অভ্যর্থনা করিয়া হল-প্রাঙ্গণে লইয়া যান। সুভাষচন্দ্র তাঁহার দৃপ্ত অভিভাষণে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীই ব্যক্ত করিলেন। চট্টগ্রামের এই সকল আন্দোলন ও অনুষ্ঠানের পশ্চাতে থাকিয়া কুশলী নেতা সূর্য্য সেন তাঁহার বৈপ্লবিক প্রস্তুতিকে দ্রুত সমাপ্তির পথে লইয়া যাইতেছিলেন। কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গৃহীত হইবার পর সূর্য্য সেন তাঁহার প্রস্তুতিকার্য্যকে আরও দ্রুত করিয়া তুলিলেন। ডাকাতির দ্বারা অর্থ-সংগ্রহের প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়া তিনি দলের সকল সদস্যকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দলের অর্থ-ভাণ্ডারে অর্থ-সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। কর্ম্মীরাও সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন আশাতিরিক্তভাবে।

চট্টগ্রামের মহিলাগণ বিনা দ্বিধায় তাঁহাদের স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি এই দলের সাহায্যে দান করিতে লাগিলেন।

১৯৩০ সালের প্রথম দুই-এক মাসের মধ্যেই সকল আয়োজন প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিল। এই সময় সূর্য্য সেনের অধীন দলটির সদস্যগণ আপনাদিগকে Indian Republican Army-র চট্টগ্রাম শাখার সদস্য বলিয়া পরিচিত করিতেছিলেন। সমগ্র চট্টগ্রামে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটাইবার জন্য বিশ্বস্ত নিষ্ঠাবান কর্ম্মী সংগৃহীত হইল—অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদও যতদূর সম্ভব যোগাড় হইল। দলের বহু বিপ্লবী আপন আপন আত্মীয়-স্বজনের লাইসেন্স-প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রও গোপনে চুরি করিয়া আনিয়া দলের অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। গোপনে গোপনে চলিতে লাগিল বোমা-প্রস্তুতির কার্য্য ও আগ্নেয়াস্ত্র চালনা শিক্ষা। সরকার-পক্ষ যেমন প্রসিদ্ধ বিপ্লবিগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপেব সংবাদ সংগ্রহের জন্য বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিপ্লবীরাও তাহার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে আপনাদের দলেও এক গোয়েন্দা-বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই দলের কর্ম্মিগণ পুলিশ ও সরকারী মহলের নানা সংবাদ সংগ্রহ করিতেন এবং বিপদের সম্ভাবনা জানিতে পারিলেই গুপ্ত-কেন্দ্রে আসিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেন। এই ব্যবস্থায় খুবই সুবিধা হইয়াছিল। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও বিপ্লবীদিগের বিশেষ কিছুই করিতে পারিতেছিল না।

দলের জন্য বোমা প্রস্তুতের কার্য্যে লিপ্ত থাকাকালে একদিন এক দুর্ঘটনা ঘটিল। আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে তারকেশ্বর দস্তিদার ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাস সাংঘাতিকভাবে আহত হইলেন। কি করিয়া গোপনে তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়—তাহা ভাবিয়া দলের সকলেই অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত সকল ব্যবস্থাই

হইল। অতিশয় গোপনীয়তা অবলম্বন করা সত্ত্বেও পুলিশ কিন্তু একদিন রামকৃষ্ণের আহত হওয়ার বিষয় জানিয়া ফেলিল এবং তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানে হানা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। দলের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহকারী বিভাগের কর্ম্মীরা পুলিশের এই সিদ্ধান্তের বিষয় জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই আসিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়ায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে পুলিশের আগমনের আগেই সরাইয়া দেওয়া হয় এবং পুলিশ গিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে।

আহত হইয়া তারকেশ্বর ও রামকৃষ্ণকে বহুদিন শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের সময়ও তাঁহারা আরোগ্য-লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া ঐদিনের ঘটনায় কোনও অংশই তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার নামক দলের আর একজন বিপ্লবীও ঐ একই ভাবে আর একদিন আহত হইলেন; তিনি কিন্তু অল্প-দিনেই আরোগ্যলাভ করেন এবং অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনেও যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন।

. উদ্যোগ পর্ব্বের চরম পর্য্যায়ে দক্ষ কর্ম্মীরা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অস্ত্রাগার প্রভৃতির অবস্থান, মজুত অস্ত্র-শস্ত্র ও উহাতে প্রহরীর সংখ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে গোপন-সংবাদ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন, কারণ ঐ বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান এবং তদনুযায়ী প্রস্তুতির উপর বিপ্লবীদের কার্য্যের সাফল্য-অসাফল্য বহুপরিমাণে নির্ভর করিতেছিল। ·

বিদ্রোহের পরিকল্পনা

গান্ধীজীর আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু হইবার পর ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম জেলার কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কার্য্যালয়ে বিপ্লবিগণের এক সভার অধিবেশন হয়। সূর্য্য সেন সেই সময় চট্টগ্রাম

জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কংগ্রেসী আন্দোলনের চরম পর্য্যায়েই বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ সুরু করিবার অনুকূলে উক্ত সভায় এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহার পর দলের বিশিষ্ট নেতাগণ তাঁহাদের আস্থাভাজন ও দক্ষ ব্যক্তিদের নামের কয়েকটি তালিকা সূর্য্য সেনের নিকট পেশ করিলেন এবং সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন সেই সকল তালিকা হইতে



রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

নিজেদের মনোমত ও সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য কর্ম্মীদের নাম বাছিয়া বাছিয়া প্রায় জন ষাটেক বিপ্লবীর এক চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করিলেন। কার্য্যের যে পরিকল্পনা অনুমোদিত হইল, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হইল—পুলিশ ও রেলওয়ে অক্সিলিয়ারি বাহিনীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করিয়া দেওয়া, সরকারী ট্রেজারি আক্রমণ,

জেলখানা ভাঙ্গিয়া কয়েদীদের মুক্তিদান, শ্বেতাঙ্গদের ক্লাব আক্রমণ করিয়া সম্ভব হইলে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে জীবন্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা প্রভৃতি। এইরূপে Indian Republican Army-র চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবী সহকর্ম্মীরা এক অসমসাহসিক যুদ্ধ-পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহাদের প্রিয় মাষ্টারদা'কেই তাঁহাদের সর্ব্বাধিনায়ক পদে বরণ করিলেন।

সর্ব্বাধিনায়ক সূর্য্য সেন তখন তাঁহাকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য এক নেতৃ-মণ্ডলী গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। এই ভাবে তাঁহার দ্বারা যে নেতৃ-মণ্ডলী গঠিত হইল, তাহাতে বহিলেন এই সকল বিপ্লবীরা—নির্ম্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গুড-ফ্রাইডের দিনে আইরিশ প্রজাতন্ত্র-বাহিনী ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহাই ইতিহাসে 'ঈষ্টার বিদ্রোহ' নামে প্রসিদ্ধ। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরাও ঐ দিবসেই তাঁহাদের বিদ্রোহের দিন ধার্য্য করিলেন। স্থির হইল যে ১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার, রাত্রি দশ ঘটিকার সময় চট্টগ্রামে ইংরাজের শক্তি-কেন্দ্রগুলিতে যুগপৎ আক্রমণ চালান হইবে। সূর্য্য সেন নেতাদিগকে দায়িত্ব ভাগ করিয়া দিলেন। পাহাড়তলীতে রেলওয়ে অক্সিলিয়ারি ফোর্সে'র যে প্রধান কেন্দ্র ও অস্ত্রাগার ছিল—তাহা আক্রমণ ও দখল করিবার ভার দেওয়া হইল নির্ম্মল সেন ও লোকনাথ বলের উপর। নিজাম পল্টনস্থ অস্ত্রাগার ও রিজার্ভ পুলিশ-লাইন আক্রমণ ও অধিকার করিবার ভার পাইলেন অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ। চট্টগ্রামে ইংরাজগণের সর্ব্বপ্রধান দুইটি শক্তিকেন্দ্র দক্ষতার সহিত আক্রমণ ও দখল করিবার ভার এইভাবে দলের যোগ্যতম নায়কগণের উপরই অর্পিত হইল। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কার্য্যালয়ে হানা দিয়া উহা ধ্বংস করিবার ভার অম্বিকা চক্রবর্ত্তী

প্রাপ্ত হইলেন ; আর রেলপথের ক্ষতি সাধন করিয়া সংযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দিবার ভার উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপর ন্যস্ত হইল। চারিটি দলের জন্যই গঠিত হইল স্বতন্ত্র বিপ্লবী-বাহিনী।

যে দলটি রেলপথ ধ্বংস করিবে—সেই দলটিকে দুই-একদিন পূর্ব্বেই আবশ্যক উপদেশাদি দান করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অবশিষ্ট তিনটি দলের নায়ক ও কর্ম্মীরা স্ব স্ব দলে বিভক্ত হইয়া ১৮ই এপ্রিল সকালের দিকে চট্টগ্রামের কংগ্রেস কার্য্যালয়ে নেতা সূর্য্য সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মাষ্টারদা সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশ দান করিলেন। অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বাধীন দলটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে গণেশ ঘোষের গৃহ হইতে যাত্রা করিবে বলিয়া স্থির হইল। লোকনাথ বল ও নির্ম্মল সেনের অধীন দল সেইরূপ লোকনাথের বাটী হইতে রওয়ানা হইবে ; আর অম্বিকা চক্রবর্ত্তী তাঁহার দল লইয়া যাত্রা করিবেন কংগ্রেস কার্য্যালয় হইতে। ঠিক হইল যে, প্রায় জন ত্রিশ বিপ্লবীর একটি স্বতন্ত্র দল রিজার্ভ পুলিশ লাইনের অল্প দূরে একটি জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষা করিবে—তাহাদের কাজ হইবে সঙ্কেত পাইবামাত্র পুলিশ-আর্ম্মারি আক্রমণকারী দলকে গিয়া সাহায্য করা। উপযুক্ত সময়ে সর্ব্বাধিনায়ক সূর্য্য সেনও তাঁহার রক্ষীবাহিনী লইয়া পুলিশ-আর্ম্মারিতে গিয়া উপস্থিত হইবেন। স্ব স্ব কর্ম্ম সমাপনান্তে সকল দলকেই পুলিশ-অস্ত্রাগারে গিয়া সমবেত হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল ; কারণ সর্ব্বাধিনায়কের প্রথম প্রধান কেন্দ্র সেইখানেই সামরিকভাবে স্থাপিত হইবে।

অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠন

একখানি ট্যাক্সিতে করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে লোকনাথের গৃহ হইতে লোকনাথ ও তাঁহার অপর কয়জন সঙ্গী রাত্রির অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলেন। লোকনাথের পরণে রঙিল সামরিক অফিসারের পোষাক

এবং অপর সকলের সাধারণ সৈনিকের পোষাক। তাঁহাদের নির্দ্দেশমত গাড়ীটি পাহাড়তলীর পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। পাহাড়তলী ষ্টেশন চট্টগ্রাম শহরের প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। যাইবার সময় তাঁহারা পথিমধ্যে রেলওয়ে অস্ত্রাগার অতিক্রম করিয়া গেলেন এবং দেখিলেন যে সবই শান্ত আছে। পাহাড়তলী ষ্টেশনের খানিকটা দূরে নির্জ্জন গ্রাম্য পথে ড্রাইভারকে গাড়ী থামাইতে বলা হইল। চালক গাড়ী থামাইলে তাহাকে রিভলভার দেখাইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। নিরুপায় চালক তাহাই করিল। বিপ্লবীরা তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া পথিপার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিলেন। মাঠের মধ্যে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ড্রাইভারেব হাত-পা দড়ি দিয়া বাঁধা হইল এবং তাহার পর ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া দেওয়া হইল। তাহাকে সেই অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়া বিপ্লবীরা গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। গাড়ী চালাইয়া লইয়া গেলেন জীবন ঘোষাল।

গণেশ ঘোষের গৃহেও এক অভিযাত্রী-বাহিনী সামরিক পোষাকে সজ্জিত হইল। সন্ধ্যার পর একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া ভাড়া স্থির করিবার অছিলায় উহার ড্রাইভারকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া হইল। ভাড়ার টাকা তাহাকে অগ্রিমই দেওয়া হইল বটে, কিন্তু তৎপরেই তাহার সম্মুখে রিভল-ভার উঁচাইয়া একেবারে নিঃশব্দ থাকিবার জন্য আদেশ দান করা হইল। তাহাকেও হস্ত-পদ বদ্ধ অবস্থায় সেই কক্ষে ফেলিয়া রাখিয়া বিপ্লবীরা তাহার গাড়ীখানি লইয়া বহির্গত হইয়া পড়িলেন। দলের একজন বিপ্লবীকে সেইখানেই রাখিয়া যাওয়া হইল ট্যাক্সির ড্রাইভারটিকে পাহারা দিবার জন্য।

বিপ্লবীদলের নিজস্ব গাড়ীতে অম্বিকা চক্রবর্ত্তীও তাঁহার অধীন বাহিনী লইয়া টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কার্য্যালয়ের দিকে ঐ একই সময়ে বাহির

হইয়া পড়িলেন। বোমা ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আর একদল বিপ্লবী পুলিশ-অস্ত্রাগারের নিকটবর্ত্তী একটি গুপ্তস্থানে পূর্ব্ব-পরিকল্পনা মত গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। রক্ষীবাহিনী সহ সর্ব্বাধিনায়ক সূর্য্য সেন দলের অপর একখানি গাড়ীতে করিয়া ঠিক সময়ে আসিয়া ঐ দলটিরই সহিত যোগদান করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল।

রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় চট্টগ্রামের তিনটি শক্তি-কেন্দ্রে বিপ্লবীরা একই সময়ে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। পুলিশ-অস্ত্রাগার আক্রমণের ভারপ্রাপ্ত অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের দল মোটরে করিয়া তীব্র গতিতে লোকালয় অতিক্রম করিয়া শহরের একেবারে শেষ সীমানায় তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়া উপনীত হইলেন। পাশাপাশি দুইটি ছোট ছোট পাহাড়—একটিতে পুলিশ বাহিনীর অস্ত্রাগার ও অপরটিতে রিজার্ভ পুলিশের ব্যারাক। তাঁহাদের মোটরখানি গিয়া পাহাড়ের পাদদেশে থামিল—তাঁহারাও গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলন দেখিয়া তাঁহাদিগকে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই ধারণা জন্মে। সিঁড়ি বাহিয়া সকলের অগ্রে অনন্তলাল এবং আর সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিতে লাগিলেন। উপরে উঠিতেই জনৈক প্রহরারত সিপাহী অনন্তলালকে কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ভাবিয়া সামরিক প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন জানাইতে গেল। অনন্তলাল সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে গুলি করিলেন এবং দলের অন্যান্য সকলকেও গুলিবর্ষণের আদেশ দিলেন। আদেশমাত্রেই প্রবল গুলি-বর্ষণ সুরু হইয়া গেল এবং অস্ত্রাগার আক্রমণ আরম্ভ হইল। এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আক্রমণে অস্ত্রাগারের প্রহরীরা ভীত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আক্রমণের সুবিধার জন্য বিপ্লবীরা আলোগুলি নিভাইয়া দিলেন। প্রাথমিক সাফল্য লাভ করিয়া বিপ্লবীরা

জয়ধ্বনি তুলিয়া সঙ্কেত করিতেই অনতিদূরে অপেক্ষারত সাহায্যকারী বাহিনী ও সর্ব্বাধিনায়ক সূর্য্য সেনের বাহিনী অবিলম্বে পুলিশ-অস্ত্রাগারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দলের শক্তি আরও বর্দ্ধিত করিলেন। শীঘ্রই অস্ত্রাগারটি সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত হইল এবং সেইখানেই পূর্ব্বপরিকল্পনামত স্থাপিত হইল সর্ব্বাধিনায়কের প্রধান কেন্দ্র। মৃত ও পলায়িত প্রহরী-দিগের পরিত্যক্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদ বিপ্লবীরা সংগ্রহ করিয়া লইলেন। আম্মারির ম্যাগাজিন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদও বাহির করিয়া লওয়া হইল। ইহার পর অস্ত্রাগারটিকে একটি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করিবার জন্য বিপ্লবীদিগকে প্রয়োজন মত নানা স্থানে পাহারায় বসানো হইল।

পাহাড়তলীর রেলওয়ে অস্ত্রাগারের নিকটও নির্দ্দিষ্ট সময়ে লোকনাথের দলের গাড়ীটি আসিয়া উপস্থিত হইল। জন ছয়েক বিপ্লবী পূর্ব্ব হইতেই গেটের নিকট অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং গাড়ীখানি আসিয়া উপস্থিত হইতেই side gate-এর দরজা ধাক্কা দিয়া খুলিয়া দিলেন। গাড়ীখানি অবাধে ভিতরে চলিয়া গিয়া সিঁড়ির মুখে থামিল। প্রহরারত সান্ত্রী চীৎকার করিয়া উঠিল,—"Halt! Who comes there?" লোকনাথ গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"Friends." ইহার পর সিঁড়ি বাহিয়া তিনি উচ্চ বারান্দার নিকট উঠিয়া গেলেন। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী-ভ্রমে সান্ত্রী তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য রাইফেলের কুঁদায় হাত দিতেই লোকনাথ বামহস্তে রাইফেল সমেত তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন এবং ডান হাতে তাহার বক্ষের উপর রাইফেল উঁচাইয়া ধরিয়া জানাইলেন যে, তাঁহারা বিপ্লবী দলের লোক এবং অস্ত্রাগার দখল করিবার জন্যই তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, সুতরাং সে পলাইয়া যাক। প্রহরীটি কিন্তু তাঁহার কথায় হঠাৎ সচকিত হইয়া বলপ্রকাশে তাহার

হাতখানি মুক্ত করিয়া লইল। লোকনাথ তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে গুলি করিলেন এবং তাহার দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। ইহার



অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের প্রধান সেনাপতি লোকনাথ বল

পরই তিনি দলের অন্যান্য বিপ্লবীদিগকেও গুলি চালাইতে নির্দ্দেশ দিয়া আক্রমণের স্থচনা করিলেন।

রেলওয়ে অস্ত্রাগার প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হইল। প্রহরীদের কে কোথায় পলাইতে লাগিল তাহার ঠিক রহিল না। নিকটস্থ সৈন্য-নিবাস ও ইউরোপীয়ান অফিসারের কোয়ার্টার হইতে যাহাতে অস্ত্রাগারের দিকে কেহ না আসিতে পারে, তজ্জন্য জনৈক বিপ্লবী আগ্নেয়াস্ত্র সহ সেই দিকে পাহারায় রত রহিলেন। সার্জ্জেণ্ট মেজর ফেরেল তখন নৈশ আহার গ্রহণ করিতেছিলেন; সহসা গোলাগুলি ও আর্ত্তনাদের শব্দে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকনাথ তাঁহাকে সকল ব্যাপারই জানাইলেন এবং চুপচাপ ভিতরে গিয়া বসিয়া থাকিতে বলিলেন। সার্জ্জেণ্ট ফেরেল তাহা শুনিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া আপনার রিভলভারটি লইয়া আবার বাহির হইয়া আসিলেন বিপ্লবীদিগকে বাধা দিবার জন্য। নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া লোকনাথ তাঁহাকে গুলি করিতে আদেশ দিলেন এবং সেই আদেশ তদ্দণ্ডেই পালিত হইল। সেই দিকে প্রহরারত রজত সেনের গুলিতে সার্জ্জেণ্ট ফেরেল ভূতলশায়ী হইলেন। তাঁহার স্ত্রী সেই সময় বাহির হইয়া আসিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে ফেরেল শুধু জানাইলেন—"All right, Darling! I am gone."

সকল ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া ফেরেল সাহেবের পত্নী আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কাতর-কণ্ঠে তিনি লোকনাথের নিকট তাঁহার নিজের ও শিশু সন্তানের জীবন-ভিক্ষা চাহিলেন। নির্ভয়ে গৃহাভ্যন্তরে থাকিবার জন্য লোকনাথ তাঁহাকে অভয় দিলেন।

প্রহরীদের পরিত্যক্ত অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া এবং দলের বিপ্লবীদের উপযুক্ত স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া ইহার পর অস্ত্রাগারটি নিরাপদ করার চেষ্টা হইল; কিন্তু বিপদ শীঘ্রই বাধিল। অল্পক্ষণ পরেই ক্যাপ্টেন

টেইট জন তিনেক শ্বেতাঙ্গ সহকর্ম্মীকে লইয়া মোটরে করিয়া পাহাড়-তলীর দিক হইতে বিপ্লবীদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলেন। অস্ত্রাগার তখনও ভাঙ্গা যায় নাই, সুতরাং বিপ্লবীদিগের নিকট অস্ত্র-শস্ত্রও তখন বিশেষ কিছুই ছিল না; বরং এতক্ষণ ধরিয়া সংগ্রাম চালাইয়া নিজেদের সঙ্গের রিভলভারেরও অনেকগুলি কার্য্যের অযোগ্য হইয়া গিয়াছিল। লোকনাথ কিন্তু তাহাতেও দমিলেন না। এই আকস্মিক পাল্টা আক্রমণেও তিনি অবিচলিতই রহিলেন। বোমা ও রিভলভার লইয়া এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে তিনি তাঁহার বাহিনীকে নির্দ্দেশ দিলেন। ইংরাজিতে তাঁহাকে ঐরূপ আদেশ দিতে শুনিয়াই গাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া দলবল সহ ক্যাপ্টেন টেইট পলায়ন করিলেন।

এদিকে বহু চেষ্টা করিয়াও কিন্তু অস্ত্রাগারের দ্বার খোলা বা ভাঙ্গা গেল না। নির্ম্মল সেন তখন এক চমৎকার পরামর্শ দিলেন। তাঁহার কথামত বিপ্লবীদিগের মোটর গাড়ীতে শিকল বাঁধা হইল এবং সেই শিকলের এক প্রান্ত অস্ত্রাগারের দরজার তালার সহিত লাগাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পর গাড়ীটি বিপরীত দিকে চালাইতেই প্রবল টানে তালা খুলিয়া গেল এবং অস্ত্রাগারের রুদ্ধ দ্বার বিপ্লবীদিগের নিকট উন্মুক্ত হইল।

কিন্তু বিপদ তাহাতেই কাটিয়া গেল না। সার্জ্জেণ্ট ব্লেকবার্ণ কয়েকজন সঙ্গীসহ অপর একখানি গাড়ীতে করিয়া আসিয়া হাজির হইলেন। বিপ্লবীরা তাঁহাদের উপর উপর্য্যুপরি গুলিবর্ষণ সুরু করিলে প্রাণভয়ে তাঁহারাও পলায়ন করিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উইলকিন-সনও (উইলসন?) এক সময় আপনার গাড়ীতে করিয়া গেটের কাছে আসিলেন এবং লোকনাথকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে কোনও ইউরোপীয় অফিসার ভ্রমে আশ্বাস দিয়া জানাইলেন যে, তিনিই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই ঝাঁকের পর ঝাঁক গুলি আসিয়া তাঁহার

গাড়ীতে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার রক্ষী জনৈক কনষ্টেবল ইহার ফলে নিহত হইল এবং ড্রাইভারটি হইল আহত। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে বিদ্যুৎগতিতে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া গাড়ীখানির তলায় আশ্রয় গ্রহণ করায় কোনও মতে প্রাণে রক্ষা পাইলেন। বিপ্লবীরা প্রস্থান করার পর তবে তিনি বাহির হইয়া পলাইয়া যান।

রেলওয়ে অস্ত্রাগারেই বিপ্লবীদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। হতাহতের সংখ্যাও এই জন্য এইখানেই অধিক। মোট ছয়জন ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ উক্ত ঘটনা উপলক্ষে ঐ দিন রেলওয়ে অস্ত্রাগারে নিহত হয়। কার্য্য শেষ করিয়া প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদ সংগ্রহ করিয়া বিপ্লবীরা পুলিশ-অস্ত্রাগারে তাঁহাদের নব-স্থাপিত প্রধান কেন্দ্র অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যাত্রাকালে রেলওয়ে অস্ত্রাগারটিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল। দুইটি অস্ত্রাগার একই সময়ে আক্রান্ত হওয়ার ফলে পুলিশ-অস্ত্রাগার রক্ষাকল্পে অক্সিলিয়ারি ফোর্সের সাহায্য গ্রহণ করা সরকার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

কার্য্য শেষ করিয়া লোকনাথের বাহিনীর ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া এদিকে সূর্য্য সেন যথেষ্ট চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অনন্ত সিংহের অধীনে এক সাহায্য বাহিনীকে তিনি রেলওয়ে অস্ত্রাগারের দিকে প্রেরণ করিলেন। অনন্ত সিংহ গিয়া দেখিলেন যে, কার্য্য ইতিমধ্যেই সমাধা হইয়া গিয়াছে এবং প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্রও গাড়ীতে বোঝাই করা হইয়াছে। সকলেই তখন একই সঙ্গে হেড-কোয়ার্টারে ফিরিলেন।

অম্বিকা চক্রবর্ত্তীও ঐ একই সময়ে তাঁহার বাহিনী লইয়া টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিসে হানা দিলেন। টেলিফোন অপারেটার আহমদুল্লাকে আক্রমণ করিয়া ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর সুইচবোর্ড ভাঙ্গিয়া যন্ত্রপাতি চূর্ণ করিয়া পেট্রোল সহযোগে

অফিসটিতে করা হইল অগ্নি-সংযোগ। টেলিফোন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সংবাদ পাইয়া তাঁহার বন্দুক লইয়া বিপ্লবীদের বাধা দিতে আসিলেন, কিন্তু বিপ্লবীদের গুলিবর্ষণে শীঘ্রই তাঁহাকে পলাইতে হইল। কার্য্য শেষে অম্বিকা চক্রবর্ত্তীও তাঁহার বাহিনীসহ তাঁহাদের প্রধান কেন্দ্রে গিয়া সমবেত হইলেন। পুলিশ-আর্ম্মারির বৃটিশ পতাকা ফেলিয়া দিয়া মহোল্লাসে বিপ্লবীরা সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলেন।

রেলপথ ধ্বংসকারী দলটিও ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়েই চট্টগ্রাম শহর হইতে প্রায় ৩৫-৪০ মাইল দূরবর্ত্তী ধুম এবং লাঙ্গলকোট ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে লাইনের ফিস্‌প্লেট অপসারিত করিয়া একখানি মাল গাড়ীকে লাইনচ্যুত করে। টেলিগ্রাফের তারও কাটিয়া দেওয়া হয় এবং রেলপথ নষ্ট কবিযা গতিরোধ করা হয় চট্টগ্রামগামী কলিকাতা মেলের।

বিপ্লবীদের অপূর্ব্ব দক্ষতায় অল্পক্ষণের মধ্যেই চট্টগ্রামে বৃটিশ-শাসন ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইউরোপীয় নর-নারীগণ শহর ছাড়িয়া গিয়া প্রাণভয়ে আশ্রয় লইল সমুদ্রের জাহাজে।

সর্ব্বাধিনায়ক সূর্য্য সেন

লোকনাথ ছিলেন সেদিনের সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। তাঁহার আদেশে সেই দিন রাত্রিকালে তাঁহার অধীন বিপ্লবী-বাহিনী পুলিশ-আর্ম্মারির প্রধান কেন্দ্রে সারি দিয়া দাঁড়াইল এবং আন্তরিক শ্রদ্ধায় সামরিক কায়দায় তাহাদের প্রিয় সর্ব্বাধিনায়ক মাষ্টারদা'কে প্রদর্শন করিল সামরিক সম্মান।

পরবর্ত্তী কর্ম্মপন্থা নিরূপণের জন্য প্রধান কেন্দ্রে সকলে যখন যুক্তি-পরামর্শ করিতেছেন, তখন পুনরায় শত্রুপক্ষ আক্রমণ আরম্ভ করিল। রাত্রি তখন আন্দাজ দুই ঘটিকা হইবে। পুলিশ-অস্ত্রাগারের অদূরেই ছিল

ওয়াটার-ওয়ার্কস। পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত হইয়া আসিয়া সেই ওয়াটার-ওয়ার্কস হইতে নূতনভাবে গুলিবর্ষণ সুরু করিলেন। বিদ্রোহীরাও গুলি চালাইয়াই দিলেন তাহার প্রত্যুত্তর। উভয় পক্ষের গুলিবর্ষণে নিস্তব্ধ রাত্রি আবার মুখর ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে উক্ত স্থান ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ-আর্ম্মারিতে আগুন লাগাইবার ব্যবস্থা হইতেছিল। আগুনও শীঘ্রই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই সময় কিন্তু সহসা আর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া বসিল। হিমাংশু সেন নামে দলের একজন যুবক আগুন ধরাইয়া দিবার কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদে আগুন ধরিয়া যাওয়ায় যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। দলের কয়েকজন তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পরিচ্ছদের আগুন শীঘ্রই নিভাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার শরীরের নানা স্থান অগ্নি-দগ্ধ হইল। অসহ্য জ্বালায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া কি করা যায়—তাহা লইয়া বিপ্লবীরা অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবিলম্বেই হিমাংশুর চিকিৎসা প্রয়োজন এবং তদুদ্দেশ্যে আবশ্যক নিরাপদ আশ্রয়ের। সেই ব্যবস্থাই করিবার জন্য অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত এবং জীবন ঘোষাল তৎক্ষণাৎ হিমাংশুকে লইয়া মোটর যোগে প্রস্থান করিলেন।

ওয়াটার-ওয়ার্কস হইতে এদিকে শত্রুপক্ষের গুলি অবিরামভাবেই পুলিশ-আর্ম্মারির উপর আসিয়া পড়িতেছিল। গণেশ ঘোষ প্রভৃতি ফিরিয়া না আসার জন্য বিপ্লবীদেরও স্থানত্যাগে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করিয়াও তাঁহারা যখন আর ফিরিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া সেই রাত্রেই চট্টগ্রাম শহর আক্রমণের পরিকল্পনাও বিপ্লবিগণকে ত্যাগ করিতে হইল। পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণই সমীচীন বলিয়া নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তদনুযায়ী

বিপ্লবীরা যাত্রা সুরু করিলেন পাহাড়ের দিকে। সকলেই সাধ্যমত অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদের বোঝা বহন করিয়া চলিলেন। পথ সম্বন্ধে দলটিকে নির্দ্দেশ দান করিতে লাগিলেন অম্বিকা চক্রবর্ত্তী।

বহু চেষ্টা করিয়াও কিন্তু বিপ্লবিগণের পক্ষে রাত্রির অন্ধকারে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। পুলিশ-আর্ম্মারি হইতে খানিকটা দূরে সুলুকবহর পাহাড়ের নিকট যাইতেই রাত্রি প্রভাত হইল; সুতরাং সেই পাহাড়েই তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সকাল বেলা-ই দলের জনৈক যুবককে গণেশ ঘোষ প্রভৃতির এবং শহরের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দল ছাড়িয়া শহরে আসার পর তাহার কিন্তু আর ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইল না। অপর সকলে বৃথাই তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। সারাদিন শুধু প্রতীক্ষাতেই কাটিয়া গেল। সঙ্গে কোনও খাদ্য-দ্রব্য না থাকায় ক্ষুধার তাড়নাতেও তাঁহারা কাতর হইয়া পড়িলেন। পাহাড়ে আম গাছের কচি কচি আম খাইয়া তাঁহারা যতদূর সম্ভব ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নের দিকে পুনরায় দীপ্তিমেধা চৌধুরী ও অমরেন্দ্র নন্দীকে অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল শহরের দিকে। শহরে গিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, শহরটি সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত—পুলিশী কর্ম্মতৎপরতার কোথাও নাম-গন্ধও নাই। কি একটা গভীর আতঙ্কে যেন সমগ্র শহরটা থমথমে হইয়া আছে। সকল কিছু দেখিয়া শুনিয়া রাত্রির অন্ধকারে তাঁহারা আবার পাহাড়ের পথ ধরিলেন। পথ তো ধরিলেন, কিন্তু কোন্ দিকে কোথায় যে যাইতে হইবে, তাহা আর তাঁহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পথ ভুল করিয়া সেই রাত্রির অন্ধকারে নানা স্থানেই তাঁহারা ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পাহাড়টির আর হদিস্ মিলিল না। অগত্যা বাধ্য হইয়াই ভোর বেলা পুনরায় তাঁহাদিগকে শহরে

ফিরিয়া আসিতে হইল; কিন্তু শহরে অবস্থানেও তো বিপদ আছে; সুতরাং দুইজনেই চলিয়া গেলেন দীপ্তিমেধাদের গ্রামের বাটীতে। এদিকে ২০শে এপ্রিল সকাল বেলা হইতেই চট্টগ্রাম শহরে নূতন নূতন সৈন্যবাহিনীর আগমন সুরু হইল।

১৯শে এপ্রিল গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রেরিত যুবক তিনজনের একজনও ফিরিয়া না আসায় বিপ্লবিগণ অনুমান করিলেন যে, শহরের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ, প্রেরিত যুবক তিনজন ধৃত হইয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। সুলুকবহর পাহাড়েও আর অপেক্ষা করা চলে না—কারণ পাহাড়টি পুলিশ-আর্ম্মারি হইতে অধিক দূরে নহে এবং বৃক্ষ-বিরল বলিয়া তথায় এতজন বিপ্লবীরও আত্মগোপন করিয়া থাকার বিশেষ সুবিধা নাই; সুতরাং রাত্রিতেই পাহাড়টি ত্যাগ করিয়া তাঁহারা আবার যাত্রা সুরু করিলেন। ফতেয়াবাদ পাহাড়ের নিকট গিয়া রাত্রি প্রভাত হইল এবং দিবালোকে পথ অতিক্রম করায় বিপদ থাকার জন্য সেই পাহাড়েই তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। ২০শে ও ২১শে এপ্রিল ঐ পাহাড়টিতেই কাটিয়া গেল। খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে সকলেই বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলেন। অদূরবর্ত্তী ফতেয়াবাদ গ্রামে অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর একটি পরিচিত গৃহ ছিল। দলের যুবকগণের জন্য কিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহের আশায় ২১শে তারিখে তিনি সেই গ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন এবং অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিলেন খাদ্য লইয়া। কয়দিনের পর যাহা হয় কিছু খাইতে পাইয়া বিপ্লবিগণ অনেকটা তৃপ্তিলাভ করিলেন।

কিন্তু খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ না করিয়া কতদিনই বা এইভাবে লুকাইয়া থাকা চলিবে? ইহার অপেক্ষা শহর আক্রমণের দায়িত্ব লওয়াও শ্রেয়ঃ। শেষ পর্য্যন্ত তাই শহর আক্রমণের সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল। তদনুযায়ী ২১শে তারিখে রাত্রিকালেই সকলে আবার যাত্রা আরম্ভ করিলেন শহরের দিকে। জালালাবাদ পাহাড় চট্টগ্রাম শহর হইতে প্রায় মাইল তিনেক

দূরে অবস্থিত। ২২শে এপ্রিল অতি প্রত্যুষেই বিপ্লবিগণ ঐ পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তখনকার মত ঐ পাহাড়েই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বাংলার হলদিঘাট জালালাবাদ

বিপ্লবীদের ধরিয়া বা ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দানের বিষয় ইতিমধ্যেই চারিদিকে প্রচার করা হইয়াছিল। সূর্য্য সেন প্রভৃতি নেতৃ-স্থানীয় ছয় ব্যক্তির প্রত্যেকের জন্য ঘোষিত হইয়াছিল ৫০০০৲ টাকা হিসাবে পুরস্কার। জালালাবাদ পাহাড়ে বিদ্রোহীদের অবস্থানের বিষয় জ্ঞাত হইতে কর্ত্তৃপক্ষের অধিক সময় লাগিল না। পুলিশ ও মিলিটারি কর্ত্তৃপক্ষ তখন তৎপর হইয়া উঠিলেন।

জালালাবাদ পাহাড়ের পশ্চাৎদিক দিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। অপরাহ্ণকালে ইষ্টার্ণ রাইফেলস্ ও সুর্ম্মাভ্যালি বাহিনী ক্যাপ্টেন টেইটের পরিচালনায় ট্রেণযোগে পাহাড়টির উদ্দেশে রওনা হইল। ট্রেণখানি প্রায় অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় পাহাড়টির নিকট গিয়া থামিল এবং সৈন্য-বাহিনী তাহা হইতে অবতরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে।

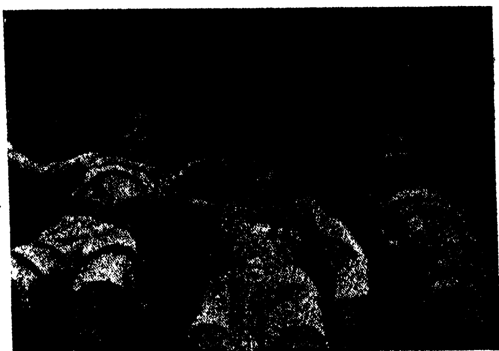
বিপ্লবীরাও পাহাড়ের উপর হইতে সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের দুর্ব্বল, অভুক্ত, পিপাসা-কাতর ও ক্লান্ত দেহে মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন নব বলের সঞ্চার হইল এবং শত্রুপক্ষের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তৎপর হইয়া উঠিলেন। প্রধান সেনাপতি হিসাবে লোকনাথ বল তাঁহার অধীন বাহিনীকে যথাযোগ্য স্থানে অতি দ্রুত সন্নিবিষ্ট করিতে লাগিলেন। মারণাস্ত্র হাতে লইয়া সকলে শত্রুর আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সৈন্যবাহিনী পাহাড় ঘিরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। রাইফেলের পাল্লার মধ্যে তাহারা যখন আগমন করিল, তখন লোকনাথ বজ্রকণ্ঠে তাহাদিগকে থামিবার জন্য সতর্ক করিয়া দিলেন এবং বিপ্লবীদিগকে আদেশ দিলেন গুলি চালাইবার জন্য। আদেশমাত্রে বৃষ্টির বারিধারার মত তাঁহাদের গুলি বৃটিশের সৈন্যবাহিনীর উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। সে আক্রমণ এমনই তীব্র হইল যে, তাহার বেগ প্রতিহত করা অস্ত্র-সজ্জিত সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর পক্ষেও সম্ভব হইল না, কাজেই আর অগ্রসর না হইয়া তাহারা বাধ্য হইল পশ্চাদপসরণ করিতে।

. ত্রিধা বিভক্ত হইয়া সৈন্যগণ তখন বিদ্রোহীদিগের সহিত পাল্লা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জালালাবাদের পাহাড়ে যে তীব্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সেদিন আরম্ভ হইল, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব্ব এবং রোমাঞ্চকর! "বন্দেমাতরম্" এবং "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনির সহিত চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবিগণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সেদিন প্রচণ্ড বিক্রমে এক রক্ত-রাঙা অধ্যায়ের যোজনা করিতে লাগিলেন। ইংরাজের সৈন্যবাহিনী সেদিন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল যে, কি প্রবল বাধারই সম্মুখীন না তাহাদিগকে হইতে হইয়াছে! বিপ্লবীদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ ছাত্র। তাঁহাদের অপূর্ব্ব দক্ষতায় উভয় পক্ষে সমানে সমানেই লড়াই চলিল। কর্ণেল স্মিথের অধীন আর একটি নূতন বৃহৎ বাহিনী এই সময় আবার আসিয়া পৌছাইল। রাইফেল, লুইসগান প্রভৃতি লইয়া তাহারা জালালাবাদের পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটি পাহাড় হইতে বিপ্লবীদের উপর মুহুর্মুহু গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিদ্রোহীরা একই সঙ্গে কয়েক দিক হইতে আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের মনোবল বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হইল না। বিচক্ষণ সেনাপতির মত সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করিয়া লোকনাথ যুদ্ধ পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

লুইস গানের গুলিতে কিন্তু বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। উহার গুলিতে তাঁহারা অধিক সংখ্যায় আহত বা নিহত হইতে লাগিলেন। শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি গুলিতে লোকনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা টেগ্‌রা

জালালাবাদ-যুদ্ধে নিহত শহীদ্‌বৃন্দ



নরেশ রায় ত্রিপুরা সেন বিধু ভট্টাচার্য্য



প্রভাস বল নির্ম্মল লালা শশাঙ্ক সেন

জালালাবাদ-যুদ্ধে নিহত শহীদবৃন্দ



জিতেন দাশগুপ্ত মধু দত্ত পুলিন ঘোষ



টেগ্‌রা মতি কানুনগো

গুরুতররূপে আহত হইয়া ছিটকাইয়া পড়িল। তাহার বয়স তখন আন্দাজ তের-চৌদ্দ বৎসর হইবে। সেই অবস্থাতেও টেগ্‌রা কিন্তু যে অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দিল—তাহা বিস্মৃত হইবার নহে। লোকনাথকে সে

তাহার অন্তিম অনুরোধ জানাইল যে, সে মরিতেছে বটে, কিন্তু যুদ্ধ যেন থামান না হয়।

টেগরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে আরও অনেকেই গুলিবিদ্ধ হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতে লাগিলেন। এইভাবে একে একে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন —ত্রিপুরা সেন, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য্য, প্রভাস বল, মধু দত্ত, নির্ম্মল লালা, জিতেন দাশগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক সেন, মতি কানুনগো, অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার আর অম্বিকা চক্রবর্ত্তী। তাঁহাদের রক্তে জালালাবাদ পাহাড়ের মাটি রঞ্জিত হইয়া গেল। যুদ্ধ কিন্তু তথাপি চলিতেই লাগিল। সন্ধ্যা প্রায় সাতটা নাগাদ একটি সুদীর্ঘ বংশীধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল—উহা যুদ্ধ বিরতির ইঙ্গিত। সৈন্যবাহিনী সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। বিপ্লবীরা বিজয়োল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বন্দেমাতরম্, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।"

২২শে এপ্রিল তারিখের জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ জমাট বাঁধিয়াছে। রণক্লান্ত জীবিত বিপ্লবিগণ মৃত সঙ্গীদিগের দেহ পর্ব্বতগাত্রে অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সব কয়টি দেহই সংগ্রহ করিয়া পাশাপাশি সাজান হইল। তারপর লোকনাথের আদেশে সকলে আবার সারি দিয়া দাঁড়াইলেন এবং সামরিক কায়দায় মৃত কর্ম্মীদের উদ্দেশে শেষ অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন।

সৈন্যবাহিনী প্রস্থান করিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্পসংখ্যক সৈন্যকে পাহারায় রাখিয়া গিয়াছিল। বিপ্লবীদিগকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখার উদ্দেশ্যে তাহারা পুনরায় গুলিবর্ষণ সুরু করিল। সূর্য্য সেন এবং অপরাপর সকলেই ইহা উপলব্ধি করিলেন যে, অবিলম্বেই জালালাবাদ পাহাড় ত্যাগ করিয়া

যাওয়া প্রয়োজন ; সুতরাং ক্লান্ত শরীরেই আবার সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন —অস্ত্র-শস্ত্রের বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া দুর্গম পথে আবার তাঁহারা যাত্রা সুরু করিলেন। একসঙ্গে সকলের অবতরণ করা সম্ভব হইল না বলিয়া কয়েকটি ক্ষুদ্র দলে তাঁহারা বিভক্ত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়ায় আর এক বিপদ বাধিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সূর্য্য সেন লক্ষ্য করিলেন যে, লোকনাথ এবং তাঁহার সঙ্গের দলটিকে দেখা যাইতেছে না। আশ-পাশে যতদূর সম্ভব খুঁজিয়া দেখা হইল—কিন্তু কোথায় গেলেন তাঁহারা? উচ্চৈঃস্বরে ডাক-হাঁক বা সঙ্কেতধ্বনি করিয়াও কোনও সাড়া লইবার উপায় নাই। নিকটে অবস্থানকারী শত্রুপক্ষ তাহা হইলে তাঁহাদের গতিবিধির বিবরণ জানিয়া ফেলিবে। সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন লোকনাথের দলটির সহিত মিলিত হইবার জন্য, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। তখন হইতে দুইটি দলে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইল। অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল যে, সূর্য্য সেন এবং তাঁহার দলটি জালালাবাদ পাহাড় হইতে অধিক দূরে আসিতে পারেন নাই। সারা রাত্রি পথ চলিয়া তাঁহারা মাত্র অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছেন! যাহা হউক, সেইখানের একটি পাহাড়ের গুহাতেই তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সকলের পক্ষেই তখন বিশ্রাম গ্রহণ একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল।

এদিকে জালালাবাদ পাহাড়ের উপর গভীর রাত্রিতে আহত অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। আশে-পাশে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি মৃতদেহের সহিত তিনিও শায়িত আছেন। জীবিত আর কাহাকেও সেখানে দেখা গেল না। অনুমানেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অবশিষ্ট সহকর্ম্মীরা স্থানত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনিও

তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতি কষ্টে পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। ফতেয়াবাদ গ্রামে তাঁহার যে পরিচিত ব্যক্তির গৃহ ছিল, তখনকার মত সেখানে গিয়া আশ্রয় লওয়াই তাঁহার ভাল বোধ হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি সেখান হইতেই বিপ্লবীদের জন্য খাদ্য আনিয়াছিলেন। রাত্রির অন্ধকারে তিনি আবার সেইখানেই ফিরিয়া গেলেন।

২৩শে এপ্রিল সকালের দিকেই পুনরায় পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ট্রেণে করিয়া জালালাবাদ পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইল। তোড়জোড় করিয়া প্রথমে তাহারা করিল আশে-পাশে সৈন্য সমাবেশ, তারপর সতর্কতার সহিত একদল উঠিতে লাগিল পাহাড়ের উপর। পূর্ব্বদিনের অভিজ্ঞতার ফলে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহারা প্রবল বাধার আশঙ্কা করিতে লাগিল—কিন্তু সেদিন আর কোন বাধাই আসিল না, একজন বিপ্লবীরও রাইফেল তাহাদের বিরুদ্ধে গর্জ্জিয়া উঠিল না। নির্ব্বিঘ্নে পাহাড়ে উঠিয়া তাহারা দেখিতে পাইল শুধু ডজনখানেক মৃতদেহ। মতি কানুনগো এবং অর্দ্ধেন্দু দস্তিদারের তখনও মৃত্যু হয় নাই, গুরুতররূপে আহত হইয়া তাঁহারা মৃতের মতই পড়িয়াছিলেন। অবশিষ্ট দশজনের মৃত্যু হইয়াছিল বহু পূর্ব্বেই। মতি কানুনগো অল্পক্ষণ পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন এবং অর্দ্ধেন্দুকে তৎক্ষণাৎ শহরস্থ জেল হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেইখানেই পরে তাঁহারও মৃত্যু হয়।

ক্যাপ্টেন টেইট ও কর্ণেল স্মিথের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, জালালাবাদে যুদ্ধের সময় বিপ্লবীরাই সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ চলিতে থাকাকালেই তাঁহারা নাকি এইরূপ একটা গুজব শুনিতে পান যে, সেইদিন রাত্রিতেই চট্টগ্রাম শহরের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক লুঠ করা হইবে। তাহা শুনিয়া তাঁহারা সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শহরে ফিরিয়া গিয়া রাত্রিকালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক পাহারা দিতে এবং পরদিন

২৩শে তারিখে প্রাতঃকালেই পুনরায় জালালাবাদ পাহাড়ে গিয়া বিপ্লবীদিগকে আক্রমণ করিতে সিদ্ধান্ত করেন।

যাহা হউক, মৃতদেহগুলি সনাক্তকরণ প্রভৃতির পালা সাঙ্গ হইতেই প্রায় অপরাহ্ন হইয়া গেল। তারপর সুরু হইল শব-সৎকারের ব্যবস্থা। পাহাড়ের উপরই এই উদ্দেশ্যে পাশাপাশি গুটি চারেক চিতা সজ্জিত করা হইল এবং তাহার উপর সব কয়টি মৃতদেহ স্থাপন করিয়া—করা হইল অগ্নিসংযোগ। চিতা-ধূমে জালালাবাদের আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা জীবন দিয়া এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গেলেন।

পাহাড়ের গুহায় বসিয়া বসিয়া নেতা সূর্য্য সেন ও দলের অন্যান্য সকলে নানান্ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ভবিষ্যতের ভাবনা একটু পরে ভাবিলেও ক্ষতি নাই -কিন্তু সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন কিছু খাদ্য এবং পানীয়ের। দলের সকলেই ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের আশায় তাই নির্ম্মল সেন অপর দুইজন বিপ্লবীকে সঙ্গে লইয়া লোকালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাহাড়ের পর বিস্তীর্ণ মাঠ—মাঠের শেষে লোকালয়। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ পথ চলিয়া তাঁহারা কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী লালুর হাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোলমালের আশঙ্কায় সন্ধ্যা রাত্রিতেই সেখানকার দোকানপাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—একখানি মাত্র দোকানের দ্বার কেবল সামান্য উন্মুক্ত ছিল। তাঁহারা সেখান হইতেই সামান্য খাদ্য ও খানিকটা পানীয় সংগ্রহ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া গেলেন পাহাড়ের গুহায়। খাইয়া-দাইয়া সকলে অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন। তারপর তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারেই পাহাড়ের গুহা ত্যাগ করিয়া গেলেন।

হালদা নদী ও কর্ণফুলীর সঙ্গমস্থল হইতে কয়েক মাইল দূরেই সূর্য্য

সেনের আপন গ্রাম নোয়াপাড়া। সেই গ্রামে পৌছাইতে হইলে নদী অতিক্রম করিয়া অপর পারে যাইতে হইবে। মাঝ রাত্রিতে দলবলসহ সূর্য্য সেন নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একখানি ষ্টীমলঞ্চ উজ্জল আলো ফেলিয়া নদীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পলাতক বিপ্লবীদের সন্ধানেই যে লঞ্চখানি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অতি কষ্টে তাঁহারা নদীর খর স্রোত ও পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া একখানি সাম্পানে চাপিয়া নদী পার হইলেন; তারপর পুনবার অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, যাহাতে রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই নোয়াপাড়া গ্রামের বাটীতে পৌছানো যাইতে পারে। অবশেষে সূর্য্য সেন দলবল লইয়া তাঁহার বাটীতে গিয়া হাজির হইলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন যে, অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের পর হইতে ইতিমধ্যেই তাঁহাদের বাটীতে দুইবার খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে।

কয়দিন পরে স্নানাহার সারিয়া বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ পাইলেও সেখানে যে অধিকক্ষণ থাকা নিরাপদ হইবে না—তাহা বিপ্লবীরা জানিতেন। তাই সেইদিনই রাত্রিকালে পুনরায় তাঁহারা যাত্রা সুরু করিলেন। কোয়েপাড়া গ্রামে বিনয় সেনের তত্ত্বাবধানে বিপ্লবীদের কয়েকটা আস্তানা ছিল। সূর্য্য সেন তাঁহার দলটিকে লইয়া সেইখানেই গিয়া উঠিলেন। বিনয় সেনের বাটীতে তাঁহাদের অবস্থানকালেই একদিন নিরুদ্দিষ্ট লোকনাথও কয়েকজন বিপ্লবীসহ আসিয়া তাঁহাদের সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন। সকলেরই আনন্দ ইহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং নূতন করিয়া কার্য্যারম্ভের জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। উক্ত বাটীতে থাকিতে থাকিতেই বিপ্লবীরা একদিন সংবাদ পাইলেন যে, অমরেন্দ্র নন্দী এক হস্তে পিস্তল ও অপর হস্তে রিভলভার লইয়া পুলিশের সহিত গুলি-বিনিময় করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পুলিশের গুলিতে

নিহত হইয়াছেন, অথবা আপন হস্তের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাহা সঠিকভাবে জানা যায় নাই।

অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের দিন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হিমাংশু সেনকে লইয়া গণেশ ঘোষ প্রভৃতির প্রস্থানের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হিমাংশুকে চন্দনপুরায় লইয়া গিয়া সুখেন্দু দস্তিদারের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করা হয় এবং সে দলের অন্যান্য বিপ্লবীরা গিয়া দলের অন্যতম বিপ্লবী রজতকুমার সেনদের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রজতকুমারের পিতা ও মাতা তাঁহাদিগকে অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখেন। পুলিশ কিন্তু সেখানে তাঁহাদের অবস্থানের বিষয় কোনও মতে জানিতে পারে এবং পরদিনই মধ্যাহ্নকালে গিয়া উক্ত বাটী খানাতল্লাস করে। বিপ্লবীরা কিন্তু এমনভাবে লুকাইয়া থাকেন যে, পুলিশ তাঁহাদের সন্ধান পায় না। অগত্যা তাহারা বিফল হইয়া ফিরিয়া যায়। ইহার পরেও আর একবার পুলিশ ঐ বাটীতে তল্লাসী চালায়।

হিমাংশু সেনকে অধিকদিন লুকাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। তিনি আহত অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকাকালেই পুলিশ তাঁহাকে ও সুখেন্দু দস্তিদারকে গ্রেপ্তার করে। হিমাংশুকে হাসপাতালে রাখা হয় এবং তাঁহার মৃত্যু হয় সেইখানেই। বিপ্লবী দলের অন্যান্য যাঁহারা ইতিমধ্যেই স্ব স্ব বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেককেই তাঁহাদের বাটীর অভিভাবকগণ আপনাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পুলিশের হস্তে অর্পণ করেন।

অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি স্থির করিলেন যে, ২২শে এপ্রিল তারিখে রাত্রিকালে তাঁহারা চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন, কারণ চট্টগ্রামে অবস্থান আর নিরাপদ নহে বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল। চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্ত্তী ভাটিয়ারি ষ্টেশন হইতে উক্ত দিবস রাত্রিকালে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও অপর একজন কুমিল্লা যাইবার

চারখানি টিকিট ক্রয় করেন। ষ্টেশন মাষ্টারের ইহাতে কেমন সন্দেহ হয় এবং তিনি তাঁহার সন্দেহের বিষয় ও টিকিটের নম্বরগুলি জানাইয়া কয়েকটি ষ্টেশনে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। ইহার ফলে যখন ফেণী ষ্টেশনে ট্রেণখানি গিয়া উপস্থিত হইল, তখন সেখানকার পুলিশ-কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে ট্রেণ হইতে অবতরণে বাধ্য করিলেন। ষ্টেশন ঘরে লইয়া গিয়া যখন তাঁহাদের শরীর তল্লাসী করিবার উদ্যোগ হইতেছিল, তখন সহসা তাঁহারা রিভলভার বাহির করিয়া পুলিশ দলকে আক্রমণ করিলেন। দুইজন কনষ্টেবল ও একজন দারোগা ইহার ফলে আহত হইল। ষ্টেশনের লোকজন ও অন্যান্য কনষ্টেবলগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল এবং চারিদিকে বাধিযা গেল এক হুলুস্থূল কাণ্ড। সেই সুযোগে গুলিবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহারা চারিজন পলায়ন করিলেন। জনৈক কনষ্টেবল অবশ্য একজনের নিকট হইতে একটি রিভলভার ছিনাইয়া লইতে সমর্থ হইল।

চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হওয়ার ফলে এত অধিক পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদ বিপ্লবীদিগের হস্তগত হইয়াছিল যে, ইংরাজ কর্তৃপক্ষ তাহাতে যথেষ্ট শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কি বিপুল এবং ব্যাপক প্রস্তুতির ফলে যে এই অসমসাহসিক লুণ্ঠনকার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছে—তাহা ভাবিয়া তাঁহারা হইলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। উপযুক্তভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধানকার্য্য চালাইবার জন্য পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ লোম্যান অন্যান্য দক্ষ অফিসারদের সহিত চট্টগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতার তৎকালীন পুলিশ-কমিশনার মিঃ টেগার্টও তাঁহার কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি করিলেন। বিপ্লবী দলটিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া হৃত অস্ত্র-শস্ত্রের পুনরুদ্ধার মানসে সমগ্র বঙ্গদেশের পুলিশ-কর্তৃপক্ষ তৎপর হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু "যুগান্তর" দল এবং তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের বিপ্লবী

দলটি পুলিশ-কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াই তাঁহাদের কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময় ডাঃ নারায়ণ রায়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে কলিকাতায় বিপ্লবীদের জন্য মারাত্মক ধরণের বোমা প্রস্তুত হইতে লাগিল। নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, জীবন ঘোষাল এবং আনন্দ গুপ্ত একে একে কলিকাতায় "যুগান্তর" দলের আড্ডায় আসিয়া সমবেত হইলেন। লোকনাথ বলও ক্রমে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং "যুগান্তর" দলের নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তাঁহাদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায় একটি দ্বিতল গৃহে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। "যুগান্তর" দলের জনৈক কর্ম্মী অবিবাহিত শশধর আচার্য্যকে নকল গৃহস্বামী সাজাইয়া সুহাসিনী দেবীকে তাঁহার নকল স্ত্রী সাজাইয়া সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল—আর তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত হইল বিপ্লবীদের ভার।

অনন্তলাল সিংহের আত্মসমর্পণ

যাহারা ইতিপূর্ব্বেই ধরা পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকারোক্তি প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিপ্লবীরা ইহাতে প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, কোনও উপযুক্ত নেতা নিকটে না থাকাতেই তাহাদের পক্ষে মনোবল অটুট রাখা সম্ভব হইতেছে না এবং তাহারই ফলে তাহারা দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তির মত অসহায়ভাবে নানারূপ স্বীকারোক্তি প্রদান করিতেছে। ইহা বন্ধ করিতে হইলে কোনও একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির তাহাদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। আলোচনার পর অনন্তলাল স্থির করিলেন যে, স্বেচ্ছায় তিনি পুলিশের নিকট ধরা দিবেন।

২৮শে জুন, ১৯৩০ সাল। গোয়েন্দা-বিভাগের প্রধান কেন্দ্র তখন ১৩নং ইলিসিয়াম রো-তে অবস্থিত। সেখানে গিয়া অনন্তলাল ফটকের প্রহরীর হস্তে তিনখানি পত্র প্রদান করিলেন। একখানি পত্র গোয়েন্দা-বিভাগের ডি-আই-জি মিঃ লোম্যানের নামে, একখানি ঐ বিভাগের স্পেশ্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নলিনী মজুমদারের নামে এবং একখানি ঐ বিভাগের ইন্‌সপেক্টর কুমারনাথ বসুর নামে। পত্রগুলি প্রহরী গিয়া তাঁহাদিগকে দিল—এবং স্ব স্ব পত্র পাঠ করিয়া তাঁহারা তিনজনেই অতিশয় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মিঃ লোম্যানকে অনন্তলাল লিখিয়াছিলেন—

Dear Mr. Lowman,—

I shall meet you on the 28th June, 1930. It is sure that you will never miss that opportunity to arrest me then and there. Yes, I am also quite ready for it. Never think it, please, that I am going to surrender. When a person surrenders? When he becomes quite helpless and finds no other means to protect him; then and then only he yields.

Am I helpless now? No, certainly not. I have arms to protect me; ample money to spend in time of need; many helpers to help me and good many shelters in Bengal, outside Bengal as well as outside India to abscond.

Now I am absconding with my friends and we are quite safe. But still I am allowing my arrest and why? Do you think I am repentant for any of my

action ? No, never, not a bit sorry. Then is it a mandate on me by any authority ? No, it is my personal matter and absolutely private.

I am,
Revolutionary
Ananta Lal Singha.

পত্র পাঠ করিয়া কুমারনাথ বসু তাড়াতাড়ি গেটের কাছে বাহির হইয়া আসিলেন এবং দেখিলেন যে সম্মুখেই অনন্তলাল সশরীরে দণ্ডায়মান। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হইল। অনন্তলাল এইভাবে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিলেন।

চন্দননগরের লড়াই

চন্দননগরের বাসায় তখনও রহিয়া গেলেন গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল। কয়েক মাস নির্ব্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল, কিন্তু একদিন তাঁহাদেরও বিপদ বাধিল। পুলিশ কোনও সূত্রে জানিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা কয়জন ঐ বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। পুলিশ তখন তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত হইল। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার তৎকালীন পুলিশ-কমিশনার সার চার্লস টেগার্ট কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী এবং কয়েকখানি গাড়ী বোঝাই পুলিশ ও সৈন্য লইয়া গভীর রাত্রিতে চন্দননগর অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন। চন্দননগর পৌঁছিতেই রাত্রি প্রায় ৩টা-৪টা হইল। গাড়ী দূরে রাখিয়া পদব্রজে গিয়া তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারে বিপ্লবীদের আস্তানাটি ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। বহু লোকের পদশব্দে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াই বিপ্লবীরা দেখিতে পাইলেন যে, গৃহটি সম্পূর্ণরূপে

পরিবেষ্টিত হইয়াছে—পলাইবার পথ নাই। তাঁহারা কিন্তু তথাপি হাল ছাড়িলেন না। বাটীর সংলগ্ন প্রাঙ্গণের অল্প দূরেই একটি প্রাচীর—প্রাচীরের অপর দিকে একটি পুষ্করিণী। প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া অপর দিকে যাইতে পারিলে হয় তো পলায়নের একটা উপায় হইতে পারে। আপন আপন অস্ত্র সঙ্গে লইয়া সেই চেষ্টাতেই তাঁহারা অন্ধকারে নীচু হইয়া প্রাচীরের নিকট পৌছিলেন এবং দ্রুত অথচ সন্তর্পণে উহা লঙ্ঘন করিতেও সক্ষম হইলেন; কিন্তু অপর দিকে যাওয়ামাত্র জনৈক সার্জ্জেণ্ট টর্চ্চের আলোয় তাঁহাদের দেখিয়া ফেলিল এবং দেখিবামাত্রই গুলি চালাইল। বিপ্লবীরাও তখন মরিয়া হইয়া গুলি চালাইতে লাগিলেন। অতজন পুলিশ ও সৈন্যের বিরুদ্ধে কিন্তু কতক্ষণই বা তাঁহারা লড়াই চালাইবেন? তাহাদের একযোগে গুলিবর্ষণের মুখে তাঁহাদের আত্মরক্ষা করাই কঠিন হইয়া উঠিল। শেষ পর্য্যন্ত লোকনাথ, গণেশ ও আনন্দ ধৃত হইলেন। জীবন ঘোষাল প্রাণ দিলেন পুলিশের গুলিতে। তাঁহার মৃতদেহ পুষ্করিণীর জলে পড়িয়াছিল—সকালবেলা তাহা উপরে উঠান হইল। শশধর আচার্য্য ও সুহাসিনী দেবী পুলিশের দ্বারা গুরুতররূপে প্রহৃত ও ধৃত হইলেন। চিত্ত মণ্ডল নামে নিকটবর্ত্তী অপর এক বাটীর জনৈক ব্যক্তি গুলি লাগিয়া নিহত হইল।

কালারপোল-এর সংগ্রাম

এদিকে কোয়েপাড়া গ্রামে সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন না। পাহাড়তলীর শ্বেতাঙ্গপাড়া আক্রমণের জন্য শীঘ্রই এক পরিকল্পনা রচিত হইল। উক্ত আক্রমণ পরিচালনায় রজতকুমার সেন, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, ফণীন্দ্র নন্দী এবং সুবোধ চৌধুরী অংশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির হইল। তদনুযায়ী তাঁহারা

৫ই মে তারিখে অস্ত্র-শস্ত্র ও বোমা লইয়া যাত্রা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া কিন্তু তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, আক্রমণ পরিচালনার মোটেই সুবিধা নাই, কারণ প্রচুর পরিমাণ ইংরাজ-সৈন্য আমদানী করিয়া সে অঞ্চলটিকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। অগত্যা ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা ব্যতীত তাঁহাদের আর উপায় রহিল না। ফিরিবার সময়ে তাঁহারা স্থির করিলেন যে রজতকুমারদের বাটীতে একবার ঘুরিয়া যাইবেন; কারণ রজতের জননী সকলকেই খুব ভালবাসিতেন।

রজতকুমারদের বাড়ীতে কয়েকবার থানাতল্লাসীর বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন পথে উপরোক্ত বিপ্লবী কয়জন রজতকুমারদের বাটীতে গিয়া হাজির হইলেন। রজত-কুমারের জননী তাঁহাদের জন্য তাড়াতাড়ি আহার্য্য প্রস্তুতে রত হইলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর আহার করা ঘটিয়া উঠিল না। রাত্রির অন্ধকার তখন সবেমাত্র জমাট বাঁধিতেছে, এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে, পুলিশ আসিতেছে। বিপ্লবীরা আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। ছুটিতে ছুটিতে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন গিয়া কর্ণফুলী নদীর তীরে। রজতকুমারের পিতাও নদীর ধার পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত গেলেন এবং একজন পরিচিত মাঝিকে তাহার সাম্পানে করিয়া উপরোক্ত কয়জনকে নদী পার করিয়া দিতে বলিলেন। মাঝিও তাঁহাদের লইয়া সাম্পান ছাড়িয়া দিল।

তাঁহাদের এই নদী পার হওয়ার সংবাদ পুলিশ পাইল। তাহারাও একখানি লঞ্চে করিয়া নদীর উপর তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত করিতে করিতে সাম্পানখানির অনুসরণ করিল। মধ্যে মধ্যে সাম্পান ও লঞ্চের ব্যবধান এতই কমিয়া আসিতে লাগিল যে, বিপ্লবীদের ধরা পড়িবার

আশঙ্কা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। আর সাম্পানে না থাকিয়া তীরে অবতরণ করাই তাঁহারা সমীচীন মনে করিলেন। তদনুযায়ী তাঁহারা কালারপোল নামক স্থানে পৌছিয়া সাম্পান হইতে তীরে নামিলেন। বিপ্লবীদের দৌড়াইয়া পলাইতে দেখিয়া সেখানকার জনৈক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিল—বিপ্লবীরা তাহাকে গুলি করিলেন। সে অঞ্চলের বহুলোক ইহার পর দল বাঁধিয়া তাঁহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। বিপ্লবীরা পুনরায় গুলি চালাইয়া আরও কয়েক জনকে আহত ও একজনকে নিহত করিলেন। বহু চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত কোনও মতে তাঁহারা কিছুক্ষণের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন।

পুলিশের দুইটি দল তো তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিলই, ইহার উপর আবার সেখানকার থানার দারোগাও সংবাদ পাইয়া পুলিশ দল লইয়া বহির্গত হইলেন বিপ্লবীদের সন্ধানে। মাঝ রাত্রিতে যেন চারিদিকে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। তাঁহারা কয়জনে ছুটিতে ছুটিতে একটি সেতুর নিকট আসিয়া পড়িলেন। বহু লোক ও পুলিশ সেখানে পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুবোধ চৌধুরী তাহাদের দ্বারা আহত ও ধৃত হইলেন। অপর কয়জন গুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে কোনও মতে পলায়ন করিলেন।

কর্ণেল ডেলাস্মিথ ও মিঃ ফার্ম্মারের অধীন দুইটি বাহিনীও অনুসন্ধান কার্য্যে বাহির হইয়াছিল। ফণীন্দ্র নন্দী তাহাদের একটি দলের হাতে ধরা পড়িলেন। অপর চারিজন ছুটিতে ছুটিতে ক্লান্ত হইয়া জনৈক মুসলমান গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া কিছু খাদ্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু একটু পরেই সেখানেও পুলিশ আসিয়া পড়িল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা গৃহস্বামীর নির্দ্দেশে নিকটবর্ত্তী এক শণের ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিলেন। এদিকে তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। অস্পষ্ট

আলোকে পুলিশ তাঁহাদিগকে শণ ক্ষেতের মধ্যে দেখিতে পাইল। মিঃ ফার্ম্মারের অধীন বাহিনী তখন মুহূর্ত্তমধ্যে জঙ্গলটি ঘেরাও করিয়া বিপ্লবীদিগকে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান করিল। বিপ্লবীরা আত্মসমর্পণ করিলেন না—বরং তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ সুরু করিলেন। দুই পক্ষে তখন আরম্ভ হইয়া গেল তীব্র ও কঠোর সংগ্রাম। গুলি লাগিয়া লাগিয়া তাঁহাদের চারিজনেরই শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল—কিন্তু তথাপি তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুর উপর তাঁহারা অবিশ্রান্তভাবে গুলিবর্ষণ করিয়াই চলিলেন। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী তাঁহাদের শৌর্য্য ও সাহসে চমৎকৃত না হইয়া পারিল না। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল যে, তাঁহারা চারিজনেই নিহত হইয়াছেন।

যথাসময়ে পুলিশ মৃতদেহগুলির ফটো গ্রহণ করিল, তারপর আগুন ধরাইয়া অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া সেগুলি মাটিতে পুতিয়া ফেলিল। চট্টগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীরা নূতন করিয়া আর একবার তাঁহাদের সংগ্রামশীলতার পরিচয় দিলেন।

সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন কোয়েপাড়া গ্রামের কেন্দ্রে থাকিয়া সকল সংবাদই শুনিলেন। শুনিলেন যে, তাঁহাদের দলের চারিজন বিপ্লবী ধরা না দিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। এদিকে তাঁহারা আরও সংবাদ পাইলেন যে, বিনয় সেনও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বিনয় সেনই কোয়েপাড়া গ্রামের বিপ্লবী আস্তানাগুলি দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিতেছিলেন। তিনিও ধৃত হওয়ায় কোয়েপাড়া গ্রামে আর অবস্থান করা তাঁহাদের যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। তাই অতঃপর সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন প্রভৃতি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আর একত্রে সকলের থাকা চলিবে না; জেলার নানা স্থানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্মগোপন করিয়া সকলকে থাকিতে হইবে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলা

এদিকে যাঁহারা গ্রেপ্তার হইলেন, তাঁহাদের লইয়াই বিচারপর্ব্ব সুরু করার ব্যবস্থা হইল। Chittagong Armoury Raid Ordinance নামে গভর্ণমেণ্ট এক আইন জারি করিলেন। চট্টগ্রামের জেলা জজ মিঃ ইউনি-কে চেয়ারম্যান করিয়া রায় বাহাদুর ডি, পি. ঘোষ (১৩-১০-৩০ তারিখ হইতে ইঁহার পরিবর্ত্তে রায় নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বাহাদুর) ও খান বাহাদুর মৌলভী আব্দুল হাই-কে লইয়া গঠিত হইল একটি স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যাল। বিচার আরম্ভ হইল ১৯৩০ সালের ২৪শে জুলাই তারিখ হইতে। চন্দননগর হইতে লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ প্রভৃতিকে তখনও গ্রেপ্তার করা হয় নাই, সুতরাং তখন কেবলমাত্র অনন্ত সিংহ ও অন্যান্য ধৃত বিপ্লবীদেরই বিচার আরম্ভ হইল। ইহার কিছুদিন পরে যখন চন্দননগর হইতে অপর কয়জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হইল, তখন তাঁহাদিগকে চট্টগ্রামে লইয়া গিয়া ধৃত অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত একত্র করিয়া আবার নূতন করিয়া বিচারকার্য্য আরম্ভ করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় জন ত্রিশ বিপ্লবী তখনকার মত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলায় অভিযুক্ত হইলেন। সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতি বহু বিপ্লবীর নামই তখনও কিন্তু ফেরারি আসামীর নামের তালিকাতেই রহিয়া গেল।

আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন শরৎচন্দ্র বসু, সন্তোষকুমার বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, অখিলচন্দ্র দত্ত, কামিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবিগণ। পূর্ব্বে যাঁহারা স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই বিচার চলিবার সময় উহা প্রত্যাহার করিলেন। এই ঐতিহাসিক মামলার বিচার দেখিবার জন্য আদালতে এবং আদালতের বাহিরে প্রত্যহ বহু জনসমাগম হইত। মামলার শুনানির

সময় মধ্যে মধ্যে আসামীগণ এবং বিচারক অথবা সরকারী উকিলের মধ্যে এরূপ তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হইত যে, পুলিশকেও কখনও কখনও শান্তি-স্থাপন কল্পে আহ্বান করিতে হইত। বিপ্লবীদের সঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকার করা হইলে তাঁহারা ভীষণ হট্টগোল সুরু করিতেন—যাহার দ্বারা বিচারকার্য্য পরিচালনা মোটেই সম্ভব হইত না। হয় তো বা কখনও তাঁহারা জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে থাকিতেন—অথবা "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির সহিত নানাবিধ শ্লোগান দিতে থাকিতেন। একদিন পাবলিক প্রসিকিউটর অভিযুক্ত বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অপমানজনক মন্তব্য করায় লোকনাথ তাঁহাকে সেই উক্তি প্রত্যাহার করিতে বলিলেন। পাবলিক প্রসিকিউটর তাহা না করায় লোকনাথ বজ্রকণ্ঠে উহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং ট্রাইব্যুন্যালের চেয়ারম্যান মিঃ ইউনি পর্য্যন্ত তাঁহাকে থামিতে বলিলেও তিনি নিরস্ত হইলেন না।

অগত্যা নিরুপায় মিঃ ইউনি ইংরাজ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্ল্যাটারকে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং আদালতের আদেশ পাইয়া মিঃ স্ল্যাটার আরও কয়েকজন সার্জ্জেণ্টকে সঙ্গে লইয়া লোকনাথকে শায়েস্তা করিবার জন্য আসামীদের কাঠগড়ায় প্রবেশ করিলেন। উত্তেজিত পুলিশ কর্ম্মচারিগণ লোকনাথের দিকে অগ্রসর হইতেই অন্যান্য বিপ্লবিগণও গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সঙ্কট এইরূপ ঘনাইয়া উঠিল যে, যে কোন মুহূর্ত্তে একটা ভয়ঙ্কর কিছু সংঘটিত হইবার আশঙ্কা হইতে লাগিল। বিপ্লবীদের ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতে লাগিল যে, পুলিশ কর্ম্মচারিগণ লোকনাথের কেশাগ্র স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহারা একযোগে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করিবেন।

ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মিঃ ইউনি তখন মিঃ স্ল্যাটারকে

সঙ্গিগণসহ বাহির হইয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন এবং তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত এইভাবেই ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি ঘটিল। বিপ্লবীরা বিজয়োল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

মিঃ ক্রেগ্ ভ্রমে তারিণী মুখোপাধ্যায়কে হত্যা

একদিকে যখন এইভাবে বিচারকার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তখন নেতা সূর্য্য সেন চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। পলায়িত অবস্থায় যে সকল বিপ্লবী তখনও জেলের বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই সাহায্যে তিনি বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ চালাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন সংবাদ পাওয়া গেল যে, বাংলার তৎকালীন ইন্সপেক্টর জেনারল-অফ-পুলিশ মিঃ ক্রেগ ১লা ডিসেম্বর তারিখে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনপথে চাঁদপুরে ট্রেণ হইতে ষ্টীমারে আরোহণ করিবেন। পুলিশের বড় কর্ত্তাকে এই সুযোগে হত্যা করিবার লোভ চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের নিকট দুর্নিবার হইয়া উঠিল এবং এই কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্ত্তী।

১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর শেষ রাত্রে চট্টগ্রাম মেলে মিঃ ক্রেগের চাঁদপুরে পৌছাইবার কথা এবং তাঁহার মত একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী যে ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরাতেই ভ্রমণ করিবেন—তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। ট্রেণখানি আগমন করিলে চাঁদপুরের ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া রামকৃষ্ণ ও কালীপদ ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলির মধ্যে মিঃ ক্রেগকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহারা একখানি কামরার মধ্যে সাহেবী পোষাকে সজ্জিত ফর্সা ও লম্বা চেহারার জনৈক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিলেন। দেখিয়াই তাঁহাদের

মনে হইল যে, ঐ ব্যক্তিটিই নিশ্চয় মিঃ ক্রেগ হইবেন। মনে হওয়া মাত্রই তাঁহারা সেই লোকটির উপরই বর্ষণ করিলেন রিভলভারের গুলি এবং নিমেষ মধ্যে স্থানত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আততায়ীদিগকে ঘটনাস্থলেই ধৃত করা সম্ভব হইল না।

যাঁহার উপর এইভাবে গুলি বর্ষিত হইল, তিনি কিন্তু আসলে মিঃ ক্রেগ্ নহেন তিনি ছিলেন ইন্‌সপেক্টর তারিণী মুখোপাধ্যায়। মিঃ ক্রেগের রক্ষী হিসাবে তাঁহার চাঁদপুর পর্য্যন্ত আসিবার কথা ছিল। মিঃ ক্রেগ্ ভ্রমে বিপ্লবীরা কিন্তু তাঁহারই উপর গুলি চালাইলেন। গুলিবিদ্ধ হইয়া তারিণী মুখোপাধ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণে সমগ্র চাঁদপুর ষ্টেশন সহসা অতিশয় চঞ্চল ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। চাঁদপুরের পুলিশ ঘাঁটিতে এবং আশ-পাশের অন্যান্য বড় বড় শহরগুলিতে অতি দ্রুত সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল। চাঁদপুর শহর হইতে যে সকল রাস্তা বিভিন্ন দিকে গিয়াছে—পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখিল সেই পথগুলির উপর।

চাঁদপুর হইতে প্রায় মাইল কুড়ি দূরে মেহের কালীবাড়ী নামক ষ্টেশন। সেই ষ্টেশনের নিকট পৌছিয়া ক্লান্ত রামকৃষ্ণ ও কালীপদ যখন একটু বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বি, সি, দাশগুপ্ত তাঁহার দলবল লইয়া মোটরে করিয়া সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। দুইজনকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাঁহাদের সন্দেহ হইল এবং তাঁহারা রামকৃষ্ণ ও কালীপদর দিকে অগ্রসর হইলে তাঁহারাও পলায়নের চেষ্টা করিলেন। পুলিশের দলটিতে বহু লোক থাকায় পলায়ন করা তাঁহাদের পক্ষে আর সম্ভব হইল না। রামকৃষ্ণ ও কালীপদ উভয়েই ধৃত হইলেন। তাঁহাদের শরীর তল্লাস করিয়া যে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়—চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার হইতেই তাহা লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

আলিপুরের স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালে মিঃ গার্লিক, মিঃ এন, কে, বসু ও খান আদিলজুমান চৌধুরীর নিকট ১৯৩১ সালের ৩রা জানুয়ারি হইতে রামকৃষ্ণ ও কালীপদর বিচার আরম্ভ হয়। বিচার শেষে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং বয়স অল্প বিধায় কালীপদ চক্রবর্ত্তীর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল। রামকৃষ্ণ ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন মেধাবী ছাত্র। চট্টগ্রামের বিপ্লবী-দলের তিনি ছিলেন একজন প্রধান কর্ম্মী। অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের পূর্ব্বে বোমা তৈয়ারি কার্য্যে লিপ্ত থাকাকালে একবার তাঁহার গুরুতররূপে আহত হওয়ার বিষয় ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এইভাবে তাঁহার ফাঁসি হইয়া যাওয়ায় বিপ্লবী দলটির খুবই ক্ষতি হইল।

চট্টগ্রাম ডিনামাইট-ষড়যন্ত্র মামলা

বিপ্লবীদিগের কার্য্যকলাপ কিন্তু চলিতেই লাগিল। বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদার ও বীরেন্দ্র দে-র অনুসরণরত থাকাকালে ১৯৩১ সালের ১৬ই মার্চ্চ বরমা নামক স্থানে পুলিশ ইন্‌সপেক্টর শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্য তারকেশ্বরের নিক্ষিপ্ত রিভলভারের গুলিতে আহত হইলেন। অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলা উপলক্ষে যে সকল বিপ্লবী জেলখানার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত বাহিরের বিপ্লবীদের শীঘ্রই যোগাযোগ স্থাপিত হইল। বিচারাধীন বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য ইহার পর আরম্ভ হইল এক ব্যাপক ষড়যন্ত্র। বন্দিগণকে মুক্ত করিবাব দুইটি উপায় ছিল। যখন তাঁহাদিগকে বিচারার্থ কোর্টে হাজির করা হইত, তখন সুবিধামত কোনও এক সময় বিস্ফোরণ ও ধ্বংসকার্য্য ঘটাইয়া আগ্নেয়াস্ত্র সহ রক্ষীদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করার সম্ভাবনা ছিল; অথবা জেলখানার অভ্যন্তরে বিস্ফোরক পদার্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রেরণ করিয়া উহার সাহায্যে

জেলখানার অংশ বিশেষ উড়াইয়া দিয়া বিপ্লবীদিগের পলায়নের পথ প্রশস্ত করা যাইত। দুইটি পরিকল্পনা লইয়াই কার্য্য স্থরু হইল এবং ইহার মূলে রহিলেন নেতা সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতি। আদালত-গৃহের প্রবেশ পথের নিকট ডিনামাইট স্থাপনের ব্যবস্থা হইল; কিন্তু বিপ্লবীদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ষড়্যন্ত্রটি অধিকদূব অগ্রসর হইতে পারিল না—অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। ১৯৩১ সালের ২রা জুন আদালত-গৃহের নিকটে অতি প্রত্যুষে বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ একটি আধারসহ একটি বালক সন্দেহবশে ধৃত হইল। ইহার পর পুলিশ ষড়্যন্ত্রের আভায পাইয়া তল্লাসী চালাইল বহু স্থানে এবং তাহার ফলে উদ্ধার করিল বৈদ্যুতিক তার, বাল্‌ব, বিস্ফোরক দ্রব্যপূর্ণ আধার প্রভৃতি। আদালতগৃহ এবং গোয়েন্দা পুলিশের কার্য্যালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে মারাত্মক রকমের বিস্ফোরক-দ্রব্যপূর্ণ আধার আবিষ্কৃত হয়। এই উপলক্ষে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া যে মামলা রুজু হয়, তাহাই ডিনামাইট ষড়্যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত।

ডিনামাইট ষড়্যন্ত্র মামলাতে আসামী ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর গুহ, অনিল রক্ষিত, নিবারণ ঘোষ, রবীন্দ্র সেন, সুশীল সেন, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায় এবং অপূর্ব্ব সেন। ১৯৩১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর এই মামলার যে রায় প্রদত্ত হয়, তাহাতে অর্দ্ধেন্দু, নিবারণ ও রবীন্দ্রের প্রতি তিন বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডের আদেশ হয় এবং সুশীল ও প্রফুল্লের কারাদণ্ড হয় দুই বৎসর হিসাবে। অনিল রক্ষিতও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অপূর্ব্ব সেন কিন্তু পলাতক হইয়া রহিলেন।

জেলখানা উড়াইয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্র

উপরোক্ত পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হইয়া গেলেও বিপ্লবীরা মোটেই হতাশ হইলেন না। অসীম অধ্যবসায় ও সতর্কতা সহকারে তাঁহারা অপর

পরিকল্পনাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জেলখানার ভিতর হইতে উহার অংশ বিশেষ বিস্ফোরণ ঘটাইয়া উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। জেলখানার মধ্যে তখন কঠোর সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। সেই ব্যবস্থাকে এড়াইয়া জেলখানার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের কথা কেহ কল্পনাও করিতে পাবে না; কিন্তু অন্যে যাহা কল্পনাও করিতে পাবে না—তাহাই বাস্তবে রূপায়িত করা চট্টগ্রামের বিপ্লবিগণের বৈশিষ্ট্য। তাই এই অসম্ভবও সম্ভব হইল। কুশলী নেতা সূর্য্য সেনের পরিচালনায় বিপ্লবীরা প্রচুর পরিমাণ অর্থ এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং জেলখানার কর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত করিবার জন্য উহা ব্যয়ও করিতে লাগিলেন অকাতবে। বহু কর্ম্মচারীকে এই ভাবে গোপনে বশীভূত করিয়া অতি সন্তর্পণে ও সাবধানতার সহিত বিবিধ দ্রব্য-সম্ভার জেলখানার মধ্যে বিপ্লবীদিগের নিকট চালান যাইতে লাগিল; কিন্তু ভবিতব্যকে কে খণ্ডন করিবে? তাই সফলতাব পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াও এই পরিকল্পনাটিও শেষ পর্য্যন্ত বানচাল হইয়া গেল।

১৯৩১ সালের জুন মাসেরই শেষাশেষি। জেলখানার কয়েদীদের প্রকোষ্ঠেরই সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের সংস্কার-কার্য্য চলিতেছিল। অল্প মৃত্তিকা খননের পরই সহসা মাটির তলা হইতে একটি ইলেকট্রিক বাল্‌ব পাইয়া সকলে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন এবং সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ জেলখানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে জানান হইল। সন্দেহ সকলেরই দৃঢ় হইয়া উঠিল। অতিশয় সাবধানতার সহিত আরও মৃত্তিকা খনন করিয়া যাহা পাওয়া যাইতে লাগিল—তাহাতে সকলেই হতবাক্ হইয়া গেলেন। মাটির তলা হইতে বাহির হইতে লাগিল ছোরা, তরবারি ও আগ্নেয়াস্ত্র—ইলেকট্রিক তার, বাল্‌ব ও বিস্ফোরক দ্রব্য। ষড়যন্ত্রটি

মধ্যপথেই এই ভাবে নষ্ট হইয়া গেল এবং কড়াকড়ির ব্যবস্থা আরও ভালভাবেই করা হইল।

পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার চট্টগ্রামের অধিবাসীদিগের উপর চলিতেছিল সমানেই। এক দণ্ডও জনসাধারণের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার উপায় ছিল না। খানাতল্লাসী, অত্যাচার ও গ্রেপ্তারে তাহাদের জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছিল। এই পীড়নের প্রতিবাদকল্পে এইবার ফেরারি বিপ্লবিগণ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন।

আসানুল্লা-হত্যা

খান বাহাদুর আসানুল্লা ছিলেন তৎকালে চট্টগ্রামের গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন সম্পর্কিত ব্যাপারের তদন্তকার্য্যে তিনি ছিলেন গভীরভাবে লিপ্ত। চট্টগ্রামে বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করায় তাঁহার দক্ষতা নেহাৎ কম ছিল না। বিপ্লবীদের ক্রোধ এইবার তাঁহার উপর গিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার সুযোগ তাঁহারা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুযোগও শীঘ্রই মিলিল। ১৯৩১ সালের ৩০শে অক্টোবর নিজাম পল্টনস্থ খেলার মাঠে চট্টগ্রামের ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠান এবং সেই উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণের দিন ধার্য্য হয়। বিপ্লবীরা স্থির করিলেন যে, ঐ দিবসেই আসানুল্লা সাহেবের জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিতে হইবে। এই গুরু দায়িত্বের ভার অর্পিত হইল হরিপদ ভট্টাচার্য্য নামক একটি তরুণ বালকের উপর। হরিপদর সহিত সূর্য্য সেনের মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছিল। হরিপদ ছিলেন একটি টোলের ছাত্র।

ফুটবলের ফাইন্যাল খেলার দিন চট্টগ্রামের প্রায় সকল উচ্চপদস্থ

সরকারী কর্ম্মচারীই খেলার মাঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পাহারা দিবার জন্য সেদিন পুলিশ ও মিলিটারির ব্যবস্থাও খেলার মাঠে রীতিমতই হইয়াছিল। তাহারই মধ্যে বালক হরিপদ আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

খেলা শেষ হইয়া গেল—পুরস্কার বিতরণও নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সমবেত দর্শকবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা একে একে তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। খান বাহাদুর আসানুল্লাও খেলার মাঠ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং গেটের নিকট কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত দাঁড়াইয়া আলাপ-পরিচয় করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য নিকটেই গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় সহসা উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুলিবর্ষণের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আসানুল্লা সাহেব রক্তাক্ত কলেবরে মাটির উপর লুটাইয়া পড়িলেন। সঙ্গের রক্ষীরা সেই হট্টগোলের মধ্যেই আগ্নেয়াস্ত্রসহ হরিপদকে ধরিয়া ফেলিল। কেবলমাত্র তাঁহাকে ধরিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইল না—প্রহার করিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলিল। আসানুল্লা সাহেবের শবদেহ এবং হরিপদকে লইয়া ইহার পর পুলিশ স্থান ত্যাগ করিল।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া চট্টগ্রামের অধিবাসীদের উপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন—তাহা যেন সীমা ছাড়াইয়া গেল। শাসন-ক্ষমতা যাঁহাদের দ্বারা অধিকৃত, তাঁহাদেরই দ্বারা যে এইরূপ নিষ্ঠুর নারকীয় উৎপীড়ন সম্ভব হইতে পারে, চট্টগ্রামের তৎকালীন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ না করিলে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনী চট্টগ্রামের প্রতিটি গৃহস্থের বাটীতে বিভীষিকার ছায়াপাত করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল ধ্বংস ও লুণ্ঠনকার্য্য। কেবলমাত্র তাহাই

নহে। আসানুল্লা সাহেবের হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া সুকৌশলে সাম্প্রদায়িকতারও সৃষ্টি করা হইল এবং পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনীর সহিত একদল গুণ্ডাও অবাধে লুঠতরাজ ও খুন-জখম করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনার হাত হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই রেহাই পাইল না।

আর কিশোর হরিপদ? তাঁহাকে লইয়া পুলিশ কি করিল? পুলিশের নারকীয় নিষ্ঠুরতার যত রকমের প্রক্রিয়া থাকিতে পারে, তাহা সমুদয়ই বালক হরিপদর উপর প্রযুক্ত হইতে লাগিল। হরিপদর কার্য্যের পশ্চাতে যে সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেনের পরিকল্পনা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইল না; সুতরাং তাঁহাদের তৎকালীন অবস্থান, পরবর্ত্তী পরিকল্পনা এবং তাঁহাদের দলটির সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহের আশায় হরিপদর উপর বিবিধ প্রকারের নির্য্যাতন চালান হইতে লাগিল। তাঁহার অঙ্গুলীর নখের পার্শ্বে সূচ ফুটান হইতে লাগিল, চার্জ্জ দেওয়া হইতে লাগিল ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারির—আবার আদর্শ শাস্তির নমুনা দেখাইয়া জনসাধারণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিবার জন্য এক বিরাট পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী হরিপদকে লইয়া প্রহার করিতে করিতে পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহার ফলে কখনও বা হয় তো তাঁহার চক্ষু, মুখ অথবা নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকে—আবার কখনও বা প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ফুলিয়া উঠে। সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে; কিন্তু হরিপদ কি এই অত্যাচারের নিকট নতি স্বীকার করিলেন? এত নির্য্যাতন চালাইয়াও কি পুলিশ তাঁহার নিকট হইতে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে একটি কথাও আদায় করিতে পারিল? না—তাহা পারিল না। একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার চরম ও পরম বিকাশ সেদিন

দেশবাসী হরিপদর মধ্যে দেখিয়া ধন্য হইল। সমস্ত অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্যেও তিনি রহিলেন—একইভাবে দৃঢ়, নির্ভীক ও অনমনীয়।

উপর্য্যুপরি চারিটি গুলির আঘাতে খান বাহাদুর আসানুল্লা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে হরিপদর বিচার শেষ হইল। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন আই-সি-এস বিশেষ জুরির সাহায্যে বিচার করিয়া হরিপদকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হইলে মৃত্যুদণ্ড রদ্ হইয়া হরিপদর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল।

এলিসন-হত্যা

চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলটি ইতিমধ্যে আশ-পাশের কয়েকটি জেলাতেও তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিতেছিলেন। জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ-গ্রহণকারী বিনোদ দত্ত দলের নেতাদের নির্দ্দেশে কুমিল্লায় গিয়া সেখানকার বিপ্লবী দলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সময় কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলিসন সেখানকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম্মীদিগের উপর এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগের উপর দমননীতি চালাইয়া অতিশয় কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিনোদ দত্তের পরিচালনাধীন কুমিল্লার বিপ্লবী দলটি মিঃ এলিসনের প্রাণ সংহার করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর হইতে বিপ্লবীরা মিঃ এলিসনের গতিবিধির উপর নজর রাখিতে লাগিলেন। হত্যার ভার অর্পিত হইল দলের অন্যতম কর্ম্মী শৈলেশ রায়ের উপর। হত্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে একটি পথের ধারে শৈলেশ রায় রিভলভার লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে মিঃ এলিসন সাইকেলে চাপিয়া সেই স্থানে আসা মাত্র তাঁহার উপর

গুলিবর্ষণ করিয়া চকিতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। কাহার দ্বারা যে হত্যা-কাণ্ড সাধিত হইল, তাহা কেহই তখন জানিতে পারিল না। বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিশ আততায়ীর কোনও সন্ধান পাইল না।

ডুর্ণোর উপর আক্রমণ

সরোজ গুহ ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলার অন্যতম নিরুদ্দিষ্ট আসামী। চট্টগ্রাম হইতে তিনি ঢাকায় চলিয়া যান। সেখানে গিয়া তিনি রমেন ভৌমিক নামক নোয়াখালির অপর একজন বিপ্লবীর সহিত ঢাকার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুর্ণোকে একদিন হত্যা করিবার চেষ্টা করিলেন। ঘটনার দিন অপরাহ্ণকালে সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিক একটি দোকানে বসিয়া মিঃ ডুর্ণোকে একটি মদের দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। ইহারই অল্পকাল পরে মিঃ ডুর্ণো যখন মদের বোতল লইয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বাহিরে অপেক্ষমান আপনার গাড়ীতে আরোহণ করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার উপর রিভলভারের গুলি বর্ষিত হইল। মিঃ ডুর্ণো আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং আততায়ী দুইজন অতিশয় তৎপরতার সহিত মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ঢাকায় ব্যাপকভাবে ধর-পাকড় ও খানাতল্লাস হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত আক্রমণকারীদের কোনও সংবাদই পুলিশ সংগ্রহ করিতে পারিল না।

এদিকে পটিয়া মহকুমার কচুয়াই গ্রামের এক গুপ্ত কেন্দ্র হইতে পুলিশ অম্বিকা চক্রবর্ত্তীকেও গ্রেপ্তার করিল। তাঁহাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তিনি পীড়িত ছিলেন। ১৯৩২ সালের ২৬শে আগষ্ট কলিকাতার মানিকতলা ষ্ট্রীটের একটি মেস হইতে বড়তলা থানার সাব্-ইন্‌সপেক্টর যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিপ্লবী হেমেন্দু ঘোষদস্তিদারকে গ্রেপ্তার

করেন। হেমেন্দুর ভ্রাতা অর্দ্ধেন্দুই জালালাবাদ যুদ্ধে আহত হইয়া পরে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। নোয়াখালি জেলার ধবলপুর গ্রামে সরোজ গুহ ধরা পড়েন। তাঁহাদের লইয়া অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বিচার আরম্ভ হয়। তাঁহাদের বিচারার্থ গঠিত স্পেশ্যাল ট্রাই-ব্যুন্যালের কমিশনার ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা জজ মিঃ এ, ডি, উইলিয়ামস্, মিঃ এ, এফ, এম, রহমান ও শ্রীনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়। মিঃ এ, ডি, উইলিয়ামস্ এই ট্রাইব্যুন্যালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলেন।

১৯৩২ সালের মাঝামাঝি সময়ে সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন চট্টগ্রামের ধলঘাটগ্রামে নবীন চক্রবর্ত্তীর বাটীতে। স্থানটি ছিল পটিয়ার মিলিটারি ক্যাম্প-এর মাইল চারেক দূরে। নবীন চক্রবর্ত্তীর বিধবা স্ত্রী সাবিত্রী দেবী-ই বিপ্লবীদের প্রতি আনুকূল্য করিয়া আপন বাটীতে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই সময়ই অপূর্ব্ব সেন, প্রীতিলতা ওয়াদেদার, কল্পনা দত্ত প্রভৃতি অন্যান্য বিপ্লবিগণও মধ্যে মধ্যে আলোচনার জন্য সেখানে গিয়া সমবেত হইতেন। বাছিয়া বাছিয়া মহিলা কর্ম্মীদিগকেও এই সময় দলে গ্রহণ করা আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রীতিলতা ওয়াদেদার

প্রীতিলতার ডাক নাম ছিল রাণী। তাঁহার পিতার নাম জগদ্বন্ধু ওয়াদেদার। জগদ্বন্ধুবাবু কাজ করিতেন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্মৃতিশক্তির প্রখরতা ও ক্রীড়া-কুশলতার জন্য প্রীতি আত্মীয়-স্বজনের নিকট বিশেষভাবে প্রশংসালাভ করিতেন। যথা-সময়ে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকায় গিয়া আই-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। ঢাকায় যে "দীপালি-সঙ্ঘ" ছিল, তাহাতে যোগদান করিয়া লাঠি ও অসি খেলায় প্রীতিলতা দক্ষতা অর্জ্জন করেন। প্রবেশিকা

পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ না করার জন্য তাঁহার মনে যে দুঃখ ছিল—আই-এ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করার পর উহা দূরীভূত হয়। অতঃপর তিনি বি-এ পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হন কলিকাতার বেথুন কলেজে এবং ১৯৩২ সালে বি-এ পরীক্ষা দিয়া চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান। বি-এ পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হন এবং নন্দনকানন উচ্চ ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

ধলঘাট-এর লড়াই

বাল্যকাল হইতেই প্রীতিলতা স্বদেশী ভাবধারায় মানুষ হইয়াছিলেন এবং দেশের কাজ করিবার জন্য তাঁহার মন আকুল হইত। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির আদেশ হইবার পর তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর পরিচয় দিয়া তিনি বহুবার কারাকক্ষে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের আদর্শ ও নিষ্ঠা তাঁহার জীবনে অতিশয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৯৩২ সালের ১১ই জুন তারিখে ধলঘাট গ্রামের গোপন আস্তানায় প্রীতিলতা যান সূর্য্য সেন প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং কয়েকদিন সেইখানেই বাস কবিতে থাকেন। বাড়ীটি ছিল দু'তলা। এই সময় সহসা একদিন বিপদ্ উপস্থিত হইল। ১৩ই জুন তারিখে ক্যাপ্টেন ক্যামারণ পুলিশ-দারোগা মনোরঞ্জন সেন সহ একদল পুলিশ ও সৈন্য লইয়া উক্ত বাটীতে গিয়া রাত্রিকালে হানা দিলেন। ক্যাপ্টেন ক্যামারণ স্বয়ং রিভলভার হস্তে লইয়া অতি উৎসাহবশতঃ মই বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন তাঁহাকে উপরে উঠিতে দেখিয়া রাত্রির অন্ধকারেই তাঁহার উপর গুলি চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের গুলিতে বিদ্ধ হইয়া ক্যাপ্টেন ক্যামারণ মই হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন এবং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিপ্লবীদিগকে গুলি চালাইতে দেখিয়া

পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীও নীচে হইতে গুলিবর্ষণ সুরু করিল। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া লড়াই চলিল উভয়পক্ষে। লড়াইয়ের মাঝখানেই নির্ম্মল সেন এক সময় গুলিবিদ্ধ হইয়া কক্ষতলে পতিত হইলেন। পুলিশের আগমন টের পাইয়াই সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন প্রীতিলতাকে পূর্ব্বেই নীচের তলায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উপরের তলায় গুলিবিদ্ধ নির্ম্মল সেনের কাতর আর্ত্তনাদ প্রীতিলতার কর্ণগোচর হইল। তিনি উপরে যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নীচের তলার অন্যান্য সকলে তাঁহাকে বিপদ নিশ্চিত জানিয়া উপরে যাইতে দিলেন না। কিছুক্ষণ পরেই আহত নির্ম্মল সেনের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

সূর্য্য সেন ও অপূর্ব্ব সেন তাড়াতাড়ি কোনও মতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং নীচের তলার সকলকে জানাইলেন যে, তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবেন। তাহা শুনিয়া প্রীতিলতাও তাঁহাদের সহিত পলায়নের জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য সেন শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া পারিলেন না। তাঁহারা তিনজনেই বাহির হইয়া পড়িলেন রাত্রির ঘোর অন্ধকারেই। বেশি দূর যাইবার আগেই কিন্তু পুলিশের গুলি ছুটিয়া আসিল তাঁহাদের দিকে; সেই গুলিতে অপূর্ব্ব সেন আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পুলিশ ও সৈন্যদলকে কোনও মতে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন কেবলমাত্র প্রীতিলতা ও সূর্য্য সেন।

তখন পুরা বর্ষাকাল। পথ-ঘাট কর্দ্দমাক্ত এবং জল-প্লাবিত। সূর্য্য সেন অতি কষ্টে প্রীতিলতাকে সঙ্গে লইয়া প্রায় মাইল চারেক দূরবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠপুরা নামক একটি গ্রামের এক কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের বাহিরে পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত এই কুটীরটিও বিপ্লবীদের একটি আস্তানা ছিল। কয়েকজন বিপ্লবী পূর্ব্ব হইতেই সেই কুটীরে বাস করিতেছিলেন।

এদিকে পরদিন সকাল বেলাই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর গর্ডন দলবল লইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গৃহমধ্যস্থ সকলের আত্মসমর্পণ দাবী করিলেন। তাঁহারা আসিয়া পড়ায় গৃহকর্ত্রী সাবিত্রী দেবী তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। অতঃপব লুইস্ গানের গুলি চালাইয়া বাটীর একাংশকে ধ্বংস করিয়া পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ভিতরে প্রবেশ কবিল। চতুর্দ্দিক তল্লাস করিয়া আবিষ্কৃত হইল ক্যাপ্টেন ক্যামাবর্ণ, নির্ম্মল সেন ও অপূর্ব্ব সেনের মৃতদেহ, রিভলভাব, কয়েকখানি প্রযোজনীয় পত্র, প্রীতিলতা ও বামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফটো, দুইখানি পুস্তকের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি। প্রাপ্ত প্রমাণ হইতে পুলিশ জানিতে পারিল যে, সূর্য্য সেন ও প্রীতিলতাও পূর্ব্বদিন রাত্রে ঐ বাটীতেই ছিলেন; কিন্তু সমস্যা প্রায় একরূপই রহিযা গেল। বর্ষাকালের সেই অন্ধকার রাত্রে জল-কাদা ভাঙ্গিয়া পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করিয়া কি ভাবে কোথায় পলায়ন করিলেন সূর্য্য সেন?

তল্লাসীর ফলে যে পাণ্ডুলিপি দুইখানি পাওয়া গিয়াছিল—তাহার একখানি ছিল গণেশ ঘোষের লিখিত। চট্টগ্রাম জেলে বসিয়াই ঐখানি তিনি রচনা করিয়াছিলেন এবং কৌশলে উহা বাহিরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতে বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস উহাতে বিবৃত হইয়াছিল। অপর একখানি পাণ্ডুলিপি ছিল সূর্য্য সেনের লেখা। অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের পূর্ণ বিবরণী উহাতে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহার উক্ত বিবরণী হইতে জানা যায় যে,বিপ্লবিগণ উক্ত অভিযানের জন্য ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং প্রায় ১২,০০০৲ টাকা, ১০,০০০ কার্ত্তুজ ও এক শতেরও অধিক লোক এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। কেবল ইউরোপীয়ান ক্লাবটি ঐদিন আক্রমণ করা সম্ভব হয় নাই; কারণ রাত্রি অধিক হওয়ায় উক্ত ক্লাবের সভ্যরা অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছিলেন এবং বিপ্লবীদের নিজেদেরও কতক-

গুলি অসুবিধা ছিল। ঐদিন ক্লাবটি আক্রমণ করা যায় নাই বলিয়া সূর্য্য সেন তাঁহার পাণ্ডুলিপিতে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

কল্পনা দত্তও যে এই সময় চট্টগ্রামের দলটির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হন এবং উক্ত কলেজ হইতেই পরীক্ষা দিয়া ১৯২৯ সালে আই-এস্-সি ও ১৯৩১ সালে বি-এস্-সি পরীক্ষা পাশ করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় চট্টগ্রামেই ফিরিয়া গিয়া বিপ্লবান্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। তাঁহারই চেষ্টায় বিপ্লবীদলের পক্ষে বহু অলঙ্কার ও অর্থাদি সংগৃহীত হয়। তাঁহাকে ও প্রীতিলতাকে—উভয়কেই নির্ম্মল সেন রিভলভার চালনা শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। পুলিশ একবার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলে তাঁহার বাটীর লোকগণ জামিন হইয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া আনেন।

১৯৩২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুরুষের ছদ্মবেশে কল্পনা দত্ত পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবের বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহের জন্য অপর দুইজন যুবকের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্দেহজনক গতিবিধিতে পুলিশ খবর পাইয়া সেখানে আসে এবং তাঁহাদের গ্রেপ্তার করে। কয়েকদিন পরে কল্পনা দত্ত জামিনে খালাস পান এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা চলিতে থাকাকালেই তিনি ডিসেম্বরের শেষাশেষি হইতে আত্মগোপন করেন।

পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবের উপর আক্রমণ

পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবের নিকট হইতে ধৃত হইয়া কল্পনা দত্ত প্রভৃতি যখন হাজতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ই ২৪শে

সেপ্টেম্বর তারিখে প্রীতিলতার নেত্রীত্বে উক্ত ক্লাব প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হইল।

ধলঘাটগ্রামের ঘটনার পর হইতেই প্রীতিলতা পলাতক জীবন যাপন করিতেছিলেন। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দিনে তিনি ছিলেন কাট্টলী গ্রামের আশ্রয়-কেন্দ্রে। সেই আশ্রয়-কেন্দ্র হইতেই মহেন্দ্র চৌধুরী, প্রফুল্ল দাস, কালী দে, শান্তি চক্রবর্ত্তী, সুশীল দে প্রভৃতি কয়েকজন তরুণ বিপ্লবী সন্ধ্যার খানিকটা পরে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গ্রাম্য দরিদ্র মুসলমানের পোষাকে প্রীতিলতার নেত্রীত্বে ক্লাবটি আক্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। প্রীতিলতা পরিধান করিয়াছিলেন সামরিক পরিচ্ছদ এবং উপরে একখানি চাদর দিয়া তাঁহার সেই পোষাক আবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যখন তাঁহারা ক্লাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন—তখন প্রায় রাত্রি দশটা-সাড়ে দশটা হইবে। জন পঞ্চাশেক শ্বেতাঙ্গ নর-নারী তখন ক্লাবঘরের অভ্যন্তরে পূর্ণোদ্যমে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়াছিল। অস্ত্রধারী প্রহরীর সংখ্যাও সেদিন সেখানে পাঁচ-ছয়জনের অধিক ছিল না। মহেন্দ্র ও সুশীল মুসলমান কোচ্‌ম্যানের ছদ্মবেশে গেট পার হইয়া ক্লাবের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহাদের দেখিয়া কাহারও কোন সন্দেহ হইল না। প্রীতিলতা ও তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীরা ক্লাবের পশ্চাতের একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমোদ-প্রমোদে মত্ত ইউরোপীয়দিগের উপর মহেন্দ্র ও সুশীল একই সঙ্গে বোমা নিক্ষেপ করিলেন। ক্লাবের পিছন দিকের দরজা হইতে প্রীতিলতা ও অন্যান্য সকলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষণ করিতে সুরু করিলেন রিভলভারের গুলি। বোমা ও গুলির আওয়াজে গোটা ক্লাব-ঘরটি কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল—চতুর্দ্দিক ভরিয়া উঠিল ধোঁয়ায়। ভিতরের শ্বেতাঙ্গ নরনারী ভয়ার্ত্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এদিকে-ওদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল। চট্টগ্রামের সূর্য্য সেনের দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবীদলটির

দ্বারাই যে ক্লাবঘরটি আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। সূর্য্য সেনের সেই দল—যে দলের নামে পুলিশের বড়কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া একজন সাধারণ শ্বেতাঙ্গ পর্য্যন্ত ভয়ে কম্পিত হইত।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা যাবৎ ক্লাবের দুই পার্শ্ব হইতে অবিশ্রান্ত আক্রমণ চলিতে লাগিল। অনেকেই হইল হতাহত—যাহারা আহত হইল, তাহারা পড়িয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কার্য্য শেষ হইলে প্রীতিলতা বিপ্লবীদিগকে স্থানত্যাগ করিতে বলিলেন। তাঁহার কথামত বিপ্লবীরা খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়া লক্ষ্য করিলেন যে, প্রীতিলতা স্বয়ং কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত ফিরেন নাই। ইহার কারণ কি, তাহা অবগত হইবার জন্য মহেন্দ্র চৌধুরী পুনরায় ক্লাবের দিকে ফিরিয়া গেলেন।

প্রীতিলতার জীবনদান

ইতিমধ্যে প্রধান সৈন্যনিবাসে ক্লাব-আক্রমণের সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সেখান হইতে ঘটনাস্থলের দিকে একগাড়ী সৈন্যও পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহেন্দ্র প্রীতিলতার নিকট ফিরিয়া যাইতে যাইতেই দেখিতে পাইলেন যে,চতুর্দ্দিকে তীব্র আলোকপাত করিতে করিতে দূর হইতে মিলিটারি গাড়ী অতি দ্রুত ছুটিয়া আসিতেছে। মহেন্দ্র তথাপি ত্বরিতগতিতে প্রীতিলতার নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহার তখনও সেখানে অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আত্মরক্ষার্থে তাড়াতাড়ি পলাইয়া আসিবার জন্য তিনি প্রীতিলতাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন; কিন্তু প্রীতিলতা ততক্ষণে পটাসিয়াম সায়নাইড বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আগ্নেয়াস্ত্রটি মহেন্দ্রের নিকট অর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন মাষ্টারদা'কে তাঁহার শেষ প্রণাম জ্ঞাপন করেন। প্রীতিলতা অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন সম্পর্কিত প্রথম দুইটি মামলার ফলাফল

এদিকে অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন সম্পর্কে যে দুইটি মামলা চলিতেছিল, তাহার ফলাফল একে একে প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রথম মামলাটির রায় প্রকাশিত হইল ১৯৩২ সালের ১লা মার্চ্চ। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, ফণীন্দ্র নন্দী, সহায়রাম দাস, আনন্দ গুপ্ত, সুবোধ চৌধুরী, ফকির সেন, সুখেন্দু দস্তিদার, লালমোহন সেন, সুবোধ রায় ও রণধীর দাশগুপ্তের প্রতি আদেশ হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের। নন্দলাল সিংহ দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অনিলবন্ধু দাসের বয়স অল্প বলিয়া তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য বোরষ্টাল স্কুলে পাঠাইবার আদেশ প্রদত্ত হইল। অবশিষ্ট সকলে মুক্তি পাইলেন।

অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন সম্পর্কিত দ্বিতীয় মামলাটির রায় প্রকাশিত হইল ১৯৩৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি। তিনজন বিচারপতির মধ্যে অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর দণ্ড লইয়া মতভেদ ঘটিল। মিঃ এ, এফ্, এম, রহমান তাঁহাকে চরম দণ্ডদানের হেতু নাই বলিয়া অভিমত প্রদান করিলেন, কিন্তু অপর দুইজন তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দানের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন ; সুতরাং অধিকাংশের মতে তাঁহার প্রাণদণ্ডেরই আদেশ হইল। সরোজকান্তি গুহের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ। হেমেন্দু দস্তিদার নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া খালাস পাইলেন।

সরোজকান্তি গুহ ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা হয়। ইহার ফলে সরোজকান্তির দণ্ড বহাল থাকে, কিন্তু অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর প্রাণদণ্ড রদ্ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ধলঘাট গ্রাম হইতে

মাত্র মাইল তিনেক দূরে নেতা সূর্য্য সেন গৈরলা গ্রামের এক আশ্রয়-কেন্দ্রে অবস্থান করিতেছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে বিপ্লবীরা এই সময় উক্ত কেন্দ্রে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে আবশ্যক আদেশ-নির্দ্দেশাদি গ্রহণ করিয়া যাইতেন। দলের অন্যতম বিশ্বস্ত কর্ম্মী ব্রজেন সেন অতি যোগ্যতার সহিত সেই আশ্রয়-কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান করিতেন।

তারকেশ্বর দস্তিদার এই সময় সূর্য্য সেনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু দায়িত্বও তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। স্বতন্ত্র এক আস্তানায় তিনি অন্যত্র থাকিতেন। তাঁহার ও সূর্য্য সেনের মধ্যে গুপ্ত যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। পলাতক অবস্থায় কল্পনা দত্তও তখন তাঁহাদের সহিতই অবস্থান করিতেছিলেন।

বিশ্বাসঘাতকতার কবলে সূর্য্য সেন

সূর্য্য সেনকে ধরাইয়া দিতে পারিলে বা তাঁহাকে ধরিবার উপযোগী সংবাদ সরবরাহ করিতে পারিলে কর্তৃপক্ষের পুরস্কারের পরিমাণ ৫০০০৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ইতিমধ্যে ১০,০০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। গৈরলা গ্রামের নেত্র সেন ঐ পুরস্কার পাইবার আশায় প্রলুব্ধ হইল। নেত্র সেন ছিল ব্রজেন সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাহার অবস্থা এক সময় ভালই ছিল, কিন্তু মদ্যপান ও অপব্যয়ের ফলে তাহার আর্থিক অবস্থা অতিশয় খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। এ হেন সময় নেত্র সেন যখন জানিতে পারিল যে, সূর্য্য সেন প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবী তাহারই নিকট-প্রতিবেশী বিশ্বাসদের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন, আর তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজেন সেন তাহাদের দেখা-শুনা করিতেছেন, তখন তাঁহাদের ধরাইয়া দিয়া সহসা অতগুলি টাকা পাইবার লোভ তাহার দুর্নিবার হইয়া উঠিল। ভিতরে ভিতরে পুলিশ-কর্তৃপক্ষের সহিত সে সকল ব্যবস্থাই পাকা করিয়া ফেলিল।

বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন তাহার কুকীর্ত্তির পরিচয় দিল ২রা ফেব্রুয়ারি। ঐদিন রাত্রির ঘনান্ধকারে পূর্ব্ব ব্যবস্থামত ক্যাপ্টেন ওয়ামস্‌লি কয়েকজন সহকারী অফিসার ও একদল সশস্ত্র সৈন্য লইয়া গিয়া গৈরলা গ্রামের বিশ্বাসদের বাটী পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। সূর্য্য সেনের সহিত তখন উক্ত আশ্রয়ে কল্পনা দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত, ব্রজেন সেন, মণি দত্ত ও শান্তি চক্রবর্ত্তী ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুলিশদলকে আক্রমণ আরম্ভ করিবার ইঙ্গিত স্বরূপ নেত্র সেন তাহার গৃহের প্রাঙ্গণ হইতে একটি আলো লইয়া কয়েকবার সঙ্কেত করিল। বাহিরে অপেক্ষারত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী তৎক্ষণাৎ বাড়ীটির উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। বিপ্লবীদের তখন অল্পকাল পূর্ব্বে আহার সমাধা হইয়াছে মাত্র এবং অসুস্থতাবশতঃ সূর্য্য সেন আহারের পর সেই মাত্র বমি করিয়া ফেলিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহারা সহসা আক্রান্ত হইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পুলিশদল সেই স্থানটিকে আলোকিত করিবার জন্য কয়েকটি রকেট বোমা ফাটাইল।

বাড়ীটির একদিকে ছিল জঙ্গল ও একটি নোংরা পুকুর। সূর্য্য সেন সেই মুহূর্ত্তেই স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, সেই দিকের পথ দিয়াই তাঁহাদের পলাইতে হইবে। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর দৃষ্টি উহার বিপরীত দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি উপর্য্যুপরি কয়েকবার উহার বিপরীত দিকে গুলি চালাইলেন। ইহার ফলও তাঁহার আশানুরূপই ফলিল। যেদিকে গুলি নিক্ষিপ্ত হইল, তাঁহারা বাড়ীটির সেই দিকের কক্ষেই আছেন মনে করিয়া পুলিশ ও সৈন্যদল সেইদিকেই তাহাদের অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিল।

রাত্রির অন্ধকারে বিপ্লবীরা অতঃপর সেই ঝোপ-জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সেদিকে ছিল একটি বাঁশের বেড়া। সুশীল দাশগুপ্ত সকলকে কোলে করিয়া একে একে সেই বেড়া পার করিয়া দিতে লাগিলেন।

সূর্য্য সেনকেও ঐ একইভাবে তিনি যখন বেড়া পার করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন একটি গুলি আসিয়া তাঁহার হাতে বিদ্ধ হইল। ইহার ফলে তিনি আর সূর্য্য সেনকে বেড়া পার করিয়া দিতে সক্ষম হইলেন না। যাঁহারা ইতিমধ্যেই বেড়ার ওপারে গিয়াছিলেন, তাঁহারা নোংরা পুকুরটি পার হইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। সেইদিকে শব্দ শুনিতে পাইয়া পুলিশ আন্দাজেই ঝোপ-জঙ্গলের উপর গুলি চালাইয়া চলিল।

একটি গাছের গুঁড়ি ধরিয়া তখন সূর্য্য সেন নিজেই বেড়াটি অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলেন। কোথায় যে কে আছে বা না আছে, রাত্রির অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইবার উপায় ছিল না। বেড়াটি ডিঙাইয়া তিনি যে স্থানে গিয়া অবতরণ করিলেন—মনবিহারী ক্ষেত্রী নামক জনৈক সশস্ত্র গুর্খা সেখানে সকলের অলক্ষ্যে অবস্থান করিতেছিল। সূর্য্য সেনকে আপন খপ্পরে পাইয়াই সে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং চীৎকার করিয়া অন্যান্য সকলকে নিকটে ডাকিল। মুহূর্ত্তমধ্যেই বহু সশস্ত্র গুর্খাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অফিসাররা আসিয়া সানন্দে অবলোকন করিলেন যে ধৃত ব্যক্তিটি আর কেহই নহেন, তিনি স্বয়ং নেতা সূর্য্য সেন। ব্রজেন সেনও ধরা পড়িলেন পলায়নরত অবস্থায়। সূর্য্য সেনের দেহ তল্লাস করিয়া পাওয়া গেল—চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার হইতে লুণ্ঠিত একটি রিভলভার ও কয়েক রাউণ্ড কার্ত্তুজ।

দেশের শত্রু নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতায় সূর্য্য সেন এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়িলেন। নেত্র সেনের উপর বিপ্লবীদের ক্রোধ ইহার ফলে দেখা দিল প্রচণ্ডরূপে। কিছুদিনের মধ্যেই আততায়ীর আঘাতে নেত্র সেনকে জীবন দিয়া করিতে হইল তাহার সীমাহীন পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

সূর্য্য সেন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসির আসামীর জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে অন্যান্য বন্দীদের হইতে পৃথক করিয়া সতর্ক

প্রহরাধীনে তাঁহাকে রাখা হইল। সংবাদ-পত্র বা পুস্তক প্রভৃতি প্রাপ্ত হইবার কোনও সুযোগই তাঁহাকে দেওয়া হইল না।

মাষ্টারদা গ্রেপ্তার হইবার পর চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের পরিচালনার ভার স্বাভাবিক ভাবেই গিয়া পড়িল তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর। তিনি তখন চট্টগ্রাম কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর বি-এস্-সি ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। কল্পনা দত্ত প্রভৃতি পলাইয়া গিয়া তারকেশ্বরের সঙ্গেই যোগদান করিয়াছিলেন। মাষ্টারদাকে কি করিয়া মুক্ত করিয়া আনা যায়—এই চিন্তাই ইহার পর সকলের মনে প্রধান হইয়া উঠিল। জেলের ভিতরের কয়েকজন বিপ্লবী অতি কষ্টে সূর্য্য সেনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা চালাইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সহিত জেলের বাহিরে অবস্থিত তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতিরও সংযোগ স্থাপিত হইল। সূর্য্য সেনের জেলখানা হইতে পলায়ন যাহাতে সম্ভবপর হয়, সে বিষয়ে কাজও অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেল অতি সন্তর্পণে। গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় ষড়যন্ত্রটি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সফল হইল না।

পটিয়া থানার দারোগা মাখন দীক্ষিত এই সময়ই একদিন বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে প্রাণ হারাইলেন।

১৯৩৩ সালের মে মাস। গহিরা গ্রামের পূর্ণ তালুকদারের গৃহে তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত প্রভৃতি অবস্থান করিতেছিলেন। ১৮ই মে তারিখে রাত্রিকালে একদল পুলিশ ও সিপাহী গিয়া সহসা বাড়ীটি ঘেরাও করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এইভাবে আপনাদিগকে পরিবেষ্টিত হইতে দেখিয়া বিপ্লবীরা নিরুপায় হইয়া তাহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিলেন। পুলিশ ও সৈন্যদলও ইহার প্রত্যুত্তরে গুলিবর্ষণ সুরু করিল। বিপ্লবীদের নিকট সেদিন অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদের পরিমাণ ছিল অল্প—সংখ্যাতেও তাঁহারা অধিক ছিলেন না। অপর পক্ষে পুলিশ ও সিপাহীদের সংখ্যা

তাঁহাদের তুলনায় সেদিন অনেক বেশি। তাহারা বাড়ীটির উপর অবিশ্রান্ত-ভাবে গুলিবর্ষণ করিয়া চলিল। বিপ্লবীরা বুঝিতে পারিলেন যে লড়াই চালাইয়া কোনই লাভ নাই। ইতিমধ্যেই পূর্ণ তালুকদার, শচীন্দ্র দাস ও মনোরঞ্জন দাস সিপাহীদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় পুলিশের পক্ষ হইতে অস্ত্র-ত্যাগ ও আত্ম-সমর্পণের আহ্বান আসিল। বিপ্লবীরাও স্থির করিলেন যে, সে অবস্থায় আত্ম-সমর্পণই সমীচীন হইবে।

বিপ্লবীরা তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র পুলিশের নিকট বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন—তারপর তাহাদের নির্দ্দেশমত হাত উপরে তুলিয়া গৃহ হইতে একে একে বাহির হইয়া আসিলেন। পুলিশ সকলকেই গ্রেপ্তার করিল। তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত প্রভৃতি এইভাবেই ধরা পড়িলেন পুলিশের হাতে।

অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন সংক্রান্ত তৃতীয় মামলার ফলাফল

সূর্য্য সেন,তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তকে লইয়া চট্টগ্রামঅস্ত্রাগার-লুণ্ঠন সংক্রান্ত তৃতীয় দফা মামলার বিচার আরম্ভ হইল ১৯৩৩ সালের ২৬শে জুন হইতে। জেলখানার নিকটবর্ত্তী গোয়েন্দা কার্য্যালয়ের একটি কক্ষে অতিশয় সতর্কতার সহিত তাঁহাদের বিচার চলিতে লাগিল। এই বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যাল গঠিত হইল—তাহাতে রহিলেন মিঃ W. Macsharpe, রজনী ঘোষ ও খন্দকার আলি তায়েফ। আলিপুর কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর সহায়তায় সরকার পক্ষে মামলা পরিচালিত করিতে লাগিলেন। অভিযুক্তদের পক্ষে রহিলেন কৌঁসলি জে, ঘোষাল, বিনোদলাল সেন ও রজনী বিশ্বাস। সরকার পক্ষে প্রায় ১২৫ জন সাক্ষীর

সাক্ষ্য গৃহীত হয় এবং ইহা প্রমাণ করা হয় যে তারকেশ্বরই ইন্‌সপেক্টর শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিচারে সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন—আর কল্পনা দত্তের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড। এখানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ছয় বৎসর কারারুদ্ধ রাখিবার পর শেষ পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ কল্পনা দত্তকে মুক্তি-দান করিয়াছিলেন।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যখন সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার চট্টগ্রাম জেলের condemned cell-এর নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে তাঁহাদের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের অনুবর্ত্তী কয়েকজন যুবকের দ্বারা ১৯৩৪ সালেব ৭ই জানুয়ারি পল্টন মাঠে আবার একটি আক্রমণ পবিকল্পনা স্থির হইল। দুইজন প্রিয় নেতার প্রতি প্রদত্ত ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনই বোধহয় এই আক্রমণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল। পল্টন মাঠে ঐদিন শ্বেতাঙ্গদিগের ক্রিকেট খেলা হইবার কথা ছিল, সুতরাং দর্শক হিসাবে সেদিন সাহেব-মেমের সংখ্যাও মাঠে কম হইবার কথা নহে। বিপ্লবীরা স্থির করিলেন যে, দর্শকগণের বসিবার আসনের নিম্নে ডিনামাইট স্থাপন করিয়া ক্রীড়াদর্শনরত বহু ইউরোপীয়কে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া একসঙ্গে উড়াইয়া দিবেন। এই উদ্দেশ্যে হিমাংশু ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণ চৌধুরী, হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য নামক চারিজন তরুণ যুবক উক্ত দিবসে দ্বিপ্রহরে ডিনামাইট বসাইবার জন্য খেলার মাঠে গমন করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগকে খেলার মাঠে দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি পুলিশের সন্দেহ হয় এবং শীঘ্রই বিপ্লবীদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধে। হিমাংশু ভট্টাচার্য্য ও নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রহরীদের গুলিতে প্রাণ হারাইলেন। ধরা পড়িলেন অবশিষ্ট দুইজন—হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরী। বিচারের পর পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের দুইজনের ফাঁসি হইয়াছিল।

সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসি

জেলের কর্ত্তৃপক্ষ সূর্য্য সেনকে একখানি রামায়ণ দিয়াছিলেন—কারা-কক্ষে তিনি পরম আগ্রহভরে উহাই পাঠ করিতেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির তারিখ গোপন রাখা হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের আশঙ্কা ছিল যে, পূর্ব্বাহ্নে ফাঁসির তারিখ প্রকাশ হইয়া গেলে শেষ পর্য্যন্ত আবার হয় তো কোন একটা গণ্ডগোল বাধিয়া বসিবে; কিন্তু এত গোপনীয়তা অবলম্বন করা সত্ত্বেও তারিখটি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলের রাজনৈতিক বন্দীগণ জেল-ওয়ার্ডারের নিকট হইতে গোপনে জানিতে পারিলেন যে উক্ত দিবসেই সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসি দেওয়ার আয়োজন চলিতেছে। সূর্য্য সেনও ইহা জানিতে পারিয়া অন্যান্য বন্দীদের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, সেদিন সন্ধ্যার পর তিনি তাঁহাদের উদ্দেশে কিছু বলিবেন। এই খবর পাইয়া সকল বন্দীই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

দিবসের শেষে পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। সন্ধ্যার অল্প পরে নেতা সূর্য্য সেন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর তাঁহার প্রকোষ্ঠের লৌহদ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। দুই হাত দিয়া লোহার গরাদ-গুলি ধরিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"বন্দেমাতরম্।" ঋষি বঙ্কিমের প্রচারিত মন্ত্র যেন সেদিন প্রাণময় হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের অপেক্ষা মাত্র। চট্টগ্রাম কারাগারের শত শত রাজবন্দী এতক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রিয় নেতার কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইবা-মাত্র তাঁহারা হইয়া উঠিলেন অধীর ও উদ্বেল। সূর্য্য সেনের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহারা মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে কারাকক্ষ মুখর করিয়া তুলিলেন। প্রত্যেকটি রাজবন্দী যেন তড়িতাহত হইয়া সজাগ হইয়া

উঠিলেন। জেলখানার স্বাভাবিক নিস্তব্ধতা রাজবন্দীদের কলরোলে টুটিয়া গেল।

কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশে সূর্য্য সেন যখন তাঁহার শেষ বক্তব্য নিবেদন করিতে সুরু করিলেন, তখন জেলখানা আবার নিস্তব্ধ হইল। সূর্য্য সেন বলিয়া চলিলেন,—"হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আমি তোমাদিকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবিগণ আমরা সারা ভারতের স্বাধীনতাকামীদের বন্ধু ও সমগোত্রীয়। বিশেষ কোন অঞ্চল বা দল-এর সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ পরিচালিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে অত্যাচারী বৈদেশিক শাসন-শক্তি অহরহ আমাদিকে শোষণ ক'রছে—সেই শাসন-ব্যবস্থার অবসান-ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য—আমাদের উদ্দেশ্য দরিদ্রদের বাঁচার ব্যবস্থা করা। যে বিদ্রোহের আগুন আমরা জ্বালিয়েছি—তোমরা তাকে নিভতে দিও না। জালিয়ানওয়ালাবাগের জবাব আমরা জালালাবাদে দিয়েছি। তোমরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ এনো না, দলাদলির সৃষ্টি ক'রে দেশের কাজ ভুলে যেয়ো না। ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির আদর্শকে তোমরা সার্থক ক'রে তুলো—শেষ রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত অকাতরে ঢেলে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন ক'রো। স্বাধীন দেশে প্রতিষ্ঠিত ক'রো প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেদিন আর তোমাদিকে কেউ বিদ্রোহী ব'লবে না—তোমরাই হবে সেদিন জাতির সব চেয়ে বড়ো সেবক। আমাদের শুভেচ্ছা তোমাদের যাত্রা-পথকে জয়যুক্ত ক'রবে। বন্ধুগণ! তোমরা সবাই বলো—বন্দেমাতরম্।"

শত শত বিপ্লবীকণ্ঠ পুনরায় চট্টগ্রাম জেলের কক্ষে কক্ষে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সমগ্র জেলখানাকে কাঁপাইয়া তুলিল—জানালা-দরজার কপাটগুলি কম্পিত হইতে লাগিল সেই ধ্বনির ঝঙ্কারে। সূর্য্য সেনের পর

তারকেশ্বরও তাঁহার প্রকোষ্ঠ হইতে বন্দীদের উদ্দেশে তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিলেন এবং তাহার পর গান গাহিতে সুরু করিলেন। জেলখানা তখন মিলিটারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে—জেলখানার বাহিরে কারফিউ অর্ডার-গ্রস্ত নিস্তব্ধ চট্টগ্রাম শহর। বন্দীদের মুখে শ্লোগান শুনিয়া ও তাঁহাদের মধ্যে অসাধারণ চাঞ্চল্য দেখিয়া জেলখানার প্রতি কক্ষে মিলিটারিরা গিয়া প্রবেশ করিল এবং বন্দীদিগকে প্রহার করিতে লাগিল নির্দ্দয়ভাবে। বহু বন্দী ইহার ফলে সাংঘাতিকভাবে আহত হইলেন। এত কাণ্ড করিয়াও কিন্তু বিপ্লবীদিগকে শায়েস্তা করা গেল না—জেলের কর্তৃপক্ষ অতিশয় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

ফাঁসির আসামীদের সাধারণতঃ ভোর বেলাতেই ফাঁসি দেওয়া হয়; কিন্তু বন্দীদের মধ্যে চাঞ্চল্য উত্তরোত্তর যেরূপ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে ভোরবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে কর্তৃপক্ষ আর সাহস করিলেন না। মধ্য রাত্রেই দুইজন বিপ্লবী-নেতার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে তাঁহারা উদ্যোগী হইলেন।

রাত্রির অন্ধকারে নিমজ্জিত চট্টগ্রাম কারাগার। সশস্ত্র প্রহরীরা গভীর রাত্রিতে আসিয়া অতি সন্তর্পণে সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বরের Condemned Cell-এর লৌহদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল। সূর্য্য সেন স্থির করিয়া রাখিয়া-ছিলেন যে শেষ পর্য্যন্ত বিপ্লবীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আমরণ সংগ্রাম করিয়া মৃত্যু-বরণ করিবেন। তাই প্রহরীরা দ্বার উন্মুক্ত করা মাত্র তিনি ভীম বিক্রমে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সর্ব্বাগ্রে যে প্রহরীটি ছিল, সূর্য্য সেনের ঘুষির আঘাতে সে ধরাশায়ী হইল। তারকেশ্বরকে তাঁহার প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করা হইলে তিনিও মাষ্টারদার দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিলেন। প্রহরীরাও নির্ম্মমভাবে তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল।

তাঁহাদের প্রকোষ্ঠ হইতে ফাঁসিমঞ্চ অধিক দূরে নয়—প্রহার করিতে করিতে প্রহরীরা তাঁহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিল। সূর্য্য সেনকে এত প্রহার করা হইল যে, তাঁহার নাকের হাড় ও দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল—সমগ্র মুখমণ্ডল ও পরিচ্ছদ রক্তে রাঙা হইয়া উঠিল। তারকেশ্বরও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁহারা চীৎকার করিতে লাগিলেন—"বন্দেমাতরম্", আর নিজ নিজ কক্ষ হইতে অন্যান্য বন্দীরাও চীৎকার করিতে লাগিলেন "বন্দেমাতরম্" বলিয়া।

সূর্য্য সেন শেষ পর্য্যন্ত সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। উন্মত্ত জেল-কর্তৃপক্ষ সে সব দিকে নজর দিলেন না। তাঁহারা সূর্য্য সেনের সংজ্ঞাহীন দেহটাই ফাঁসিমঞ্চে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইলেন এবং গলায় ফাঁসির রজ্জু পরাইয়া দিলেন। তারকেশ্বরের গলায়ও ফাঁসির রজ্জু পরাইয়া দেওয়া হইল। একই সময়ে একই মঞ্চে দুইজনের ফাঁসির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাত্রির অন্ধকারে চট্টগ্রামের জেলখানায় অতঃপর ঘৃণ্যতম অপরাধের অনুষ্ঠান হইল। লোকচক্ষুর অগোচরে ভারতবর্ষের দুইজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর আনুষ্ঠানিকভাবে ফাঁসি হইয়া গেল। ফাঁসির পর যে তাঁহাদের শবদেহ কোথায় লইয়া যাওয়া হইল—তাহাও কেহ জানিতে পারিল না।

জেলের বন্দীরা সেদিন সারা রাত্রি ধরিয়াই প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

চট্টগ্রাম-বিপ্লবের ইহাই ইতিহাস।

অসন্তোষের বহ্নি

ফাসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান ?

—নজরুল ইসলাম

মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার ঘটনা

১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অঞ্চলে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত হইতেছিল, অন্যান্য বিপ্লবীদের দ্বারা তদ্রূপ বাংলার অন্যান্য স্থানে এবং ভারতবর্ষের আরও দুই-একটি শহরে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠিত হইতেছিল। আইন-অমান্য ও বর্জ্জন-আন্দোলন মেদিনীপুর জেলায় চলিতেছিল পুরা দমেই। উক্ত জেলার দাসপুর থানার অধীন চেতুয়া হাটে বিলাতি-বর্জ্জন আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিল এবং বিলাতি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। এই আন্দোলন দমনকল্পে ১৯৩০ সালের ৩রা জুন দারোগা ভোলানাথ ঘোষ তাঁহার একজন সহকারী ও জনকয়েক কনষ্টেবলকে সঙ্গে লইয়া চেতুয়া হাটে গমন করিলেন ও চারিজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিলেন। ধৃত চারিজন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে শীতল ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক স্বেচ্ছাসেবককে দারোগা ভোলানাথ ঘোষ অতি সামান্য কারণে অপমান করিয়া সকলের সম্মুখেই প্রহার করিলেন। এই ঘটনায় উক্ত অঞ্চলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল এবং কিয়ৎকাল পরে কয়েক শত লোকের এক ক্রুদ্ধ জনতা সমবেত হইয়া পুলিশদলকে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা দারোগা ভোলানাথ ঘোষ ও তাঁহার সহকারী অনিরুদ্ধ সামন্তকে ধরিয়া লইয়া গেল। অত্যধিক প্রহারের ফলে ভোলানাথ ঘোষের মৃত্যু হইলে তাঁহার লাশকে বিকৃত করিয়া সনাক্তকরণের সকল সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। অনিরুদ্ধ সামন্তের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মুণ্ডটি অগ্নিতে দগ্ধ করা হয় এবং শরীরের অবশিষ্টাংশ জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

এই ঘটনার তদন্তের জন্য ঘাটালের মহকুমা-হাকিম ফজলুল করিম

সাহেব একদল সশস্ত্র পুলিশ লইয়া ৭ই জুন তারিখে কংসাবতী নদীর তীরে গিয়া উপনীত হইলে নদীর অপর পারে হাজার হাজার লোক সমবেত হইল এবং বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া হাকিমকে ফিরিয়া যাইতে বলিল। হাকিম তাহাদের উপর গুলিবর্ষণের আদেশ দিলেন। জনতার উপর সশস্ত্র পুলিশদল নির্ব্বিচারে গুলি চালাইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে একটি-দুইটি নহে—চৌদ্দজন লোক গুলির আঘাতে প্রাণ হারাইল। এই নৃশংস প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারাই অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটিল না। চেতুয়া হাটের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল ব্যাপিয়া জনসাধারণের উপর পুলিশী জুলুম এতই তীব্র আকার ধারণ করিল যে, সেখানকার অধিকাংশ লোকই ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইল। পেডি সাহেব ছিলেন এই সময় মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট।

মেদিনীপুরের একটি স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালে চেতুয়া হাটের ঘটনার জন্য বহু ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিয়া একটি মামলা সুরু করা হয়। এই ট্রাইব্যুন্যালে ছিলেন ২৪ পরগণার এডিসন্যাল জজ মিঃ লেথব্রিজ, রায় বাহাদুর সুরেশ-চন্দ্র সিংহ ও মহেন্দ্রনাথ দাস। বিচারে ১২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও ৫ জনের দুই বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড হয়। অপর সকলে মুক্তিলাভ করেন।

কলিকাতার ইণ্টালিতে ১৬নং গোপ লেনে বিনোদবিহারী রায় নামক জনৈক ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেন। তাঁহাদের বাড়ীটি ছিল বিপ্লবীদের একটি আড্ডা এবং ময়মনসিংহের বিপ্লবীদের সহিত ইঁহাদের যোগাযোগ ছিল। এই বাটী হইতে মনোরমা ঘোষ এবং বিনোদ-বাবুর পুত্র শিশিরকুমার বিস্ফোরক প্রস্তুতের উপকরণ কয়েক বোতল নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিড সঙ্গে লইয়া ১৯৩০ সালের ৭ই আগষ্ট ময়মনসিংহ যাত্রা করেন। তারক কর নামক অপর একজন যুবকও পথে ইঁহাদের সহিত যোগদান করেন। পুলিশ কিন্তু কোনও মতে ব্যাপারটি

জানিতে পারিয়া ময়মনসিংহের সরিষাবাড়ী থানায় সংবাদ পাঠাইয়া দেয় এবং ৮ই তারিখে ষ্টীমার জগন্নাথগঞ্জঘাটে পৌঁছিলে পুলিশ তাঁহাদের তিনজনকে আটক করিয়া সরিষাবাড়ী থানায় লইয়া যায়। কলিকাতায়ও এই উপলক্ষে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মিঃ গার্লিক, লালবিহারী দাস ও রায় বাহাদুর নলিনীকান্ত বসুকে লইয়া গঠিত আলিপুরের এক স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালে ইঁহাদের বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে তিনজনের পাঁচ বৎসর হিসাবে এবং দুইজনের তিন বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড হইল। একজন বিচারে খালাস পাইলেন বটে, কিন্তু অর্ডিনান্স বলে তাঁহাকেও আটক রাখা হইল।

টেগার্ট সাহেবকে হত্যার চেষ্টা

টেগার্ট সাহেবের উপর বিপ্লবীদের ঘৃণা ও ক্রোধ বহুদিন হইতেই পুঞ্জীভূত ছিল। বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা ইতিপূর্বে টেগার্ট ভ্রমেই অপর এক ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে পুনরায় টেগার্ট সাহেবের জীবন-নাশের চেষ্টা হইল। ২৫শে আগষ্ট তারিখে দীনেশচন্দ্র মজুমদার, অনুজ সেনগুপ্ত এবং অপর একজন যুবক বোমা ও রিভলভার লইয়া ডালহৌসি স্কোয়ারে একটি মোটর গাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বেলা আন্দাজ এগারোটা-সাড়ে এগারোটার সময় টেগার্ট সাহেবের গাড়ীটি যখন তাঁহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন তাঁহারা সেই গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিলেন। বোমা বিস্ফোরিত হইল বটে, কিন্তু টেগার্ট সাহেব রক্ষা পাইলেন। তখন দীনেশ ও অনুজ একদিকে এবং অপর যুবকটি আর একদিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। হেয়ার ষ্ট্রীটে গিয়া দীনেশ ধরা পড়িলেন এবং পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া অনুজ আত্মহত্যা করিলেন। অপর যুবকটি পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন।

অনুজ ছিলেন খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামের অধিবাসী—দীনেশের বাড়ী ছিল বসিরহাটে। ধৃত হইবার পর দীনেশের নিকট হইতে এলুমিনিয়ামের খোলযুক্ত বোমা, রিভলভার ও কার্তুজ পাওয়া যায়। অনুজের শরীর তল্লাস করিয়াও পাওয়া যায় ঐ একই ধরণের বোমা ও রিভলভার। পরে ইহা প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিভলভার চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার হইতে লুণ্ঠিত অস্ত্র ছিল। দীনেশচন্দ্রের বিচার হয় একটি স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালে। ১৮ই সেপ্টেম্বর মামলার রায় প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

ডালহৌসি স্কোয়ারের ঘটনার পর পুলিশ উক্ত তারিখেই কৈলাস বসু ষ্ট্রীটস্থ ডাঃ নারায়ণ রায়ের বাটী খানাতল্লাস করে এবং এই তল্লাসী কার্য্য কয়েকদিন যাবৎ কলিকাতার অন্যান্য স্থানেও চলিতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ দত্তের বাসা তল্লাস করিয়া পুলিশ গান কটন, বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ ও এলুমিনিয়ামের shell প্রাপ্ত হয়। আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টে একটি স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালে ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে ডাঃ নারায়ণ রায়, সুরেন্দ্র দত্ত, অম্বিকা রায়, ভূপাল বসু, রসিকলাল দাস, যতীশ ভৌমিক, অদ্বৈত দত্ত প্রভৃতিকে অভিযুক্ত করিয়া এই উপলক্ষে একটি মামলা রুজু করা হয়। ইঁহাদের কাহারও কাহারও নিকট হইতে যে কার্তুজ ও বোমা পাওয়া যায়—তাহা ডালহৌসি স্কোয়ারের ঘটনায় দীনেশচন্দ্র ও অনুজের নিকট হইতে প্রাপ্ত কার্তুজ ও বোমারই অনুরূপ ছিল বলিয়া এই মামলাকে ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা ষড়যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত করা হয়। স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যাল দুইজনকে মুক্তি দিয়া অবশিষ্ট অভিযুক্তদের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করেন। ট্রাইব্যুন্যালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল হইলে ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই হাইকোর্ট কর্তৃক এই মামলার শেষ বিচার নিষ্পত্তি হয়। হাইকোর্টের বিচারে

আরও তিনজন খালাস পান এবং অবশিষ্ট সকলে দণ্ডলাভ করেন। ডাঃ নারায়ণ রায় ও ভূপাল বসুর হয় ১৫ বৎসর হিসাবে দ্বীপান্তর দণ্ড, সুরেন্দ্র দত্তের ১২ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড সহ দ্বীপান্তর দণ্ড এবং রোহিণী অধিকারী ও যতীশ ভৌমিকের যথাক্রমে পাঁচ ও দুই বৎসর হিসাবে কঠোর পরিশ্রমসহ কারাদণ্ড। জেল-হাজতে অবস্থান কালে আসামীগণের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হইয়াছিল।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের লড়াই

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত দীনেশচন্দ্র মজুমদার যখন মেদিনীপুর জেলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কোনও মতে তিনি জেলখানা হইতে পলায়ন করেন। হিজলীর বন্দীনিবাস হইতে নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ও পলায়ন করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা তিনজনে নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে "চিত্রা" সিনেমার বিপরীত দিকের একটি বাটীতে অবস্থান করিতে থাকেন। ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে পুলিশ কোনও মতে সংবাদ পাইয়া উক্ত বাড়ীটি ঘেরাও করিয়া ফেলে এবং তাহার ফলে বিপ্লবীদের সহিত তাহাদের এক সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। উভয়পক্ষ হইতেই গুলিবর্ষণ চলিতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত তিনজনেই ধৃত হইলেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় অভিযুক্ত করিয়া যে মামলা হইল—তাহাতে দীনেশচন্দ্র প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, অবশিষ্ট দুইজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল।

লোম্যান-হত্যা

ডালহৌসি স্কোয়ার ঘটনার কয়েকদিন পরেই ঢাকাতেও একটি ঘটনা ঘটিল। নারায়ণগঞ্জের জল-পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এইচ্-এ-এস

বার্ট অসুস্থ হইয়া ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে অবস্থান করিতেছিলেন। ১৯৩০ সালের ২৯শে আগষ্ট সকালের দিকে বাঙ্গালার তৎকালীন ইনস্‌পেক্টর জেনারল-অফ-পুলিশ মিঃ এফ্‌-জে-লোম্যান এবং ঢাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-অফ-পুলিশ মিঃ ই, হড্‌সন হাসপাতালে গিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য। মিঃ বার্টকে দেখিয়া তাঁহারা যখন বাহিরে আসিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের উপর জনৈক আততায়ী গুলিবর্ষণ করিলেন। প্রথমে আহত হইলেন মিঃ হডসন—তাঁহার কোমরে বিদ্ধ হইল রিভলভারের গুলি; কিন্তু মিঃ লোম্যান যে আঘাত পাইলেন—তাহাই অধিকতর মারাত্মক হইল; কারণ গুলি তাঁহার মেরুদণ্ড ভেদ করিয়া গেল।

আততায়ীকে ধরিবার জন্য কেহ কেহ চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু দক্ষ আততায়ী সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার ফেলিয়া যাওয়া একটি রিভলভার কেবল কুড়াইয়া পাওয়া গেল।

এই ঘটনার পর ঢাকা শহরের বহুস্থানে যথারীতি খানাতল্লাস ও ধরপাকড় সুরু হইল। প্রকৃত আততায়ীকে ধরিতে না পারিলেও পুলিশ আপন দক্ষতা প্রকাশ করিতে কসুর করিল না। নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ লোকরাই পুলিশের হাতে প্রহৃত হইতে লাগিল। অত্যাচারের মাত্রা এতই গুরুতর রকমের হইল যে, বহু লোককে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালেও ভর্ত্তি হইতে হইল। যাঁহাকে আততায়ী বলিয়া পুলিশের সন্দেহ হইল, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও যাঁহাকে ধরিতে পারিল না—তাঁহার নাম বিনয় বসু।

১লা সেপ্টেম্বর লোম্যান সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিনয় বসুকে ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে বলিয়া ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন।

বিনয়-বাদল-দীনেশ

বিনয় বসু তখন ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন—মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁহার সুনামও ছিল। তাঁহার পিতার নাম রেবতীমোহন বসু—তিনি থাকিতেন জামসেদপুরে। তাঁহাদের নিবাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুরের রাউতভোগ-এ। বিনয় বসুকে ধরাইয়া



বিনয় বসু

দিতে পারিলে যে পুরস্কার দানের বিষয় ঘোষিত হয়, তাহাতে সরকার পক্ষ তাঁহার আকৃতির বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করেন। সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে ১৯২৮ সালে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত যোগদান করিয়াছিলেন এবং তিনজনেই যথাক্রমে মেজর, লেফ্‌টেন্যান্ট এবং ক্যাপ্টেন-এর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাদল

গুপ্তের পিতার নাম অবনীমোহন গুপ্ত—নিবাস বিদগাঁও এবং দীনেশ গুপ্ত ছিলেন যশোলঙ্গ-এর সতীশচন্দ্র গুপ্তের পুত্র। সতীশচন্দ্র জামালপুরের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। দীনেশও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন—আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি পড়া ছাড়িয়া দেন।

সিম্পসন-হত্যা

ঢাকার ঘটনার পর বিনয় বসুর পুনরায় সাক্ষাৎ মিলিল ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর। সেদিন তিনি ছিলেন এক দুর্দান্ত ও দুঃসাহসিক অভিযানের দক্ষ নায়ক। ঐ তারিখে বিনয় বসু তাঁহার অপর দুইজন সঙ্গী দীনেশ গুপ্ত ও বাদল (সুধীর) গুপ্ত সহ ডালহৌসি স্কোয়ারের রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ দুপুর বেলায় হানা দিলেন। তাঁহারা তিন জনেই সাহেবী পোষাকে সজ্জিত ছিলেন—মাথায় টুপিও ছিল। তাঁহারা সরাসরি রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন। বাংলার তৎকালীন ইনস্‌পেক্টর জেনারল-অফ-প্রিসনস্ কর্ণেল সিম্পসন তখন আপন কক্ষে বসিয়া অফিসের কার্য্যে রত ছিলেন। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বিপ্লবীরা তাঁহাকে গুলি করিলেন—সঙ্গে সঙ্গেই সিম্পসন সাহেবের দেহ চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িল। ইহার পর বিপ্লবীরা বাহিরের বারান্দায় আসিয়া চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ গুলি নিক্ষেপ সুরু করিলেন। জনৈক সেক্রেটারি তাঁহাদিগকে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে কি একটা বস্তু তাঁহাদের দিকে নিক্ষেপ করিলেন—কিন্তু তাহা তাঁহাদের গায়ে লাগিল না। বিপ্লবীরা তখন সেই ইংরাজ সেক্রেটারিকেও গুলি মারিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। ইহার পর বিপ্লবীরা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন হোম সেক্রেটারি মিঃ আলবিয়ান মার্-এর। তাঁহাদের গুলির আঘাতে মার্ সাহেবের কক্ষের দরজার কাচ ভাঙ্গিয়া গেল।

ইহার পর দ্বিতলের বারান্দায় বাধিয়া গেল এক রীতিমত খণ্ড-যুদ্ধ। বাংলার পুলিশ-বিভাগের তৎকালীন ইনস্‌পেক্টর জেনারল মিঃ ক্রেগ্ তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিপ্লবীদের লক্ষ্য করিয়া রিভলভারের গুলি চালাইলেন—কিন্তু তাহা বিপ্লবীদের গায়ে লাগিল না। মিঃ ফোর্ড নামে অপর একজন ইংরাজ অতঃপর মিঃ ক্রেগের হাত হইতে তাঁহার রিভলভারটি লইয়া বিপ্লবীদের লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতে লাগিলেন—উহাও কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে লাগিল। পুলিশ-বিভাগের সহকারী ইনস্‌পেক্টর-জেনারল মিঃ জোনস্ আসিয়াও কয়েক রাউণ্ড গুলি চালাইলেন—তাহাতেও কোন কাজ হইল না।

সেদিন যেন রণদুর্ম্মদ হইয়াই বিপ্লবীরা আক্রমণ পরিচালনায় মত্ত হইয়াছিলেন। একদিক হইতে অপরদিক পর্য্যন্ত দ্বিতলের প্রায় প্রতিটি কক্ষেই তাঁহারা একে একে হানা দিতে লাগিলেন। ইউরোপীয় অফিসার ও কর্ম্মচারিবর্গ প্রাণভয়ে এদিকে-সেদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। সকলের চোখে-মুখেই আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা, ভয়ে সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। লালবাজারের পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে সংবাদ পৌঁছাইবামাত্র কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার মিঃ টেগার্ট, ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার মিঃ গর্ডন ও মিঃ বার্ট প্রভৃতি অবিলম্বে শক্তিশালী পুলিশ-বাহিনী লইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনজন বিপ্লবীকে পরাভূত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টাতেও তাঁহারা কিন্তু বিপ্লবীদের কিছুই করিতে পারিলেন না। এক সময় দীনেশের বাহুতে পুলিশের একটি গুলি লাগিল বটে, তাহাতেও তিনি কিন্তু কাবু হইলেন না, পূর্ব্ববৎ সমানেই গুলি চালাইতে লাগিলেন।

তিনজনে অতঃপর পাসপোর্ট অফিস আক্রমণ করিলেন। সেই সময় সেখানে ছিলেন একজন আমেরিকান পাদ্রী—তাঁহার নাম জনসন্।

প্রাণভয়ে তিনি কোনওমতে দেওয়ালের গা-নল বাহিয়া নীচে পলায়ন করিলেন।

বিপ্লবীদের গুলি এই সময় প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল। সেদিন তাঁহারা আসিয়াছিলেন জীবন লইবার এবং জীবন দিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া; সুতরাং কার্য্য সমাধা করিয়া নায়ক বিনয় বসুর নেতৃত্বে একটি কক্ষে তাঁহারা মৃত্যু-বরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাদল গুপ্ত ভক্ষণ করিলেন পটাসিয়াম সায়নাইড বিষ—মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। চেয়ারের উপর তাঁহার দেহ এলাইয়া পড়িল। বিনয় ও দীনেশ আপন আপন আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেন। ইহার ফলে উভয়েই গুরুতররূপে আহত হইলেন বটে, কিন্তু জীবিত রহিলেন।

বিনয় জানিতেন যে পুলিশের নিকট তাঁহার পরিচয় গোপন থাকিবে না। তাই ধৃত হওয়ার পর পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজের নাম সঠিকই বলিলেন, কিন্তু সঙ্গী দুইজনের পরিচয় দিলেন ছদ্মনামে। তাঁহাদের তিনজনের শরীর তল্লাস করিয়া পুলিশ অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদ উদ্ধার করিল। বাদল গুপ্তের পকেট হইতে একটি জাতীয় পতাকাও পাওয়া গেল।

বিপ্লবীদের আক্রমণে সেদিন অন্যান্য যাঁহারা আহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জুডিসিয়াল সেক্রেটারি মিঃ নেলসন্ এবং সেক্রেটারি মিঃ ট্যয়নাম-এর নাম উল্লেখযোগ্য। Statesman পত্রিকায় রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর এই ঘটনাকে "Secretariat Raid" ও "Battle Veranda" নামে অভিহিত করা হয়।

আহত অবস্থায় বিনয় ও দীনেশকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দীনেশের গলার বাম পার্শ্বে গুলির আঘাত লাগিয়াছিল—আর বিনয়ের ললাটের উভয় পার্শ্বেই গুলির আঘাত-চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিয়া দীনেশ ধীরে ধীরে

আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন—কিন্তু কর্তৃপক্ষের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন বিনয় বসু। যে কয়দিন তিনি হাসপাতালে জীবিত ছিলেন —তাহার অধিকাংশ সময়ই তিনি অচৈতন্য অবস্থায় থাকিতেন। যখন তাঁহার সামান্য সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিত, তখন তিনি হাতের আঙুল দিয়া ক্ষতস্থান ঘাঁটিয়া বিষাক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। এইভাবে তাঁহার ক্ষত শেষ পর্য্যন্ত 'সেপটিক' হইয়া গেল এবং ১৩ই ডিসেম্বর তিনি



দীনেশ গুপ্ত

হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার জননী শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

দীনেশ গুপ্ত সুস্থ হইয়া উঠিলে এক স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালে তাঁহার বিচার সুরু হইল। এই ট্রাইব্যুন্যালে বিচারক ছিলেন মিঃ গার্লিক, শ্রী এন, কে, বসু ও জনাব আদিলজ্জমান সাহেব। বিচারে দীনেশের প্রাণদণ্ড হইল।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পর পর হাইকোর্ট ও প্রিভিকাউন্সিল-এ আপিল করা হয়—কিন্তু উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল থাকে।

তাঁহার প্রাণদণ্ড রদ্ করাইবার প্রচেষ্টায় সারা দেশে রীতিমত আন্দোলন হইল—কর্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দীনেশের ফাঁসি হইয়া গেল। ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের পূর্ব্বে তিনি ইংরাজ প্রহরীকে আঘাত হানিয়া যান।

দীনেশের ফাঁসিতে কলিকাতায় হরতাল প্রতিপালিত হয়। মনুমেণ্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় দীনেশের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অপরাহ্ণকালে একটি শোক-যাত্রা কৃষ্ণ পতাকাসহ চৌরঙ্গী হইতে ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের নিকট পর্য্যন্ত গমন করে। ৮ই জুলাই কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় দীনেশের ফাঁসিতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সভা স্থগিত রাখা হয়।

১৯৩০ সালের ১২ই ডিসেম্বর কালীঘাটে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে চূণীলাল মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন। তাঁহার নিকট পুলিশ একটি রিভলভার প্রাপ্ত হইল। এই প্রসঙ্গে আরও যে দুইজন ধরা পড়িলেন, তাঁহাদের নাম মণীন্দ্রলাল সেন ও সুবোধ দাশগুপ্ত। মিঃ গার্লিক, শ্রী এন, কে, বসু এবং জনাব আদিলজ্জমানকে লইয়া গঠিত ট্রাইব্যুন্যালে ইঁহাদেরও তিন জনের বিচার হয়। বিচারে তিন জনের প্রতিই প্রদত্ত হয় এক বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড।

পাঞ্জাবের গভর্ণরের উপর আক্রমণ

এই বৎসরেই ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে পাঞ্জাবের গভর্ণর সার G. D. Montworency-র উপর আক্রমণ চালান হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের

সমাবর্ত্তন সভায় তিনি গিয়াছিলেন সভাপতিত্ব করিতে। তাঁহার উদ্দেশে সেই সময় উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। গভর্ণরকে রক্ষা করিতে গিয়া সহকারী দারোগা চলন সিং নিহত হন এবং আর একজন শ্বেতাঙ্গ ইনস্‌পেক্টরও আহত হন। একটি ইউরোপীয় মহিলাও এই ঘটনায় আহতা হইয়াছিলেন। গভর্ণরের দক্ষিণ হস্তে গুলির আঘাত লাগে। তিনি পাশের ঘরে গিয়া নিজেই হাতের রক্ত পরিষ্কার করিয়া ফেলেন এবং নিজ আঘাতের বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না।



বাদল (সুধীর) গুপ্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ফেলো (তিনি চিকিৎসকও ছিলেন) শেষ পর্য্যন্ত উহা জানিতে পারিয়া তাঁহার ক্ষতস্থানে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেন।

আততায়ীকে ঘটনাস্থলেই ধরিয়া ফেলা হয়। তাঁহার নিকট হইতে জানা যায় যে, তাঁহার নাম হরকিষণ, বয়স বাইশ বৎসর, বাড়ী পেশওয়ার

জেলায়। কোনও একজন আফ্রিদির নিকট হইতে আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় করিয়া গভর্ণরকে হত্যা করিবার জন্যই তিনি নাকি আসিয়াছিলেন। ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারি হরকিষণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

পাঞ্জাবের গভর্ণরকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে "মিলাপ" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক দুর্গাদাস এবং চমনলাল ও রণবীর সিং অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহাদের প্রতিও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

মেদিনীপুরের প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা—মিঃ পেডি

মেদিনীপুরের দাসপুর থানায় পুলিশের অত্যাচারের বিবরণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের নানা স্থানে যখন পুলিশী জুলুম চলিতেছিল, তখন মিঃ পেডি ছিলেন সেখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। ন্যায়পরায়ণ বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল বটে, কিন্তু তাহার শাসনকালে মেদিনীপুর জেলায় যে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তাহা বন্ধ করিতে পারেন নাই। সকল অত্যাচারই তাঁহার জ্ঞাতসারে এবং অনুমোদন ক্রমে অবশ্য নাও হয় তো সংঘটিত হইয়া থাকিতে পারে। মোটের উপর পেডি সাহেব লোক নেহাৎ মন্দ ছিলেন না এবং বহু সময় আপন প্রভাবে গভর্ণমেণ্টকে দ্রুত অর্থ বরাদ্দ করিতে বাধ্য করিয়া লোকের অসুবিধা নিবারণের চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার শাসনকালে মেদিনীপুর জেলায় যে সকল অনাচার-অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার উপর গিয়া পড়িল। উপরন্তু আবার তাঁহারই সময়ে জেলখানায় বন্দীদের উপরও উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হয়; সুতরাং বিপ্লবীরা পেডি সাহেবকে হত্যা করিয়া এই সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন।

মেদিনীপুরের কলেজিয়েট-স্কুলে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয়, তাহাতে ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল মিঃ পেডি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্য যখন চলিতেছিল, তখন জনৈক বিপ্লবী তাঁহার উপর আগ্নেয়াস্ত্র হইতে গুলিবর্ষণ করিয়া পলায়ন করিলেন। কেহই আততায়ীকে ধরিতে বা চিনিতে পারিলেন না। পেডি সাহেব আহত হইয়া টলিতে টলিতে পাশের ঘরে গেলেন এবং সেখানে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

এই ঘটনা উপলক্ষে পুলিশ সন্দেহবশতঃ বিমল দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে। বিচারপতি মেসার্স পিয়ারসন, এস-কে-ঘোষ এবং মল্লিক সাহেবের এজলাসে হাইকোর্টে বিমল দাশগুপ্তের বিচার হয়। প্রমাণাভাবে বিচারপতিগণ তাঁহাকে খালাস দেন।

বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণরের উপর আক্রমণ

বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণরের উপরও এই বৎসর আক্রমণ পরিচালিত হয়। গভর্ণর সার আর্ণেষ্ট হট্সন ১৯৩১ সালের ২৩শে জুলাই পুণার ফার্গুসন কলেজে গমন করিয়াছিলেন। কলেজের লাইব্রেরি কক্ষে তিনি যখন ছাত্রগণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখন বাসুদেব বলবন্ত গোগাটি নামে একটি উনিশ-কুড়ি বৎসরের মহারাষ্ট্রীয় যুবক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলিবর্ষণ করেন। গভর্ণর কিন্তু অক্ষতদেহে বাঁচিয়া যান।

গার্লিক সাহেবের প্রাণনাশ

দীনেশ গুপ্তের বিচার প্রসঙ্গে মিঃ গার্লিকের নাম পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। মিঃ আর, আর, গার্লিক, আই-সি-এস ছিলেন আলিপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসনস্ জজ। অস্থায়ীভাবে তিনি হাইকোর্টেও কিছুদিন বিচার-

পতির কার্য্য করিয়াছিলেন। কানে তিনি কিছু কম শুনিতেন। তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া যে সকল ট্রাইব্যুন্যাল গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, দীনেশ গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর বিচার হয় ও তাঁহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। ইহার ফলে বিপ্লবিগণের ক্রোধ গার্লিক সাহেবের উপর গিয়া পড়ে। ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে একখানি পত্রও একবার লেখা হইয়াছিল। দীনেশের ফাঁসির দিন কুড়ি পরে ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে হত্যা করা হইল।

ঐদিনে তিনি আপন এজলাসে উপবিষ্ট হইয়া মোকদ্দমার শুনানি শ্রবণ করিতেছিলেন। আদালতের কার্য্য চলিতে থাকার সময়ই সহসা একজন যুবক তাঁহার এজলাসে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। সেখানে তখন অধিক লোক ছিল না। গুলিবিদ্ধ হইয়া মিঃ গার্লিক চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িলেন। যথাসম্ভব দ্রুত তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু সেখানে তাঁহার মৃত্যু হইল।

ঘটনার সময় সেখানে একজন সার্জ্জেণ্ট, একজন কনষ্টেবল এবং গোয়েন্দা-বিভাগের একজন দারোগা ছিলেন। আততায়ীর সহিত তাঁহাদের তিনজনের ধ্বস্তাধ্বস্তি ও গুলি-বিনিময় সুরু হইল। ইহার ফলে কনষ্টেবলটিও আহত হইল সাংঘাতিকভাবে। যুবকটিকে জীবন্ত ধরা সম্ভব হইল না—বিষ ভক্ষণ করিয়া তিনি ঘটনাস্থলেই আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার পকেট হইতে যে লিপিখানি পাওয়া গেল, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

"তুমি ধ্বংস হও,—দীনেশকে যে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছ, তাহার ফল ভোগ কর।"

লিপিখানির নিম্নে "বিমল গুপ্ত" নাম স্বাক্ষর পাওয়া যায়, কিন্তু উহাই

তাঁহার প্রকৃত নাম কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁহার দেহটি কাহারও দ্বারা সনাক্ত করানো যায় নাই। অনেকে উক্ত যুবকের উপাধি "ভট্টাচার্য্য" ছিল বলিয়া অনুমান করেন।

এই ঘটনার পর ৩০শে জুলাই তারিখে ডালহৌসি ইনস্টিটিউটে কিছু সংখ্যক লোকের এক সভা হয়। উক্ত সভায় ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ উভয় সম্প্রদায়ের লোকই উপস্থিত ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের বিচার-বিভাগের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার লেনসেট স্যাণ্ডারসন ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উহাতে মিঃ গার্লিকের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা এবং দীনেশের ফাঁসিতে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, উহার তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ঢাকার কমিশনার মিঃ এ, ক্যাসেল্-এর উপর আক্রমণ চালান হয় ১৯৩১ সালের ২১শে আগষ্ট। ঐদিনে তিনি গিয়াছিলেন টাঙ্গাইলের সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ কার্য্যালয়ে। সেই সময় জনৈক বিপ্লবী তাঁহার উপর গুলিবর্ষণ করেন। মিঃ ক্যাসেল্ ইহাতে সামান্য আহত হন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা পায়।

হিজলী বন্দীনিবাসের হত্যাকাণ্ড

হিজলীর বন্দী-নিবাসে এই সময় যে অত্যাচার সংঘটিত হয়—তাহা যেমনি নারকীয়, তেমনি মর্ম্মন্তুদ। কোনও সভ্য গভর্ণমেণ্টের জেলখানার মধ্যে অসহায় নিরস্ত্র বন্দীদের উপর যে এইরূপ আক্রমণ পরিচালিত হইতে পারে, তাহা যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু ইংরাজের সাম্রাজ্য-বাদী শাসনকালে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে—সাম্রাজ্যবাদকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য কোনও অপরাধের অনুষ্ঠানেই তাঁহারা কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত

হন নাই। ক্ষমতালিপ্সা তাঁহাদিগকে নরঘাতন অনুষ্ঠানে প্রেরণা যোগাইয়াছে, নৃশংস নিষ্ঠুরতায় তাঁহাদিগকে মত্ত করিয়াছে, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য করিয়াছে। বৃটিশ-শাসনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এইরূপ বহু দৃষ্টান্তই খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুর হইতে প্রায় মাইল দেড়-দুই দূরে হিজলী বন্দীনিবাস অবস্থিত। এক সময়ে ঐস্থানে কয়েকটি সরকারী অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারই কয়েকখানি বড় বড় বাড়ীতে গভর্ণমেণ্ট বন্দী-নিবাস স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং কয়েক শত বন্দীকে সেখানে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সকল বন্দীর অধিকাংশেরই কোন বিচার হয় নাই—রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে তাঁহাদিগকে শুধু সন্দেহবশে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল; সুতরাং বন্দীদের মন স্বভাবতঃই সর্ব্বদা বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকিত। বিনা অপরাধে বিনা বিচারে যাঁহারা আবদ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহারা যে সঙ্গতভাবেই বিক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

বন্দীদিগকে যে খোরাকী দেওয়া হইত, তাহাতে তাঁহাদের খরচ কুলাইত না। এজন্য তাঁহাদের মনে অসন্তোষ ছিল এবং তাঁহারা উহা বাড়াইবার জন্য পুনঃ পুনঃ দাবী করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হন। এই ব্যাপার লইয়াই কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বন্দীদিগের মূলতঃ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি গৌণ কারণ ছিল। আলিপুরের জজ মিঃ গার্লিক নিহত হওয়ার পর বন্দীগণ জেলখানায় আলোক-সজ্জা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা লইয়াও বন্দীদিগের সহিত জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষের সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ হয়। কোন কোন ইংরাজ অফিসার বন্দীদিগের সহিত এরূপ আচরণ করিতেন যে, বন্দীদিগের আত্মসম্মানে তাহাতে আঘাত লাগিত। ১৯৩১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর জনৈক বন্দীকে হিজলী বন্দীশালা হইতে স্থানান্তরিত করার সময়

অন্যান্য যে সকল বন্দী তাঁহাদের সঙ্গীকে বিদায় জানাইতে প্রধান ফটক পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত বন্দীনিবাসের প্রহরীদের কিছু বচসা হয় এবং সামান্য ধাক্কাধাক্কিও হয়। প্রহরীরা ইহার ফলে উত্তেজিত হইয়া উঠে। ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটা-নয়টার সময় বন্দী-নিবাসের প্রাঙ্গণে যে সকল বন্দী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত প্রহরীদের পুনরায় কথা কাটাকাটি হয়। বিপ্লবীদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্যই প্রহরীরা যেন সুযোগ খুঁজিতেছিল। অল্প গণ্ডগোল আরম্ভ হইতেই বন্দীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করিতে থাকে। কোনও কোনও প্রহরী এই সময় এই গুজব রটাইয়া দেয় যে, বন্দীদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য উপর-ওয়ালাদের আদেশ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা চরমে পৌছায় এবং প্রহরীরা ইচ্ছামত বন্দীদের উপর গুলি চালাইতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রের মত এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ও উপর্য্যুপরি গুলিবর্ষণে নিরস্ত্র বন্দীগণ যেন দিশাহারা হইয়া যান। কেহ কেহ হয় তো তখন খাওয়া-দাওয়া সারিতেছিলেন, কেহ কেহ হয় তো গল্প-গুজবে রত ছিলেন। প্রহরীদের একতরফা অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণে অল্পক্ষণ মধ্যেই বন্দীদের এক শতেরও অধিক জন আহত হইলেন। তাঁহাদের যন্ত্রণা-কাতর আর্ত্তনাদে জেলখানা পূর্ণ হইয়া গেল। দুইজন বিপ্লবী এই গুলিবর্ষণের ফলে জীবন হারাইলেন—তাঁহাদের নাম সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত।

সন্তোষ মিত্র ছিলেন তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র-সন্তান। তাঁহার পিতার নাম দুর্গাচরণ মিত্র। সন্তোষ মিত্র ও সুভাষচন্দ্র একই বৎসরে ১৯১৯ সালে অনার্সসহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এম-এ পরীক্ষায়ও সন্তোষ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তারকেশ্বরের পিতার নাম হরিনারায়ণ সেনগুপ্ত।

মূর্খ ও নিষ্ঠুর প্রহরীদের দ্বারা যে নৃশংস অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল, তাহার সংবাদ অবিলম্বে কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় সকলেই প্রাপ্ত হইলেন। খবর পাইয়াই মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগ্‌লাস, কমাণ্ড্যাণ্ট মিঃ বেকার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারগণ সকলেই গিয়া উপস্থিত হইলেন হিজলীর বন্দীনিবাসে। ব্যাপার দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এই শোকাবহ ঘটনার বিষয় জানিতে পারা মাত্র কলিকাতা হইতে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতৃবর্গ হিজলীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিজেদের দোষ ঢাকিবার জন্য কতৃপক্ষ প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে, বন্দীদিগের বিরুদ্ধে তাঁহারাই একটি মামলা রুজু করিবেন; কিন্তু পুলিশ ইনস্‌পেক্টর তাঁহার রিপোর্টে বন্দীগণের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর উপযোগী তথ্য ও প্রমাণ নাই বলিয়া মত প্রকাশ করায় এবং সরকারী উকিলও সেইরূপ অভিমত প্রকাশ করায় সরকার পক্ষ শেষ পর্য্যন্ত মামলা দায়ের করেন নাই।

ইহার পর বিচারপতি সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ড্রামণ্ড-এর দ্বারা একটি বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা হয়। উক্ত তদন্তে বন্দীগণকে সাহায্য করিবার জন্য ও তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি নেতৃবর্গ পুনরায় হিজলীতে গমন করেন। তদন্তের পর শ্রীযুক্ত মল্লিক ও মিঃ ড্রামণ্ড এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বন্দীদের আচরণ কখনও কখনও বিরক্তিকর হইয়া থাকিলেও যথেচ্ছ গুলিবর্ষণ যথেষ্ট অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

ঘটনার পরদিন ১৭ই সেপ্টেম্বর সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তের মৃতদেহ হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছায়। হাওড়া ষ্টেশন হইতে এক বিরাট শোকযাত্রা মৃতদেহ দুইটি লইয়া কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত যায়। সেইখানেই তাঁহাদের শেষকৃত্য সাধিত হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় গড়ের মাঠে দুইজন শহীদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এক বৃহৎ জনসভার অনুষ্ঠান হয়। লক্ষাধিক লোক সেই সভায় যোগদান করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনন্যসাধারণ ভাষায় শাসক-বর্গের কলঙ্কলাঞ্ছিত নিষ্ঠুর কার্য্যের নিন্দা করিয়া শহীদ দুইজনের দেহমুক্ত আত্মার উদ্দেশে তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেন।

এই বৎসরই ২রা অক্টোবর তারিখে উল্টাডাঙ্গায় একটি স্বদেশী ডাকাতি হয়। ক্যানেল ওয়েষ্ট রোডে জনৈক ব্যবসায়ীর গদিতে এই ডাকাতি হইয়াছিল। কয়েকজন যুবক মোটরে করিয়া উক্ত ব্যবসায়ীর গদিতে গিয়া উপস্থিত হন এবং রিভলভার দেখাইয়া ৩০০৲ হস্তগত করেন। পুনরায় তাঁহারা মোটরে করিয়াই ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। কিছুসংখ্যক লোক গাড়ীখানির অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। কিছুদূর যাওয়ার পর গাড়ীখানি একটি গর্ত্তে পড়িয়া যায় ও আর চলিতে পারে না। তখন গাড়ী হইতে নামিয়া কয়েকজন পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পুলিশ কাহাকেও কাহাকেও ধরিয়া ফেলে। মোটরে উপবিষ্ট অবস্থাতে শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবীও গ্রেপ্তার হন। ইঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া এক মামলা রুজু হয়। বিচারে বিমলপ্রতিভা দেবী ও অপর একজন মুক্তিলাভ করেন। তিনজনের কারাদণ্ড হয়। ১৩ই অক্টোবর যে শ্যামবাজার বোমার মামলা হয়, তাহাতেও কয়েকজন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ২৯শে অক্টোবর European Association-এর সভাপতির উপর গুলি বর্ষিত হয়।

দুইজন ছাত্রী কর্ত্তৃক ষ্টিভেন্স-হত্যা

১৫ই ডিসেম্বর তারিখে শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরী নামে কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা গার্লস্ স্কুলের দুইজন ছাত্রী গুলি করিয়া কুমিল্লার জেলা

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্সকে নিহত করেন। বিচারে শান্তি এবং সুনীতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের পর

বিলাতে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৈঠকের শেষ অধিবেশনে ভারতে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সার তেজবাহাদুর সপ্রু ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক আবেগপূর্ণ আবেদন জানান। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী তদুত্তরে বলেন যে, ভারতে শাসনকার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি না করিয়া শান্তি-রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলে সার তেজবাহাদুর সপ্রুর এই আবেদনে মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন।

এই ঘোষণার পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সদিচ্ছারও খানিকটা পরিচয় পাওয়া গেল। আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে সকল সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, বড়লাট লর্ড আরউইন ১৯৩১ সালের ২৫শে জানুয়ারি তাঁহাদিগকে মুক্তি-দানের আদেশ দিয়া এক বিবৃতি প্রদান করিলেন। উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় ত্রিশজন প্রভাবশালী নেতাকে ২৬শে জানুয়ারি মুক্তি দেওয়া হইল। ইঁহারা সকলেই ছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যে সকল আদেশ জারি করা হইয়াছিল, তাহাও তুলিয়া লওয়া হইল।

মুক্তিলাভের পরই গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এলাহাবাদে গিয়া সমবেত হইলেন। সেখানে তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। নেতৃবৃন্দ সেখানে কয়েকদিন যাবৎ

একত্র আলাপ-আলোচনা করিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণাকে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স-এর পরবর্তী পর্য্যায়ে কংগ্রেসের যোগদানের পক্ষে যথেষ্ট আশ্বাস বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। এই সময় ৬ই ফেব্রুয়ারি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু দেহত্যাগ করিলেন।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট-ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা মীমাংসা সংঘটিত করিবার জন্য সার তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীজয়াকর, ভূপালের নবাব বাহাদুর এবং শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় গান্ধীজীর সহিত উপর্য্যপরি সাক্ষাৎ করিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে পড়িয়া গান্ধীজী আপোষ-রফা সম্বন্ধে কংগ্রেসের বক্তব্য পেশ করিবার জন্য বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিকট এক পত্র লিখিলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারি হইতে ৭ঠা মার্চ্চ পর্য্যন্ত দিল্লীতে বড়লাটের সহিত গান্ধীজীর কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনা চলিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণও দিল্লীতে আহুত হইলেন এবং গান্ধীজী তাঁহাদিগকে বড়লাটের সহিত তাঁহার আলোচনার ফলাফল জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। আলোচনাকালে এক এক সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে লাগিল যে মনে হইতে লাগিল, অন্যান্য-বারের মত মধ্যপথেই বুঝি সেবারের আলোচনাও ফাঁসিয়া যাইবে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে একটি সন্ধিচুক্তি সম্ভব হইল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে লর্ড আরউইন এবং ভারতের জনগণের পক্ষে মহাত্মা গান্ধী উক্ত সন্ধি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন। ইহার দ্বারা গভর্ণমেণ্ট পক্ষ তাঁহাদের দমননীতি প্রত্যাহার করিতে এবং কংগ্রেস পক্ষ তাঁহাদের আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিতে সম্মত হইলেন। কঠোর সংগ্রামের পর এইরূপে সাময়িকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

১৯৩১ সালে লণ্ডনে পুনরায় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সুরু হইল। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য বোম্বাই হইতে আগষ্ট মাসের শেষ দিকে মহাত্মা গান্ধী "রাজপুতানা" জাহাজ যোগে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে গেলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং সরোজিনী নাইডু। যাত্রাপথে গান্ধীজী বহু স্থান হইতেই শুভেচ্ছামূলক পত্র ও টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা গিয়া ইংলণ্ডে পৌঁছাইলেন সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে। সেখানে তিনি নানা সভা-সমিতি ও সংবাদ-পত্রের মারফত কংগ্রেসের দাবী ও উদ্দেশ্য ইংলণ্ডের ও বিভিন্ন দেশের জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গোলটেবিল বৈঠকের আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরা সকলেই ছিলেন বড়লাটের মনোনীত সদস্য, সুতরাং তাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল ও সঙ্কীর্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। বৃটিশ কর্তৃত্বের বাহিরে স্বাধীন, সার্ব্বভৌম, জাতীয়তাবাদী ভারতের কল্পনা করিবার তাঁহাদের শক্তি ছিল না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেরও তখন বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের। কাজেই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় অগ্রগতির কোনই সুরাহা হইল না—সমস্যা সমস্যাই রহিয়া গেল। আসল আলোচনার বিষয়গুলিকে ধামাচাপা দিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যাকেই বৈঠকে প্রাধান্য দেওয়া হইল এবং তাহা লইয়াই সৃষ্ট হইল অনর্থক কৃত্রিম জটিলতার। কিছুদিন ধরিয়া ব্যর্থ অধিবেশনের পর ১লা ডিসেম্বর বৈঠক শেষ হইল।

অধিবেশনের শেষদিনে মহাত্মা গান্ধী এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা দান করেন। অন্যান্য কথার সহিত তিনি বলিলেন,—"বৃটিশ মন্ত্রিসভার

সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে, এমন আশা নিয়ে আমি কিছু বলছি না, কারণ তাঁদের সিদ্ধান্ত হয় তো ইতিপূর্ব্বেই স্থির হয়ে আছে। বহু বক্তা যদিও বলেছেন যে, আলাপ-আলোচনার দ্বারাই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবে, কিন্তু কংগ্রেস তা পুরোপুরি বিশ্বাস করে না; সেই জন্যই কংগ্রেসকে বাধ্য হয়ে ইংরেজদের পক্ষে অপ্রীতিকর অন্য পথ অনুসরণ ক'রতে হ'চ্ছে—প্রচার করতে হ'চ্ছে বিদ্রোহের বাণী। ভারতে আইন-অমান্য, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি চলতে থাকলে ভারতের কি দুর্গতি হবে, তা নিয়ে বহু বক্তাই দুশ্চিন্তা প্রকাশ ক'রেছেন। আমি একজন ঐতিহাসিক না হ'লেও একথা বলতে পারি যে, যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ ক'রে গেছেন, তাঁদের রক্তে ইতিহাসের পাতা রাঙা হ'য়ে আছে। দুঃখকে বরণ না ক'রে কোনও জাতির স্বাধীন হওয়ার কোনও নজির আমার জানা নেই। সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে ওকালতি না ক'রেও একথা বলা যায় যে, গুপ্তঘাতকের অস্ত্র, বিষ, রাইফেলের কার্ত্তুজ বা বর্শা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র—স্বাধীনতার অন্ধ-পূজারীরা আজ পর্য্যন্ত যা ব্যবহার করে এসেছেন—তার জন্যে ঐতিহাসিকেরা তাঁদের অপরাধী ব'লে গণ্য করেন নি। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যেই মানুষ লড়াই করে, প্রাণ দেয় এবং যাদের কাছ থেকে মুক্তি চায়, স্বাধীনতার জন্যে তাদের হাতেই জীবন বিসর্জ্জন দেয়।"

গান্ধীজী তাঁহার এই সুদীর্ঘ বক্তৃতায় কংগ্রেসের আদর্শকে ব্যাখ্যা করেন—ইংরাজগণের সহিত ভারতীয়দের সম্মানজনক বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহও প্রকাশ করেন। সর্ব্বশেষে তিনি প্রদান করেন ধন্যবাদ। গান্ধীজী বলিলেন,—"I do not know in what direction my path would be, but it does not matter to me. Even though I may have to go in an exactly opposite

direction, you are still entitled to a vote of thanks from the bottom of my heart."

দমন-নীতির অনুসরণে গভর্ণমেণ্ট-এর পুনঃপ্রস্তুতি

১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজী শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিলেন। বৈঠক তো শেষ হইল, ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্টের নীতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। সত্য কথা বলিতে গেলে সাময়িকভাবে শান্তি স্থাপনের দ্বারা গভর্ণমেণ্ট যেন শক্তি-সঞ্চয়ের সুযোগ করিয়া লইয়াছিলেন, যাহাতে পরবর্ত্তী আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করা সম্ভব হইতে পারে। চুক্তি-দ্বারা স্থাপিত শান্তি যাহাতে ভবিষ্যতেও স্থায়ী হইতে পারে, সে চেষ্টা তাঁহাদের ছিল না। এই অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়কে তাঁহারা প্রস্তুতির সময় হিসাবেই গণ্য করিয়াছিলেন।

যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। গভর্ণ-মেণ্টের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়া কোনও ফল হয় নাই; উপরন্তু প্রজাদের আন্দোলন দমন করিবার জন্য সেখানে জারি করা হইল অর্ডিনান্স। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও খুদাই খিদমৎগারদিগকে গভর্ণমেণ্ট সুনজরে দেখিতেন না। সেখানেও অর্ডিনান্স জারি করা হইয়াছিল এবং খান আব্দুল গফুর খান এবং তাঁহার ভ্রাতাকে বন্দী করা হইয়াছিল, কিন্তু বাংলা দেশে যে অর্ডিনান্স জারি করা হইয়াছিল, তাহাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর। মহাত্মাজী ইংলণ্ডে থাকার সময়ই মহাদেব দেশাই বেঙ্গল অর্ডিনান্স সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত নিম্নলিখিত ভাষায় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

"The Bengal Ordinance of 1931 is more ghastly than

that of 1925. It reminds us of the days of the Sepoy Mutiny and the Amritsar massacre of 1919."

বাংলার বিপ্লবান্দোলন দমনকল্পে ১৯২৫ সালে একটি অর্ডিনান্স পাশ হওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ উহা বাংলার আইন-পরিষদে উত্থাপিত করিয়া পাশ করাইবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু সরকারের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও যখন উহা আইন-পরিষদে গৃহীত হইল না, তখন বাংলার তৎকালীন গভর্ণর লর্ড লিটন উহা তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে আইনে পরিণত করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া উক্ত অর্ডিনান্সের সাহায্যেই সরকার বিপ্লবীদিগকে শায়েস্তা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর যখন সন্ত্রাসবাদও উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিল, তখন বাংলা গভর্ণমেণ্ট আর একটি কঠোরতর আইন প্রবর্ত্তিত করার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, পূর্ব্বের আইনটি অচল হইয়া যাওয়ায় আশানুরূপ চণ্ডনীতি চালান যাইতেছে না; সুতরাং আর একটি নূতন আইনের অস্ত্র হস্তে লইয়া বিপ্লবীদের ও বাংলার জনসাধারণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া দরকার। তাঁহাদের এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ১৯৩১ সালের ২৯শে অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিনান্স নামে আর একটি চণ্ড আইন জারি করা হইল।

এই আইনের সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। সন্দেহভাজন লোকদিগকে বিনা বিচারে অন্তরীণে আবদ্ধ করিয়া রাখার, যে কোন স্থানে পাইকারি জরিমানা আদায় করিতে পারার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের জন্মিল। সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী জজ ও জুরির দ্বারা অপরাধীর বিচার নিষ্পন্ন না করিয়া বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের দ্বারা ডাকাতি, হত্যার চেষ্টা প্রভৃতি কয়েকটি অপরাধে অভিযুক্ত আসামীদের স্বতন্ত্র বিচারের ব্যবস্থা হইল। হত্যা সংঘটিত না হইলেও হত্যার চেষ্টা করার

অপরাধেই আসামীর মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারিবে বলিয়া বিধান দেওয়া হইল।

আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় দেশের অবস্থা

১৯৩২-৩৩ সালে বাংলা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে "অশান্তির উপদ্রব" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারিত হয়। জনসাধারণকে গভর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতির যৌক্তিকতা বুঝানোই উক্ত পুস্তিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল—যাহাতে তাহারা সর্ব্ববিষয়ে অশান্তি বিদূরণে অসহযোগিতা না করিয়া গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করে। আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওযার পূর্ব্বের ও পরের বাংলা দেশের অবস্থার যে চিত্র উহাতে পাওযা যায়, তাহা এইরূপ -

	১৯২৯ সাল	১৯৩০ সাল	১৯৩১ সাল
ডাকাতি	৬৯৩	১১০৩	১৯২৯

ডাণ্ডিতে লবণ-আইন ভঙ্গ সুরু হওয়াব পর সমগ্র ভারতে অশান্তি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তৃত হইয়া পড়ার যে বিবরণ উহাতে প্রদত্ত হয়, তাহা এই—

"১৯৩০, ১১ই এপ্রিল	—বোম্বাইযে ও কলিকাতায় হাঙ্গামা।
১৪ই এপ্রিল	—বোম্বাই বেলগাওয়ে দাঙ্গা।
১৫ই "	—কলিকাতায় দাঙ্গা।
১৬ই "	—করাচীতে দাঙ্গা ও পুণায় হাঙ্গামা।
১৮ই "	—চট্টগ্রামে অস্ত্রাগারে ডাকাতী।
২০শে "	—পাটনায় হাঙ্গামা।
২২শে "	—মাদ্রাজে দাঙ্গা।
২৩শে "	—পেশাওয়ারে বিষম দাঙ্গা-হাঙ্গামা।

২৭শে এপ্রিল	—মাদ্রাজে পুনরায় দাঙ্গা।
২রা মে	—অমৃতসরে হাঙ্গামা।
৬ই ”	—দিল্লীতে বিষম দাঙ্গা, কলিকাতায় দাঙ্গা এবং বোম্বাইয়ে, রাণাঘাটে ও জলন্ধরে (পাঞ্জাব) হাঙ্গামা।
৮ই ”	—শোলাপুরে এমন দাঙ্গা যে সামরিক আইন জারি করিতে হয়।
১৫ই হইতে ১৭ই মে	—ময়মনসিংহে দাঙ্গা।
১৭ই মে	—ঝিলাম জিলায় হাঙ্গামা।
২১শে ”	—কলিকাতায়, করাচীতে ও মুলতানে হাঙ্গামা।
২৫শে ”	- সীমান্ত প্রদেশে মর্দ্দানের নিকটে দাঙ্গা এবং দিল্লীতে ও রাওয়ালপিণ্ডীতে হাঙ্গামা।
২৫শে ও ২৬শে মে	—লক্ষ্ণৌএ দাঙ্গা।
২৭শে ও ২৮শে মে	—বোম্বাইয়ে দাঙ্গা।
২৯শে মে	—কালকাতায় হাঙ্গামা।
৩১শে ”	—পেশাওয়ারে দাঙ্গা।
২রা জুন	—ডেরাইস্মাইলখাঁয় ও মাদ্রাজ বোলিঙ্গানালুরে হাঙ্গামা।
৩রা হইতে ৭ই জুন	—মেদিনীপুরে দাঙ্গা।
৫ই, ১২ই, ১৬ই ও ২১শে জুন	—বোম্বাইয়ে হাঙ্গামা।
৮ই জুন	—বোম্বাই কয়রার নিকটে ও মাদ্রাজে ভেলোরে দাঙ্গা।

৯ই জুন	—অমৃতসরে হাঙ্গামা।
১০ই ”	—পাঁচলায় হাঙ্গামা।
২১শে ”	—কলিকাতায় হাঙ্গামা।
২৫শে ”	—টাঙ্গাইলে হাঙ্গামা।
২৬শে ”	—মাদ্রাজ ইলোরে দাঙ্গা।
৩০শে ”	—ভাগলপুরে হাঙ্গামা।
১লা জুলাই	—যশোহরে হাঙ্গামা।
১লা হইতে ২রা জুলাই	—বালেশ্বরের নিকটে দাঙ্গা।
৩রা জুলাই	—বোম্বাইয়ে হাঙ্গামা।
৬ই ”	—পুণায় হাঙ্গামা।”

তালিকা বিস্তৃত হইবার ভয়ে আর দীর্ঘ করা হয় নাই; কিন্তু উহা হইতেই দেশব্যাপী অসন্তোষ ও বিক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত ১৯৩১ সালে বাংলা দেশে ৬৭টি উপদ্রব এবং নয়টি হত্যাকাণ্ডের বিষয় উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সালেই দশ জন লোককে খুন করিবার চেষ্টা হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—তন্মধ্যে পাঁচ জন আঘাত পায়। ডাকাতির সময়ও চারিজন লোককে খুন করা হয়। দেশে অশান্তি ছড়ানোর ফলকে উক্ত পুস্তিকায় প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—

“(১) বাঙ্গালায় ডাকাতীর সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং বাড়িয়া চলিয়াছে;

(২) বাঙ্গালায় অনাচারীরা নানারূপ অনাচার করিতেছে;

(৩) বাঙ্গালার ভদ্রঘরের শিক্ষিতা যুবতীরাও খুন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।”

সর্ব্বশেষে উক্ত পুস্তিকায় যে আবেদন ছিল—তাহা সত্যই করুণ—

“দেশের এই অধঃপতনের জন্য কি নেতাদের কোন দায়িত্ব নাই?

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারা লোককে সরকারের সহিত সহযোগ করিতে বারণ করিয়া ও আইন ভাঙ্গিতে বলিয়া দেশে যে অবস্থা করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতেই দেশে অশান্তি ঘটিয়াছে এবং অশান্তি ঘটিলে উপদ্রব উৎপন্ন হইতে বিলম্ব ঘটে না।

বাঙ্গালায় যেমন সারা ভারতে তেমনই যে অশান্তি ছিল তাহাতে দেশের লোকের ধন-প্রাণ লইয়া সর্ব্বদাই টানাটানি হইত। ফলে দেশে উন্নতি হয় নাই। একশত বৎসরেরও অধিককাল চেষ্টায় এখন দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসনের প্রধান গৌরব এই যে—ইহার দ্বারা দেশের লোকের ধন ও প্রাণ নিরাপদ হইয়াছে—সবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারে না। ইহা হইয়াছে বলিয়াই দেশে নানারূপ উন্নতি হইয়াছে। দেশে যদি অশান্তি থাকে, তবে শিক্ষার উপায় হয় না, ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যায়, লোক মনে করে, সম্পত্তি যদি রাখিতে না পারে তবে সম্পত্তি করিয়া লাভ নাই। এখন সে ভাব দূর হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পথ ঘাট ভাল হইয়াছে। রেল, ষ্টীমার, ডাক, তার—এ সব দেশে নূতন যুগ আনিয়াছে। লোক প্রতিদিন পৃথিবীর খবর পাইতেছে। দেশে সেচের খাল হইয়াছে, আর তাহার ফলে শস্য অধিক জন্মিতেছে। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ বহু ধন লাভ করিতেছে।

যদি এ সব নষ্ট হয়, তবে যে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা কি দেশের লোক বুঝেন না? দেশের যে অবস্থার কথা মনে করিলেও ভয় হয়, সেই অবস্থা ফিরাইয়া আনা কি কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে? যদি না পারে তবে যাহাতে এই অশান্তি নষ্ট হয়—আবার শান্তি ফিরিয়া আসে—দেশের লোক আইন মানিয়া চলে—সরকারের সঙ্গে

একসঙ্গে লোক কাজ করিয়া দেশের ও সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল করিতে পারে—সেই চেষ্টা করাই দেশের শিক্ষিত লোকদিগের কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালন করিলে তাঁহারা দেশের প্রতি ও সমাজের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার পরিচয় দিতে পারিবেন। নচেৎ নহে।”

এক আনা মূল্যের এই পুস্তিকাখানি ৫০,০০০ ছাপিয়া এইভাবে বাংলা গভর্নমেণ্ট দেশের লোকের মতিগতি ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সত্যকারের সহযোগিতার পথকে যে তাঁহারাই রুদ্ধ করিতেছেন, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন নাই।

১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে পৌঁছাইয়া তৎপরদিনই মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের নিকট এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। উহাতে তিনি যুক্তপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলার অর্ডিনান্স-এ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন এবং উহা সম্বন্ধে আলোচনার্থে বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বড়লাট কিন্তু সরাসরি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশসমূহে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা লইয়া তিনি গান্ধীজীর সহিত কোনও আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহেন। ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধীজীর প্রস্তাব পুনর্ব্বিবেচনার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করা হইল এবং গান্ধীজীর সহিত বড়লাট সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইলে পুনরায় আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে বলিয়াও জানাইয়া দেওয়া হইল। ইহাতে ফল ফলিল উল্টা। ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে গভর্ণমেণ্ট আবার পুরানো দমননীতি পুরাপুরি চালু করিয়া দিলেন। কংগ্রেস এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট সমুদায় প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় বে-আইনী ঘোষণা করা হইল—ধর-পাকড়ও সুরু হইল পুরাদমে।

উক্ত তারিখেই গান্ধীজী এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল পুনরায় গ্রেপ্তার হইলেন। খান আব্দুল গফুর খান এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে ইতিপূর্ব্বেই কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্রও গ্রেপ্তার হইলেন। শান্তি-চুক্তি বলবৎ থাকা কালেই গভর্ণমেণ্ট পুলিশের ব্যবহারের জন্য হাজার হাজার লাঠির অর্ডার দিয়া উহা মজুত করিয়াছিলেন; সুতরাং দমননীতি সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের বিরুদ্ধে উহা বে-পরোয়া প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার বহু পরে সরকার লাঠির ব্যবহার সুরু করিয়াছিলেন—এবারে কিন্তু প্রথম হইতেই লাঠি চার্জ্জ চলিতে লাগিল। এলাহাবাদের "স্বরাজ-ভবন" পুলিশ দখল করিয়া লইল। গান্ধীজীর "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকার কার্য্যালয় পুলিশ তালাবদ্ধ করিয়া দিল। অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, মনীষী রোমা রোঁলা ইহার বিরুদ্ধে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিবাদ উত্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বাংলার গভর্ণরের উপর আক্রমণ

বৃটিশের প্রতিশ্রুতির অন্তঃসারশূন্যতা এবং তাঁহাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে বিপ্লবিগণ বরাবরই সজাগ ছিলেন, সেইজন্য গান্ধীজীর সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শান্তি-চুক্তি বলবৎ থাকা কালেও তাঁহারা আপন কার্য্য চালাইয়া যাইতে ত্রুটি করেন নাই। ১৯৩২ সালের প্রারম্ভেই যখন কংগ্রেসের সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পুনরায় সংঘর্ষ সুরু হইল, তখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ছিলেন পুরাপুরি প্রস্তুত, কিন্তু কংগ্রেসকে আবার নূতন করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করার অসুবিধায় পড়িতে হইল। বিপ্লবীরা তাঁহাদের প্রচেষ্টা বরাবরই বজায় রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অধিক অসুবিধায় পড়িতে হইল না; সুতরাং ১৯৩২ সালে দমননীতি

পুনরায় প্রবৃত্ত হইতেই বিপ্লবীরাও তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি বাংলার গভর্নর সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসনকে আক্রমণের একটি চেষ্টা হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে ঐদিন সিনেট হলে যে সভার অধিবেশন হয়, চ্যান্সেলার হিসাবে সার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন উহাতে সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। শ্রীযুক্তা বীণা দাস সেই সময় তাঁহাকে গুলি করিবার চেষ্টা করিয়া ধৃত হইলেন। সভায় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। পরে যখন বীণা দাসের বাটীতে খানাতল্লাস হইল, তখন সেখান হইতেও কিছু কার্ত্তুজ প্রভৃতি পুলিশ প্রাপ্ত হইল।

বীণা দাস বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও মহিমচন্দ্র ঘোষকে লইয়া গঠিত ট্রাইব্যুন্যালে তাঁহার বিচার হইল। দুইটি অপরাধে তাঁহার মোট নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

মেদিনীপুরের দ্বিতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা—মিঃ ডগ্‌লাস

মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, মেদিনীপুরে কোনও শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহারা থাকিতে দিবেন না। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেমস্ পেডিকে হত্যা করেন। ইহারই এক বৎসর পরে পালা আসিল মেদিনীপুরের পরবর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর-কে-ডগ্‌লাসের। ডগ্‌লাস-হত্যা মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শহীদ প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্য ছিলেন বিমল ও জ্যোতিজীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্য

সমাবর্ত্তন উৎসবে বাংলার গভর্নরকে আক্রমণ করিবার যে চেষ্টা হয়—তাহার কিছুদিন পরেই ডগ্‌লাস সাহেব বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন।

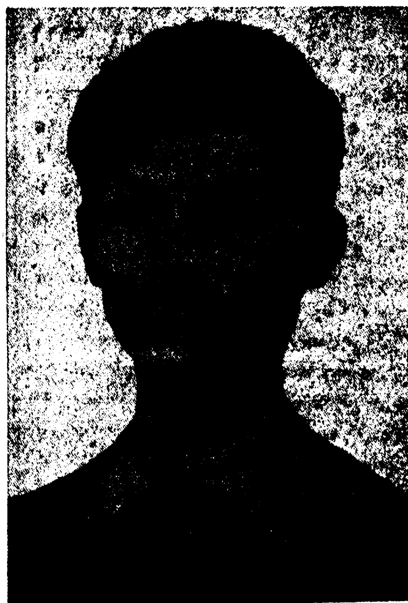
এই ঘটনায় ধৃত হন প্রদ্যোৎকুমার। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত কংসাবতী নদীতীরস্থ গোপালনগর গ্রামে ১৯১৩ সালের ৩রা নভেম্বর বিপ্লবী প্রদ্যোৎকুমারের জন্ম হইয়াছিল।

তাঁহার পিতার নাম ভবতারণ ভট্টাচার্য্য—মাতার নাম পঙ্কজিনী দেবী। ভবতারণের চারিটি পুত্র—তিন কন্যা। প্রদ্যোৎ ছিলেন পিতার চতুর্থ পুত্র-সন্তান—ভগ্নীগণের অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। প্রদ্যোতের পিতামহ ঈশানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একজন সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খানের রাজদরবারে তিনি ছিলেন সভাপণ্ডিত। তাঁহার একটি টোল ছিল—নানা স্থান হইতে ছাত্ররা সেখানে পড়িতে যাইত। ভবতারণও ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। মেদিনীপুর শহরে আলিগঞ্জে তিনি Revenue Agent-এর কার্য্য করিতেন।

প্রদ্যোতের দশ বৎসর বয়সের সময় ১৯২৩ সালের ১৫ই জুন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার ফলে তাঁহার জননী শোকে অতিশয় মুহ্যমান হইয়া পড়েন এবং সংসারের সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এই অবস্থায় প্রদ্যোতের স্নেহশীলা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূই প্রদ্যোৎ ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীগণের দেখাশুনার ভার গ্রহণ করেন।

অতি শৈশবেই প্রদ্যোৎ হার্ডিঞ্জ এম্-ই স্কুলে ভর্ত্তি হন, পরে তথা হইতে গিয়া ভর্ত্তি হন মেদিনীপুরের হিন্দু স্কুলে। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। হিন্দু স্কুল হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম হইয়া ১৯৩১ সালে প্রথম বিভাগে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সময়ই তিনি বয়স্কাউটের সভ্য হইয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে নানা জনহিতকর কার্য্যে তাঁহাকে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। নাড়াজোল রাজ-পুস্তকাগারে গিয়া তিনি নিয়মিত বই পড়িতেন। জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত।

তাঁহার সুন্দর আকৃতি, স্বাস্থ্য এবং স্বভাব দর্শনে মুগ্ধ না হইয়া কেহ থাকিতে পারিত না। অমর চট্টোপাধ্যায়ও একজন ভাল ছাত্র ছিলেন এবং তিনিই প্রদ্যোৎকে বিপ্লবীদলে লইয়া গিয়া মেদিনীপুরের তৎকালীন বিপ্লবী-নেতা দীনেশ গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। আপন



প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্য

প্রতিভায় প্রদ্যোৎ অল্পদিনের মধ্যেই বিপ্লবীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু ও কুস্তি শিক্ষা প্রভৃতি সবই শেষ করেন। দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি আপন দক্ষতায় দলের একজন প্রধান কর্ম্মী হইয়া উঠিলেন।

১৯৩২ সালে যখন গভর্ণমেণ্ট নূতন করিয়া দমননীতির প্রয়োগ সুরু করিলেন, প্রদ্যোৎ তখন মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার ছাত্র। পেডি সাহেবের পর মিঃ আর-কে ডগ্‌লাস তখন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহারই আমলে হিজলীর বন্দী-নিবাসে মর্ম্মন্তুদ অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। উক্ত ঘটনার পর সরকার পক্ষ হইতে যে বিভাগীয় তদন্ত-কমিটি গঠিত হয়, তাহার রিপোর্টে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের ঘটনার দায়িত্ব হইতে রেহাই দিয়া নিম্নপদস্থ সামান্য কয়েকজন কর্ম্মচারীর কার্য্যের সমালোচনা করিয়া ব্যাপারটি ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করা হয়। বিপ্লবীরা ইহাতে ঘোরতর অসন্তুষ্ট হন এবং সকল কিছুর জন্যই তাঁহারা মিঃ ডগ্‌লাসকেই দায়ী সাব্যস্ত করেন। তাঁহাদের ধারণা হয় যে, মিঃ ডগ্‌লাসই তদন্ত-কমিটির অভিমতকে ঐ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি দিবারাত্রই মদ্যপানে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া থাকিতেন—কাজেই ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তিনি শ্রদ্ধা-লাভেরও যোগ্য ছিলেন না; সুতরাং গভর্ণমেণ্টের চণ্ডনীতি চালু হওয়ার পরই মেদিনীপুরেও আবার যখন অত্যাচার চলিতে লাগিল—তখন প্রদ্যোৎকুমার ও প্রভাংশুশেখর পালের উপর ভার দেওয়া হইল ডগ্‌লাস সাহেবকে হত্যা করার।

১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসে উক্ত বোর্ডের এক সভা হইতেছিল। চেয়ারম্যান হিসাবে উহাতে সভাপতিত্ব করিতে-ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগ্‌লাস। সেই সময় তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশু সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সভার কার্য্য যখন চলিতেছিল, তখন প্রদ্যোৎ মিঃ ডগ্‌লাসের উপর গুলি নিক্ষেপের মানসে বার বার তাঁহার রিভলভারের ট্রিগার টানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রিভলভারটি বিকল হইয়া যাওয়ায় একটি গুলিও উদ্‌

হইতে বাহির হইল না। সেই মুহূর্ত্তেই প্রভাংশুও তাঁহার রিভলভার হইতে পর পর কয়েকটি গুলি নিক্ষেপ করিলেন। গুলিবিদ্ধ হইয়া মিঃ ডগলাস তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপরই হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেই যেন ক্ষণেকের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলেন। চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরী—তাহারই মাঝখানে এই কাণ্ড! যখন সকলের চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখা গেল যে দুইজন যুবক ছুটিয়া পলাইতেছেন। প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল। প্রভাংশুকে পলায়নের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য প্রদ্যোৎ তখনই ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন এবং রিভলভার দেখাইয়া প্রহরীদের রুখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে ফল আশানুরূপ হইল। প্রভাংশু নিরাপদে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন—কেহ তাঁহার সন্ধানও জানিতে পারিল না।

প্রভাংশুর স্থানত্যাগের পর প্রদ্যোৎও পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোকজন আসিয়া পড়ায় তিনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিস হইতে প্রায় চারশত গজ দূরে আশ্রয় লইলেন একটি ঝোপের মধ্যে। প্রহরীরা কিন্তু সেখান হইতে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। গ্রেপ্তার হওয়ার সময় প্রদ্যোতের পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ পাওয়া গেল। তাহাতে লেখা ছিল—

"ইহাদের মরণেতে বৃটিশেরা বুঝুক
আমাদের আহুতিতে ভারত জাগুক।"

থানায় গিয়া প্রদ্যোৎ অসহ্য গরম বোধ করিতে লাগিলেন। অগত্যা তাঁহাকে স্নান করিতে দেওয়া হইল ও পরিধানের জন্য দেওয়া হইল নূতন বস্ত্র। স্নানের পর তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়েন।

এই ঘটনার পর মেদিনীপুরে যথারীতি পুলিশী জুলুম সুরু হইল। বহু ব্যক্তিই ধৃত হইলেন। প্রদ্যোতের অন্তরঙ্গ সহকর্মী ফণীন্দ্রনাথ দাস

এবং প্রদ্যোতের তৃতীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর শর্ব্বরীভূষণকেও গ্রেপ্তার করা হইল। সংবাদলাভের আশায় পুলিশ তাঁহাদের তিনজনের উপরই নির্য্যাতন চালাইতে লাগিল। পীড়নের দ্বারাও কিন্তু কোনও খবরই তাঁহাদের নিকট হইতে বাহির করা গেল না। ষড়যন্ত্রের বিন্দুমাত্র আভাসও মিলিল না। প্রদ্যোতের সহকারীর নাম স ্‌ ্‌র অজানাই রহিয়া গেল।

আর কাহারও বিরুদ্ধে যখন কোন প্রমাণই সংগ্রহ করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হইল না, তখন অগত্যা একমাত্র প্রদ্যোৎকেই অভিযুক্ত করিয়া মামলা শুরু হইল। যে ট্রাইব্যুনালে এই মামলা আরম্ভ হইল—তাহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন শ্রী কে-সি-নাগ। অপর দুইজন কমিশনার ছিলেন শ্রীভূজগেন্দ্র মুস্তফি ও জ্ঞানাঙ্কুর দে আই-সি-এস্। ব্যারিষ্টার শ্রীনিশীথচন্দ্র সেন ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রদ্যোতের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। প্রদ্যোতের বিরুদ্ধে খুনের ষড়যন্ত্র ও খুনের সহায়তা করার অভিযোগ আনীত হইয়াছিল।

সাক্ষ্য-প্রমাণাদির দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইল যে, প্রদ্যোতের গুলিতে মিঃ ডগলাসের মৃত্যু হয় নাই, কারণ তাঁহার রিভলভার বিকল হইয়া গুলি-বর্ষণের অযোগ্য অবস্থায় ছিল, কিন্তু তথাপি ২৬শে জুন তারিখে যখন মামলার রায় প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল যে, একমাত্র জ্ঞানাঙ্কুর দে ব্যতীত অপর দুইজন বিচারক প্রদ্যোতের মৃত্যুদণ্ডের বিধান করিয়াছেন। প্রদ্যোতের অল্পবয়স এবং হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার দ্বারা সংঘটিত না হওয়ায় জ্ঞানাঙ্কুর দে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডদানের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেন; কিন্তু ট্রাইব্যুন্যালের সদস্যগণের অধিকাংশের মত অনুযায়ী প্রদ্যোতের মৃত্যুদণ্ডের আদেশই বলবৎ হইল।

ইহার পর মামলাটির পুনর্ব্বিচার হইল কলিকাতা হাইকোর্টে জাষ্টিস চারুচন্দ্র ঘোষ ও মিঃ জ্যাক-এর এজলাসে। শ্রী জে-সি-গুপ্ত ও শ্রীনিশীথচন্দ্র সেন প্রদ্যোতের পক্ষে হাইকোর্টে সওয়াল জবাব করিলেন। হাইকোর্টেও মৃত্যুদণ্ডই বহাল রহিল। "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় এই সময় প্রদ্যোতের মামলা উপলক্ষে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর অভিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে পাঁচশত টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন

প্রদ্যোতের জননী সরকারের নিকট তাঁহার পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিয়া যে আবেদন করেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। মৃত্যুদণ্ড লাভ করিয়াও কিন্তু প্রদ্যোতের কোনও ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার নির্লিপ্ত শান্ত ভাব দেখিয়া সকলেরই ইহা মনে হইত যে, একমাত্র যিনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, শুধু তাঁহারই পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে। মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের Condemned Cell-এ আবদ্ধ থাকার সময়ও তাঁহাকে সর্ব্বদাই শান্ত ও হৃষ্ট দেখা যাইত। কেবলমাত্র জননীর কথা স্মরণ হইলেই তিনি কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া পড়িতেন —কারণ জননীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন বড় বেশি।

জেলে অবস্থানকালে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের গ্রন্থ পড়িতে চাহিয়াছিলেন। আপত্তিজনক বিবেচিত হওয়ায় নজরুল ইসলামের বই তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। ফাঁসির পূর্ব্বের নিঃসঙ্গ দিনগুলি তিনি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠেই কাটাইয়া দেন।

প্রদ্যোতের ফাঁসি হয় মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে ১৯৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারি সকাল ৬টার সময়। তাঁহার ফাঁসির সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে মেদিনীপুর ও কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে পথে পথে বিপ্লবীরা প্রদ্যোতের ছবি বিতরণ করেন। ফটোর নিম্নে লেখা ছিল—

"লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারও ঋণ
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।"

প্রদ্যোতের ফটো বিতরিত হইতে দেখিয়া পুলিশ ও গোয়েন্দা-বিভাগ বুঝিতে পারে যে বিপ্লবীদল কিরূপ সক্রিয় রহিয়াছে। দলটির সন্ধান লাভের জন্য তাহারা আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু কোনও হদিসই লাভ করিতে পারে না।

ফাঁসির দিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রদ্যোৎ প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করেন এবং কপালে ফোঁটা পরিয়া পূজা সমাপ্ত করেন। জেলখানার লোক আসিয়া ফাঁসিমঞ্চে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করা মাত্র তিনি গাত্রোত্থান করেন এবং অকম্পিত পদে অগ্রসর হইয়া চলেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে। ডগ্‌লাস সাহেবের পর মিঃ জে-ই-জে বার্জ্জ তখন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রদ্যোৎ মঞ্চে উঠিতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন—"Are you ready, Prodyot ?"

প্রদ্যোৎ শান্তভাবে বলিলেন—"One minute, please, Mr. Burge. I have something to say." ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে বলিবার অনুমতি দিলেন। প্রদ্যোৎ বলিলেন,—"We are determined, Mr. Burge, not to allow any European to remain at Midnapur Yours is the next turn, get yourself ready." অল্প থামিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন,—"I am not afraid of death. Each drop of my blood will give birth to hundreds of Prodyots in all houses of Bengal. Do your work, please—"

অতঃপর প্রদ্যোতের ফাঁসি হইয়া গেল। ফাঁসির পর তাঁহার জনকয়েক আত্মীয় জেলখানার বাহিরে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পাদন করেন। মেদিনীপুরের জনসাধারণ তাঁহার প্রতি তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ যথাযোগ্যরূপে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

দুইটি স্বদেশী ডাকাতি

১৯৩২ সালের মে মাসে দুইটি স্বদেশী ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি হয় ১৩ই তারিখে ট্রেণে ঢাকা ও তেজগাঁও ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে। তেজগাঁও ষ্টেশনে কয়েকজন লোক টাকা লইয়া ট্রেণে উঠিয়াছিল। গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িলে কয়েক ব্যক্তি ট্রেণে উঠেন এবং কয়েকজনের টাকা কাড়িয়া লইয়া গাড়ী থামাইবার জন্য শিকল টানেন। গাড়ী থামিলে তাঁহারা টাকা লইয়া পলাইয়া যান। জনৈক ব্যক্তি গুলির আঘাতে নিহত হয়।

এই ডাকাতি উপলক্ষে কয়েকজন ধৃত ও অভিযুক্ত হন। তন্মধ্যে একজন হন এপ্রুভার। বিচারে জ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্তের সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়। বীরেন্দ্রচন্দ্র দে ও অপর একজন খালাস পান। বীরেন্দ্র মামলায় খালাস পাইলেও অর্ডিনান্স বলে পুনরায় তাঁহাকে আটক করা হয়।

অপর ডাকাতিটি সংঘটিত হয় ২৯শে তারিখে "যুগান্তর" দলের কর্ম্মীদের দ্বারা। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কমলপুরে কিশোরীমোহন বণিকের বাড়ী এই ডাকাতি হইয়াছিল। লুণ্ঠিত হইয়াছিল প্রায় ৪০০০৲ টাকা। এই উপলক্ষে বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে শেষ পর্য্যন্ত তিন জনের দশ বৎসর হিসাবে এবং এগারো জনের সাত বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড হয়।

আইন-অমান্য আন্দোলন ঢাকা জিলার বিক্রমপুরেও বেশ ভালভাবেই

চলিতেছিল। জনসাধারণ এই আন্দোলনে কার্য্যকরীভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং সভা-সমিতির অনুষ্ঠান ও বিলাতীদ্রব্য-বর্জ্জন চলিতে থাকে পুরাদমে। মহিলারাও এই আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করিয়াছিলেন।

কামাখ্যাপ্রসাদ সেনের জীবন-নাশ

কালীপদ মৈত্র তখন মুন্সীগঞ্জের মহকুমা-হাকিম। আন্দোলনের প্রসার ও প্রাবল্য দেখিয়া তাঁহাকে সহকারী হিসাবে সাহায্য করিবার জন্য কামাখ্যাপ্রসাদ সেনকে সাব-ডেপুটি স্পেশ্যাল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। দমননীতির পরিচালনায় তিনি শীঘ্রই সে অঞ্চলে বিশেষ কুখ্যাত হইয়া উঠেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদিগকে পাইকারি হারে গ্রেপ্তার করা হইত, এমন কি, নির্ব্বিচারে লাঠি চার্জ্জের হুকুম দিতে এবং ধৃত ব্যক্তিদিগকে লাঞ্ছিত করিতেও তিনি কসুর করিতেন না। মহিলা আন্দোলনকারীদিগের প্রতিও তিনি ভদ্রজনোচিত আচরণ করিতেন না, অনেকেই তাঁহার হস্তে অপমানিতা ও নিগৃহীতা হইতেন। ইহার ফলে তিক্ততা ক্রমশঃ এতই বৃদ্ধি পাইল যে সরকার পক্ষও তাঁহার জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। কামাখ্যাবাবুর হিতা-কাঙ্ক্ষীরা তাঁহাকে ছুটি লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন। তাঁহাদের পরামর্শে তিনি ছুটির আবেদন করিতেই ছুটি মঞ্জুর হইল। বেতন লইবার জন্য কামাখ্যাবাবু তখন ঢাকায় গেলেন।

১৯৩২ সালের ২৩শে জুন কামাখ্যাবাবু ঢাকায় গিয়া সদর মহকুমা-হাকিম শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে অবস্থান করিতে থাকেন। ঢাকায় ওয়ারী মহল্লায় র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীটে ছিল শচীনবাবুর বাসা। একতলার যে ঘরখানিতে কামাখ্যাবাবুর থাকার ব্যবস্থা হয়, তাহার একদিকের একটি জানালায় লোহার শিক ছিল না; তাহার ফলে যে কোন লোক ইচ্ছা

করিলে বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিত। কামাখ্যাবাবুর বিপদের কথা স্মরণ করিয়াই শচীনবাবু তাঁহাকে সর্ব্বদাই জানালাটি বন্ধ রাখিতে বলিতেন, কিন্তু কামাখ্যাবাবু গরমের জন্য জানালাটি প্রায়ই খুলিয়াই রাখিতেন।

২৬শে জুন কামাখ্যাবাবু রাত্রিকালে আহারের পর জানালাটি খুলিয়া রাখিয়াই শয়ন করেন। শেষ রাত্রের দিকে শচীনবাবুর হঠাৎ সন্দেহ হয় এবং সকলকে জাগরিত করিয়া স্ত্রী ও পুত্রসহ তিনি কামাখ্যাবাবুর কক্ষে গিয়া প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা বারুদের গন্ধ পান এবং দেখিতে পান যে শয্যার একদিকের মশারি উঠান অবস্থায় রহিয়াছে। কামাখ্যাবাবুর শরীরে কতকগুলি গুলির আঘাত-চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। ক্ষতগুলি হইতে তখনও রক্তস্রাব হইতেছিল। থানায় তৎক্ষণাৎ সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু পুলিশ আসিয়াও অপরাধীর কোনও সন্ধান করিতে পারে না।

অসতর্কতার জন্য পরদিন ২৭শে জুন কিন্তু পুলিশ আসামীকে খুঁজিয়া বাহির করিল। ইছাপুরের "সারদা মেডিকেল হল"-এর সুরেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইবার জন্য একটি সংবাদ লইয়া জনৈক ব্যক্তি টেলিগ্রাফ অফিসে মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হন। উক্ত টেলিগ্রামের প্রেরিতব্য সংবাদটি নিম্নরূপ ছিল—

"Kamakshya's Operation Successful. No Anxiety."

সংবাদটি দেখিয়াই টেলিগ্রাফ অফিস হইতে তৎক্ষণাৎ ফোনে থানায় সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ ইনস্পেক্টারও অবিলম্বে সেখানে গিয়া উপস্থিত হন এবং যিনি সংবাদটি লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহাকে পাকড়াও করেন। অতঃপর তাঁহাকে লইয়া নানা স্থানে হানা দিবার পর পুলিশ গ্রেপ্তার করিল ১৯ বৎসর বয়স্ক যুবক কালীপদ চক্রবর্ত্তীকে।

কামাখ্যাবাবু যে কক্ষে নিহত হইয়াছিলেন, কালীপদকে সেই কক্ষে লইয়া যাওয়া হইলে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে থাকে এবং তিনি কাঁদিয়া ফেলেন। অতঃপর তিনি পুলিশের নিকট একটি স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, কামাখ্যা সেন মহিলাদিগকেও অপমান করিতেন বলিয়া তাঁহার মনে আঘাত লাগে এবং দেশের স্বার্থেই তিনি কামাখ্যা সেনকে গুলি করিয়া মারেন; সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনি একা ব্যতীত আর কেহই দায়ী নহেন; নিরপরাধ ব্যক্তিগণের উপর সন্দেহবশে অত্যাচার চলিতেছে বলিয়া অন্যের বিনা প্ররোচনায় তিনি সেই স্বীকারোক্তি প্রদান করিতেছেন।

কালীপদ স্বীকার করেন যে, একটি অটোমেটিক পিস্তলের সাহায্যে তিনি কামাখ্যা সেনকে হত্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু পিস্তলটি কিভাবে কাহার নিকট হইতে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করেন নাই। তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া যে মামলা হয়, তাহাতে ৮ই নভেম্বর তারিখে তিনি মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হন। কালীপদ শান্তভাবেই দণ্ডাদেশ গ্রহণ করেন।

কালীপদর জননী শৈলবালা দেবী পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিয়া যে আবেদন করেন, তদুত্তরে ১৯৩৩ সালের ২২শে জানুয়ারি তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, তাঁহার পুত্রের প্রতি কোনও করুণা প্রদর্শন করা হইবে না। ইহার কয়েকদিন পরেই কালীপদর ফাঁসি হইয়া যায়।

কয়েকটি ঘটনা

ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকার সম্পাদকের উপর আক্রমণ চালান হয় ১৯৩২ সালের ৫ই আগষ্ট। সম্পাদক মিঃ ওয়াটসন যখন চৌরঙ্গী রোডের উপর দিয়া মোটরে করিয়া যাইতেছিলেন, তখন জনৈক আততায়ী গাড়ীর ফুট-বোর্ডে উঠিয়া তাঁহার উদ্দেশে গুলিবর্ষণ করেন। মিঃ ওয়াটসন অল্পের জন্য

রক্ষা পান। অফিসের দরোয়ান আততায়ীকে ধরিয়া ফেলে এবং জনৈক কনষ্টেবলও সেই সময় সেখানে গিয়া পড়ে। উভয় পক্ষে ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যেই আততায়ী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করেন।

১৯৩২ সালেই কুমিল্লা গুপ্তচর হত্যার ষড়যন্ত্র ও হটাখোলা ট্রেণ লুঠ মামলা হইয়াছিল। কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জে একজন গুপ্তচরকে হত্যা করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র হয়। এই সম্পর্কে অভিযুক্ত হন—বিরাজ দেব নামক জনৈক বিপ্লবী এবং বিচারে তাঁহার প্রতি প্রদত্ত হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড। আসাম প্রদেশের হটাখোলা নামক ষ্টেশনে ডাকাতির অভিযোগেও তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ফলে তাঁহাকে সর্ব্বসমেত ১৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়।

মিঃ সি-এম-গ্রাসবি ছিলেন ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তাঁহার উপরে বিপ্লবীরা আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না। ১৯৩২ সালের ২৮শে আগষ্ট নবাবপুর রোড দিয়া মোটরে করিয়া যাইবার কালে আততায়ীর গুলিতে তিনি আহত হন। গ্রাসবি সাহেবের দেহরক্ষী আততায়ীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলে তিনিও আহত হইয়া ধৃত হন; তাঁহার নাম বিনয়ভূষণ রায়। বিচারে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেন।

Statesman পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ওয়াটসনকে দ্বিতীয়বার আক্রমণের চেষ্টা হয় ঐ বৎসরই ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে। ঐদিন সন্ধ্যা-কালে তাঁহার মোটরখানি ঘুরিতে ঘুরিতে যখন ষ্ট্রাণ্ড রোড ও নেপিয়ার রোডের সঙ্গমস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে আর একখানি মোটর তাঁহাদের গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়ে এবং উক্ত গাড়ী হইতে মিঃ ওয়াটসনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। ওয়াটসন সাহেবের গাড়ীর হুড তখন খোলা অবস্থায় ছিল। তাঁহার যে মহিলা ষ্টেনোগ্রাফারটি তখন তাঁহার সঙ্গে গাড়ীতে ছিলেন—তিনি এই বিপদের

মুখে যথেষ্ট সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন। গুলির শব্দ শুনিতে পাইয়াই তিনি ওয়াটসন সাহেবকে অতি দ্রুত গাড়ীর নিম্নদেশে ঠেলিয়া দেন এবং নিজে উপর হইতে তাঁহাকে আড়াল করিয়া রাখেন। বিপ্লবীদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে সেই মহিলা ষ্টেনোগ্রাফারটির বামহস্ত জখম হয় এবং গাড়ীর চালকও আহত হয়। ওয়াটসন সাহেব নিজেও আঘাত পান। ইতিমধ্যে একজন সার্জেন্ট ঘটনাস্থলে আসিয়া আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করিয়া গুলি-বর্ষণ করিতে থাকিলে বিপ্লবীরা মোটর লইয়া প্রস্থান করেন।

ঘটনার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তাঁহাদের গাড়ীখানি মাঝেরহাটে বুড়াশিবতলায় গিয়া উপস্থিত হয়। মনী লাহিড়ী ও গোপাল চৌধুরী নামক দুইজন বিপ্লবী গুলির আঘাতে গুরুতররূপে জখম হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মৃতদেহ পরে ঐ গাড়ীখানি হইতে উদ্ধার করা হয়। দলের অবশিষ্ট বিপ্লবীরা সেখানে গাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যান।

প্রেসিডেন্সি জেনারল হাসপাতালে থাকিয়া ওয়াটসন সাহেব আরোগ্যলাভ করেন। অতঃপর উক্ত ঘটনার জন্য পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। আলিপুরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া যে মামলা হয়, তাহাতে কয়েকজনের প্রতি কঠোর সাজা হয়। সেই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল হইলে সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং প্রমোদরঞ্জন বসুর দশ বৎসর কারাদণ্ড বহাল থাকে।

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডির হত্যা-প্রসঙ্গে বিমল দাশগুপ্তের ধৃত হওয়া এবং প্রমাণাভাবে তাঁহার মুক্তি পাওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিমল দাশগুপ্তের পিতার নাম অক্ষয় দাশগুপ্ত। অক্ষয়-বাবুর নিবাস ছিল বরিশালে, কিন্তু তিনি মেদিনীপুরে শিক্ষকতা করিতেন। বিমল দাশগুপ্ত তখন মুক্তি পাইলেও শীঘ্রই আর একটি আক্রমণ পরিচালিত

করিতে গিয়া ধৃত হইলেন। ১৯৩২ সালের ২৯শে অক্টোবর ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ ই-ভিলিয়ার্স মধ্যাহ্নকালে যখন ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ গিলেণ্ডার হাউসের উপরতলায় অপর কয়েকজনের সহিত আলাপ-আলোচনায় রত ছিলেন, তখন সাহেবী পোষাকে সজ্জিত বিমল দাশগুপ্ত সেখানে গিয়া তাঁহাকে গুলি করেন। কয়েকজন সাহেব ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া বিমলকে ধরিয়া ফেলেন।

মিঃ বার্টলি, শ্রী এন-কে বসু এবং শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষকে লইয়া গঠিত এক ট্রাইব্যুন্যালে বিমলের বিচার সুরু হয় ৩১শে অক্টোবর হইতে। বিচারের সময় তিনি বলেন যে, ইউরোপীয়দিগের অন্যায় আন্দোলনের ফলেই হিজলী এবং চট্টগ্রামে ভয়াবহ উৎপীড়ন চালান হইয়াছে এবং সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ মানসেই তিনি মিঃ ভিলিয়ার্সকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১২ই নভেম্বর ট্রাইব্যুন্যাল তাঁহাকে দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া রায় দান করেন।

রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ চার্লস লিউক ২৮শে নভেম্বর তারিখে যখন জেলখানা ত্যাগ করিয়া জেনারল্ পোষ্ট অফিসের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার উপরও রিভলভারের গুলি বর্ষিত হয়। আহত অবস্থায় মিঃ লিউক-কে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনা হইয়াছিল।

মেদিনীপুরের তৃতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা—মিঃ বার্জ্জ

বিপ্লবীরা যে মেদিনীপুরে কোনও শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেটকে থাকিতে দিবেন না, তাহার প্রমাণ পুনরায় পাওয়া গেল। ডগ্‌লাস সাহেবের পর এইবার পালা আসিল মেদিনীপুরের পরবর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ্জ-এর। ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে মেদিনীপুর শহরে একটি ফুটবল

ম্যাচ হইবার কথা ছিল। তত্রত্য টাউন ক্লাবের সহিত মহমেডান ক্লাবের খেলা। বার্জ্জ সাহেব নিজেই টাউন ক্লাবের পক্ষে খেলায় নামিতে মনস্থ করেন। লোক হিসাবে মিঃ বার্জ্জের যথেষ্ট সুনাম ছিল। অনেকেই তাঁহার শিষ্টাচার, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং সাহসের প্রশংসা করিত। আপনার বিপজ্জনক অবস্থার বিষয় জানিয়াও তিনি অবাধে জনসাধারণের সহিত মেলামেশা করিতেন এবং শহরের যুবকগণের সহিত ফুটবলও খেলিতেন। যাহা হউক, ব্যক্তিগত বিচারের দ্বারা নহে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই বিপ্লবিগণ তাঁহাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। খেলা আরম্ভ হওয়ার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি যখন আপন মোটরে করিয়া আসিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া মাঠের মধ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন কয়েকজন যুবক অতর্কিতে তাঁহার উপর গুলিবর্ষণ করিলেন। আঘাত এতই গুরুতর হইল যে, মিঃ বার্জ্জ ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গের সশস্ত্র প্রহরীরা আততায়ীদেব লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতে লাগিল। ইহার ফলে একজন তৎক্ষণাৎ গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হইলেন এবং আর একজন গুরুতরভাবে আহত হইলেন। আহত যুবকটি "আমাকে মেরে ফেল" "আমাকে মেরে ফেল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সঙ্গের অপর যুবকগণ পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। আহত যুবকটিকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইল—সেখানে তিনিও প্রাণত্যাগ করিলেন। মিঃ বার্জ্জকে হত্যা করিতে গিয়া এইভাবে যে দুইজন বিপ্লবী জীবন-দান করিলেন—তাঁহাদের নাম অনাথবন্ধু পাঞ্জা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত।

এই ঘটনার পর মেদিনীপুরে পুনরায় নূতন করিয়া খানাতল্লাস, ধরপাকড় ও পুলিশী জুলুম সুরু হইল। বার্জ্জ সাহেবের পর মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন মিঃ গ্রিফিথস্। পুলিশ এবং মিলিটারির অত্যাচার একই সঙ্গে চলিতে লাগিল। কত নিরপরাধ ব্যক্তিও যে প্রহারে

জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন—তাহার সংখ্যা নাই। বহু লোক শহর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সমগ্র শহরে যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও আততায়ীদের অন্য কাহাকেও বা হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের কাহাকেও পুলিশ ধরিতে পারিল না। কেহ কোনও অপরাধীকে ধরাইয়া দিতে বা ধৃত করিবার উপযোগী সংবাদ সরবরাহ করিতে পারিলে তাহাকে ২৫০০৲ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। পরে এই পুরস্কারের টাকা বৃদ্ধি করিয়া ক্রমশঃ ৫০০০৲ টাকা ও ১০,০০০৲ টাকা করা হইল, কিন্তু তথাপি কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না।

অবশেষে পুলিশ কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে—তন্মধ্যে একজন স্বীকারোক্তি প্রদান করে এবং মামলার সময় রাজসাক্ষী হয়। একটি ট্রাইব্যুন্যালে আসামীদের বিচার সুরু হয়। এই ট্রাইব্যুন্যালের চেয়ারম্যান ছিলেন জজ মিঃ ওযেট্। পরলোকগত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শ্রীনিশীথচন্দ্র সেন, শ্রীজে-সি-গুপ্ত, শ্রীসন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন।

কিছুদিন ধরিয়া অধিবেশনের পর মামলাটির শুনানি ও সওয়াল শেষ হয়। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মামলাটির অনুকূলে বিশেষ সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই। রাজসাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্য অপর কাহারও দ্বারা সমর্থিত বা অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই। টাকার লোভেও অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল। এতৎসত্ত্বেও কিন্তু রায় প্রকাশিত হইলে দেখা গেল যে, বিচারকগণ ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী, নির্ম্মলজীবন ঘোষ এবং রামকৃষ্ণ রায়ের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। সনাতন রায়, নন্দদুলাল সিংহ প্রভৃতি অপর পাঁচজনও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত

হন। অনেকে ইহা বিশ্বাস করেন যে, জুরির সাহায্যে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হইলে এইরূপ বিচার-প্রহসন ঘটিতে পারিত না।

যাহা হউক, বার্জ্জ সাহেবের হত্যার পর পুলিশ কোনও মতে জানিতে পারে যে ডগলাস্-নিধনে অংশগ্রহণকারী প্রদ্যোতের অপর সহকারী ছিলেন প্রভাংশুশেখর পাল। মিঃ বার্জ্জ নিহত হওয়ার দশ-বারো দিন পরেই কলিকাতায় প্রভাংশুকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাঁহার উপর নানাবিধ উৎপীড়ন চলিতে থাকে। বহু চেষ্টা করিয়াও কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা উপস্থাপিত করিতে পারার মত কোনও প্রমাণ পুলিশ সংগ্রহ করিতে পারে না। অগত্যা তাঁহাকে বিনা বিচারেই বন্দী করিয়া রাখা হয়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা

ভারতে বলশেভিকবাদ প্রচারের জন্য ১৯২৮ সাল হইতে কয়েকখানি বিলাতী ও ভারতীয় সংবাদপত্র এক প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইহার ফলে ভারত-গভর্ণমেণ্ট অতিশয় শঙ্কিত হন এবং ভারতে বলশেভিকবাদ কতদূর প্রসারলাভ করিয়াছে তাহা অনুসন্ধানের জন্য ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ ইটন নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন। অনুসন্ধান-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ১৯২৯ সালের ১৫ই মার্চ্চ মিঃ ইটন যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে তিনি বলশেভিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এক ভারতব্যাপী ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সমর্থন করেন। ইহার ফলে ঐ বৎসরেই মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি পুলিশ ভারতের প্রায় দুইশত স্থানে খানা-তল্লাস করিয়া বহু দলিল ও কাগজ-পত্র হস্তগত করে এবং এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থান হইতে ৩১ জন লোককে গ্রেপ্তার করে। এই ৩১ জনের মধ্যে বোম্বাই হইতে ১৩ জন, বঙ্গদেশ হইতে ৯ জন, যুক্তপ্রদেশ হইতে ৫ জন এবং

পাঞ্জাব হইতে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকার মনে করেন যে, এই ষড়যন্ত্রটির কেন্দ্র ছিল মীরাট-এ এবং সেই কারণে মীরাটেই মামলাটির বিচারকার্য্য সম্পন্ন করা স্থির হয়। তদনুযায়ী মীরাটের এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হোয়াইট-এর এজলাসে এই ৩১ জনকে অভিযুক্ত করিয়া ১৯২৯ সালের ১২ই জুন যে মামলা রুজু হয়—তাহাই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

এই মামলাটি পরিচালনার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিরাট আয়োজন করেন এবং ইহাতে বহু লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। কয়েকজন বিশেষ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করা হয় কেবলমাত্র এই মামলাটির তদ্বির করিবার জন্য। এই মামলা পরিচালনার ভার দেওয়া হয় কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস্-এর উপর। গভর্ণমেণ্টের তরফে ডেপুটি পুলিশ-ইনস্‌পেক্টর মিঃ হর্টন এই মামলাটি দায়েব করেন। ইংলণ্ডের রাজাকে বৃটিশ-শাসিত ভারত-সাম্রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া ১২১ (ক) ধারামতে অপরাধ অনুষ্ঠানের অপরাধে আসামীদিগকে অভিযুক্ত করা হয়।

মামলাটি চালাইবার জন্য আসামীদের তরফে যে প্রচুর টাকার প্রয়োজন, তাহা মিটাইবার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি সেণ্ট্রাল ডিফেন্স ফাণ্ড গঠিত হয়—বঙ্গদেশেও তাহার একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছিল।

মামলার শুনানি চলিতে থাকার সময়ই একজন অভিযুক্ত আসামীর মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিন ধরিয়া ইহার শুনানি চলার পর ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে মামলাটি স্থানান্তরিত হয় মীরাটের সেসনস্ জজ মিঃ আর-এম-ইয়র্ক-এর নিকটে। তিন শতাধিক সাক্ষী এই মামলায় সাক্ষ্য দান করে। ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ সমাপ্ত হয়। এসেসাররা

তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করেন ১৯৩২ সালের ১৬ই আগষ্ট। ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি মীরাটের সেসনস্ জজ এই মামলার রায় দেন। তাঁহার বিচারে তিনজন মুক্তিলাভ করেন এবং অবশিষ্ট ২৭ জন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই রায়ের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপিল করেন। উক্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ ইয়ং মামলাটির পুনর্ব্বিচার করিয়া ১৯৩৩ সালের ৩রা আগষ্ট তাঁহাদের রায় দেন। সেসনস্ আদালতে দণ্ডিত ২৭ জনের মধ্যে আরও ৯জন এই পুনর্ব্বিচারের ফলে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। ইহা ব্যতীত আরও পাঁচজনকে বিচারপতিদ্বয় এই বিবেচনায় মুক্তি দিবার আদেশ দেন যে, সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া বিচারকার্য্য চলিবার ফলে তাঁহাদিগকে যে দীর্ঘ কয়েক বৎসর আটক থাকিতে হইয়াছে—তাঁহাদের অপরাধ অনুযায়ী দণ্ডের তুলনায় তাহাই যথেষ্ট। ১২ বৎসর হইতে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের দণ্ডকাল হ্রাস করিয়া ৩ হইতে ১ বৎসর পর্য্যন্ত করা হইল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন আসামীর প্রতিও তিন বৎসর মাত্র কারাবাসের আদেশ হইল। ৪ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপর একজন আসামীর প্রতি প্রদত্ত হইল মাত্র ৭ মাস কারাদণ্ড। টাইপ করা ফুলস্কেপ কাগজের ১৭৯ পৃষ্ঠায় এই রায় প্রদত্ত হয়। আদালতে সমগ্র রায়টি পাঠ করিতে কয়েকদিন সময় লাগে।

বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ারির অভিযোগে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া কয়েকজনের বিরুদ্ধে আর একটি মামলা চলিতেছিল—উহা দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গভর্ণমেণ্ট মামলা তুলিয়া লইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে মুক্তিদান করেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য মামলা। হিজলী, দেউলী ও বক্সা বন্দী-নিবাস হইতে কয়েকজন বিপ্লবী কোনও মতে পলায়ন করেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ অন্যান্য বিপ্লবীদের সহায়তায় এক ব্যাপক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সশস্ত্র বিপ্লব পরিচালনার উদ্দেশ্যে তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকেন এবং একটি পরিকল্পনাও রচিত হয়। এই ষড়যন্ত্র বাংলা, পাঞ্জাব, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, গুজরাট, দিল্লী, বিহার, উড়িষ্যা এমন কি, ব্রহ্মদেশ পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পুলিশ অনুসন্ধান কার্য্য চালাইতে চালাইতে ১৯৩২ সালের ২৮শে ডিসেম্বর পলাতক বন্দী জিতেন্দ্রনাথ গুপ্তকে গ্রেপ্তার করে। ঐ বৎসরেরই ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বক্সা বন্দী-নিবাস হইতে তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তারের পর তাঁহার নিকট হইতে বহু আপত্তিজনক দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতঃপর পুলিশ কলিকাতায় আরও বহু স্থানে খানাতল্লাস করে এবং প্রভাত চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তল্লাসীর ফলে বহু কার্তুজ, নক্সা, আপত্তিকর পুস্তিকা ও কাগজপত্র প্রভৃতি পুলিশের হস্তগত হয়।

১৯৩৩ সালের ৭ই আগষ্ট আলিপুরে একটি ট্রাইব্যুন্যালে ৩৮ জন আসামীর বিরুদ্ধে এক মামলা উপস্থাপিত হয়। ট্রাইব্যুন্যাল গঠিত হইয়াছিল মেসার্স টি-বি-জেমসন, আর-সি-সেন এবং মৌলভী এম-ওয়াই-সিরাজি-কে লইয়া। আসামীদের বিরুদ্ধে খুন ও ডাকাতির ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন ভঙ্গের অভিযোগ আনীত হয়। সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালিত করিতে থাকেন পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন ব্যারিষ্টার জে-সি-গুপ্ত, বি-কে-চৌধুরী প্রভৃতি। দিন কয়েক পরে ১৪ই আগষ্ট তারিখে আরও দুইজন বিপ্লবীকে এই মামলায় জড়িত করা হয়।

মামলাটি চলিতে থাকার সময়ই ১৯৩৪ সালের ১লা আগষ্ট আলিপুর জেল হইতে দুইজন বিচারাধীন আসামী পলায়ন করেন। ইহার পর হইতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অন্যান্য আসামীগণকে আদালতে আনিবার সময় পায়ে বেড়ী পরাইয়া আনা হইত। কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল যে, সাবধান না হইলে অন্যান্য আসামীরাও হয় তো পলাইয়া যাইতে পারেন।

ট্রাইব্যুনালের অন্যতম কমিশনার মিঃ আর-সি-সেন পীড়াগ্রস্ত হইয়া ১৯৩৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্থলে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে মিঃ আর-এইচ্-পার্কার কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ সালের ১লা মে তারিখে মামলার রায় প্রকাশিত হয়। বিচারে ৬ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং ৩ জনের দশ বৎসর, ৯ জনের সাত বৎসর, ৪ জনের ছয় বৎসর, ১ জনের পাঁচ বৎসর, ৭ জনের তিন বৎসর এবং ২ জনের এক বৎসর হিসাবে কঠোর কারাদণ্ড হয়। দুইজন আসামী এই মামলায় রাজসাক্ষী হইয়াছিলেন। চারিজন অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসরস্থ রোশনলাল ব্রহ্মচারীর সহিতও এই সকল বিপ্লবীর যোগাযোগ ছিল। মাদ্রাজে একটি বাড়ীতে রোশনলালের সন্ধান পাইয়া পুলিশ তাঁহাকে তথায় গ্রেপ্তার করিতে যায় এবং বাড়ীটি ঘেরাও করে। তাঁহার দলের বিপ্লবীরা তখন পুলিশের উপর বোমা নিক্ষেপ করে। ইহার ফলে জনৈক পুলিশ কনষ্টেবল আহত হয়। পুলিশও গুলি চালাইলে গোবিন্দরাম নামক জনৈক বিপ্লবী নিহত হন। শেষ

পর্য্যন্ত পুলিশ সকল বিপ্লবীকেই গ্রেপ্তার করে। বাড়ীটি তল্লাস করিয়া বিবিধ বিস্ফোরক দ্রব্য ও বিপ্লববিষয়ক পুস্তিকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রোশনলাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতির দ্বারাই "Hindusthan Socialist Revolutionary Party" গঠিত হইয়াছিল।

আরও কয়েকটি ঘটনা

এই সময়কার আর কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত হিলি ষ্টেশনে যে সরকারী ডাক লুঠ হয়, সে সম্পর্কেও ১৯৩৩ সালে একটি ষড়যন্ত্র মামলার উদ্ভব হয়। উক্ত মামলায় হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য ও প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে, তিনজন দশ বৎসর ও কয়েকজন পাঁচ বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রংপুরে ডাকাতির ষড়যন্ত্র প্রভৃতি করার অভিযোগে এই বৎসরই রংপুর ষড়যন্ত্র মামলা হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া হেম বক্সী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং আরও কয়েকজন কারাদণ্ড লাভ করেন।

দিনাজপুরে ডাকাতি প্রভৃতি সম্পর্কে ১৯৩৪ সালে আর একটি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হয়। উহাতে নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের ১৫ বৎসর ও দীনেশ দাসের ১২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩৪ সালে বাংলার গভর্ণর সার জন এণ্ডারসনকে হত্যার জন্য চেষ্টা চলে। দার্জিলিং-এর লেবং নামক স্থানে ঘোড়দৌড়ের মাঠে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি বর্ষিত হয়। গভর্ণর অক্ষত দেহে রক্ষা পান। কয়েকজনকে এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত আসামীদের বিচার হইলে ভবানী ভট্টাচার্য্যের প্রতি ফাঁসির আদেশ হয় এবং মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ, উজ্জ্বলা মজুমদার, মধু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভৃতির বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। শোভারাণী দত্তের উপর হয় বহিষ্কারের আদেশ।

চট্টগ্রাম জেলার বাথুয়া নামক স্থানে ডাকাতি করার জন্ম এই বৎসর প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী, মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী এবং আরও কয়েকজন অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন।

১৯৩৫ সালেও কয়েকটি মামলা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ২০।২২ জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা নামে একটি বড় মোকদ্দমা হয়। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ইহাতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ করেন এবং প্রফুল্ল সেন প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকজনের প্রতি চার হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ঢাকা শহরে হীরালাল চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্যক্তিকে গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন অমূল্য রায়। বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এই বৎসরের জুন মাসে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়া-মদনপুর গ্রামের কালীপদ ভট্টাচার্য্য নামক একজন গোয়েন্দা পুলিশকে ছোরা লইয়া আক্রমণ করিয়া হত্যা করার অভিযোগে আশু ভরদ্বাজ ও অমূল্য চৌধুরীর প্রতি প্রদত্ত হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ।

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রামে একজন গুপ্তচরকে হত্যার চেষ্টা করার জন্য অমূল্য আচার্য্য দশ বৎসর কারাদণ্ড লাভ করেন।

স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন বিপ্লবান্দোলনের এইখানেই পরিসমাপ্তি। ইহার পর হইতে ভারতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে—তাহাই গণ-অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে তাহা আর সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই। এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা লণ্ডনে সার মাইকেল ও'ডায়ারের হত্যাকাণ্ড। জালিয়ানওয়ালাবাগের

হত্যাকাণ্ডের সময় যিনি পাঞ্জাবের ছোটলাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, দীর্ঘদিন পরেও ভারতবাসীরা তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার স্বদেশে গিয়াও তাঁহার প্রাণনাশ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন একজন ভারতবাসী—তাঁহার নাম উধম সিং আজাদ। ইহার জন্য বিচারে উধম সিং-এর প্রাণদণ্ড হয়।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক—সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ

যাহা হউক, এদিকে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকাকালেই ১৯৩২ সালের শেষদিকে বিলাতে আবার একটি গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইল উহাই তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক। উহাতেও বিশেষ কিছুই কাজ হইল না। এই বৎসরই ১৭ই আগষ্ট ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব তাঁহার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করিলেন। এই বাঁটোয়ারায় আইনসভাসমূহে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যসংখ্যা নিরূপিত করিয়া দেওয়া হইল। মুসলমানদের জন্য যে পৃথক্ নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা তো আরও সম্প্রসারিত করা হইলই, উপরন্তু হরিজনদের জন্যও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা ও আসনের ব্যবস্থা করিয়া বর্ণ-হিন্দুগণ হইতে তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিয়া ফেলার চেষ্টা হইল। সুবৃহৎ হিন্দু-সমাজকে এইভাবে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ফেলাই ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল।

বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অনশন—পুণা-চুক্তি

বর্ণহিন্দু ও হরিজনদিগের জন্য পৃথক্ নির্ব্বাচন ব্যবস্থায় গান্ধীজী অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ইহার প্রতিবাদে ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে যারবেদা জেলে অনশন আরম্ভ হইল। গান্ধীজীর অনশনে সমগ্র ভারত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

দেশের গণ্যমান্য সকল মনীষীই তৎপর হইয়া উঠিলেন—সকলেরই একমাত্র চিন্তা হইল কি করিয়া সমস্যাটির সমাধান করিয়া গান্ধীজীর অনশনের অবসান ঘটানো যায়। শাসকবর্গ জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, বর্ণহিন্দু ও হরিজন -সংশ্লিষ্ট এই উভয় সম্প্রদায়েব নেতৃবৃন্দের সম্মতি ব্যতিরেকে ঘোষিত বাঁটোয়ারার কোনও পরিবর্ত্তন সাধন করা হইবে না। উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে যাহাতে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব হইতে পারে, তজ্জন্য খুবই চেষ্টা চলিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে উভয় সম্প্রদায়েব নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন হইল পুণায় এবং একটি চুক্তিও সম্ভব হইল। উহাতে স্থির হইল যে, আইন-সভায় হরিজন-দিগের পৃথক্ আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথার পরিবর্ত্তে যুক্ত-নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত থাকিবে। মহাত্মাজীর অনশনের পঞ্চম দিবসে সম্পাদিত এই চুক্তিটি "পুণা-চুক্তি" নামে খ্যাত। মহাত্মা গান্ধী ইহার পর তাঁহাব অনশন ত্যাগ করিলেন।

ভারত-শাসন আইন—১৯৩৫

প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসনের অবসান, প্রাদেশিক শাসন-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা সমন্বিত একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের ভিত্তিতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে ১৯৩৫ সালে একটি নূতন ভারত-শাসন আইন পাশ হইল। এই আইনটিতে কতকগুলি বিষয়ে কিছু কিছু ক্ষমতা পূর্ব্ববর্ত্তী আইনগুলি অপেক্ষা আইন-পরিষদের কাছে দায়ী মন্ত্রিমণ্ডলীর হস্তে ছাড়িয়া দেওয়ার ভড়ং দেখান হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা বড়লাট-ছোটলাটগণের হস্তেই রহিয়া গেল। স্থির হইল যে, ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই শাসন-তন্ত্র বলবৎ হইবে।

নূতন শাসন-তন্ত্র চালু করিবার জন্য যে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে

কংগ্রেস দল পাঁচটি প্রদেশের আইন-সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করিলেন এবং আরও চারিটি প্রদেশের আইন-পরিষদে সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১লা এপ্রিল যখন নূতন শাসন-তন্ত্র চালু হইল, তখনও পর্য্যন্ত কংগ্রেসপক্ষ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ দল প্রদেশে প্রদেশে অস্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনে গভর্ণরদিগকে সাহায্য করিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ শাসন-তন্ত্রের প্রাদেশিক ব্যবস্থাটুকুই চালু করা হইল এবং গভর্ণমেণ্ট আশা করিতে লাগিলেন যে, উহার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাটুকুও ভবিষ্যতে সুবিধামত চালু করা সম্ভব হইবে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই নূতন শাসন-তন্ত্রকে "দাসত্বের নূতন সনদ" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। অবিশ্বাসভরে কংগ্রেসদল কয়েক মাস যাবৎ দূরে দূরেই রহিলেন—সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও মন্ত্রিত্ব গ্রহণে রাজি হইলেন না। অবশেষে ঐ বৎসরের ২২শে জুন তারিখে তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এক বিবৃতি মারফত এই আশ্বাস দান করিলেন যে, প্রদেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য্য পরিচালনায় প্রদেশের ছোটলাটগণ মন্ত্রি-গণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই আশ্বাসের ফলে জুলাই মাসে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, সংযুক্ত-প্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—এই সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিলেন। কিছুদিন পরে সিন্ধু ও আসামেও অন্যান্য দলের সহিত কংগ্রেস দল যৌথ-মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও কংগ্রেসের দাবী

ইউরোপের আকাশে কিছুদিন হইতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। পাছে যুদ্ধ বাধিলে ভারতবর্ষকেও সেই যুদ্ধে জড়িত

করা হয় এবং প্রদেশসমূহে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যরত থাকার ব্যাপারকে সেই যুদ্ধে কংগ্রেস দলের পরোক্ষ সমর্থন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, সেই আশঙ্কায় এই সময় নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি এইরূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে, ভারতীয় জনগণের পূর্ণ অনুমোদন ব্যতীত ভারতকে কোনও যুদ্ধে জড়িত করার অথবা তদুপলক্ষে ভারতীয় সম্পদ নিয়োগ করার যে কোন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হইবে। কংগ্রেস মন্ত্রি-মণ্ডলীগুলিকেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এবম্বিধ প্রস্তুতিতে কোনও সাহায্য না কবিবার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর ১৯৩৯ সালেব সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকেই সত্যই যুদ্ধ বাধিল। ১৫ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওযার্কিং কমিটি এইরূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে, ভারত যুদ্ধে যোগদান করিবে কিনা, তাহা একমাত্র ভারতের জনগণই স্থির করিবে এবং ভারতে বা অন্য কোথাও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য পরিচালিত কোনও যুদ্ধে কংগ্রেস কোনও প্রকার সহযোগিতা দান করিবেন না। তাঁহারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বলিলেন—"to declare in unequivocal terms what their war aims are in regard to Democracy and Imperialism and the new order that is envisaged." ইহাব অল্পদিন পরেই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইল, তাহাতে ১০ই অক্টোবর তারিখে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে কেবলমাত্র তাঁহাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যই ব্যাখ্যা করিতে বলা হইল না, উপরন্তু আরও দাবী করা হইল যে "India must be declared an independent nation, and present application must be given to this status to the largest possible extent."

এই দাবীর উত্তরে ১৯৩৯ সালের ১৭ই অক্টোবর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এক বিবৃতি দান করিলেন। তাঁহাতে

তিনি ঘোষণা করিলেন,—"At the end of the war they will be very willing to enter into consultation with representatives of the several communities, parties and interests in India, and with the Indian Princes, with a view to securing their aid and co-operation in the framing of such modifications (of the Act of 1935) as may seem desirable." কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এইরূপ আশ্বাসকে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে ভারতীয় জনসাধারণ আর প্রস্তুত ছিল না ; সুতরাং ২২শে অক্টোবর তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুসরণকারী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে কোনও প্রকার সাহায্যদানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন এবং যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস দলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল, সে সকল প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

কিন্তু বিপদের সময় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করাও তখন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কিছুই তাঁহারা তখন করিলেন না। অবিলম্বে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের ভিত্তিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪০ সালের ৭ই জুলাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সহযোগিতা দানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। বড়লাট কিন্তু তাঁহাদের ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তৎপরিবর্ত্তে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কতটুকু কি করিতে পারেন, এক বিবৃতি মারফত তাহা ব্যক্ত করিয়া ৮ই আগষ্ট বড়লাট এক পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কংগ্রেসের পক্ষে তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। অতঃপর কংগ্রেস সেপ্টেম্বর মাসে

বাক্ স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সীমাবদ্ধভাবে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্-এর দৌত্য

ইহার পর অক্ষ-শক্তির অন্যতম জাপানও ইংরাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল এবং ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে জাপানীরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় অভূতপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিলেন। ইংরাজগণ সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রহ্মদেশ হইতে অতি দ্রুত বিতাড়িত হইলেন এবং যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিল। জাপানীদিগের আক্রমণের ফলে ভারতের নিরাপত্তা আর অটুট রহিল না। বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণের মুখে তখন ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণের আশু প্রয়োজন অনুভূত হইল। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য ইংলণ্ডের সমরকালীন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি প্রস্তাব লইয়া ১৯৪২ সালের ২২শে মার্চ্চ দিল্লী আগমন করিলেন; কিন্তু যে সকল প্রস্তাব তিনি নেতৃবৃন্দের সমীপে পেশ করিলেন- শেষ পর্য্যন্ত তাহা মোটেই গ্রহণযোগ্য হইল না। প্রস্তাবে যে সকল প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল—তাহা সবই ভবিষ্যতের জন্য, সঙ্গে সঙ্গেই কিছু করিবার ব্যবস্থা তাহাতে ছিল না। উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। দেশরক্ষার দায়িত্বও পুরাপুরি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হস্তেই রক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল—কংগ্রেস যাহা কোনও মতেই মানিয়া লইতে পারেন না। মহাত্মাজী ক্রীপস্ সাহেবের প্রস্তাবকে "A post-dated cheque on a crashing bank" নামে অভিহিত করিলেন। মুসলিম লীগও ক্রীপস্-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। ফলে প্রধান দুইটি দলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া ব্যর্থ-

মনোরথ সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ১৩ই এপ্রিল তারিখে ভারত ত্যাগ করিলেন।

আলোচনা ফাঁসিয়া যাওয়ার পর প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার হইল। চরম বিপদের মুখে দাঁড়াইয়াও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের ব্যাপারে কতটুকু কি করিতে পারেন—তাহা একদিকে যেমন জানিতে পারা গেল, তেমনি আর এক দিকে ইহা বুঝা গেল যে, ইংরাজগণ ভারতে উপস্থিত থাকিতে কোনও সমস্যারই সমাধান কোনও কালেই হইবে না। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক কোনও বুঝা-পড়ার যদি প্রয়োজনই হয়, তবে তাহা একমাত্র বৃটিশ-বর্জ্জিত ভারতেই হইতে পারে; যতক্ষণ তাঁহাদের সৈন্য-সামন্ত ভারতের মাটিতে অবস্থান করিবে, ততক্ষণ কোনও মিটমাটই সম্ভব হইবে না। ইংরাজগণের আদেশ-নির্দ্দেশেও ভারতের শাসন-তন্ত্র রচিত হইতে পারে না—একমাত্র, মুক্ত ভারতে স্বাধীন পরিবেশের মধ্যেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ভারতীয়গণের দ্বারা ভারতের শাসনতন্ত্র রচিত হইতে পারে; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে বৃটিশ-শক্তির অপসরণ আবশ্যক, যেমন করিয়া হউক তাঁহাদিগকে ভারতের মাটি ত্যাগ করাইতে হইবে। আমাদের সমস্যা আমরা নিজেরাই বুঝিব—তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সেখানে ইংরাজগণের মাথা গলাইবার প্রয়োজন নাই। মরিতে হয়—আমরা মরিব, বাঁচিতে যদি পারি—আমরাই বাঁচিব। ইংরাজগণ শুধু ভারতের মাটি ত্যাগ করিয়া যান।

আগষ্ট-বিপ্লব—১৯৪২



আজাদ-হিন্দ ফৌজ



নৌ-বিদ্রোহ

"সেথা বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়—
অস্ত্রে অস্ত্রে ভীম পরিচয়,
ভ্রূকুটির সহ গর্জ্জন মিশে—
রক্ত রক্ত সনে।"

আগষ্ট-বিপ্লব—১৯৪২

"ভারত-ছাড়" প্রস্তাব

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সুমতির আশায় দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়া নীরব দর্শক হিসাবে অবস্থান করা কংগ্রেসের পক্ষে আর সম্ভব হইল না। দেশের মধ্যে জনসাধারণের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের এক প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জানাইয়া দিলেন যে, বৃটিশকে ভারত ত্যাগ করিতে হইবে এবং এই দাবী মানিয়া লওয়া না হইলে কংগ্রেস মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অহিংস উপায়ে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া এক ব্যাপক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন। ইহার পর আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে বোম্বাই-এ নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ৫ই আগষ্ট "ভারত-ছাড়" পরিকল্পনাকে একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ দিয়া ওয়ার্কিং কমিটি উহা একটি প্রস্তাবাকারে গ্রহণ করিলেন এবং নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনার পর ৮ই আগষ্ট উহা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হইল। পরিকল্পনাটি ছিল মহাত্মা গান্ধীর এবং উহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করিলেন। আন্দোলনটি পরিচালিত করিবার সকল দায়িত্ব মহাত্মাজীর উপরই অর্পিত হইল। "ভারত-ছাড়" প্রস্তাবে বলা হইল—

"* * the immediate ending of British rule in India is an urgent necessity, both for the sake of India and for the success of the cause of the United Nations. The

continuation of that rule is degrading and enfeebling India and making her progressively less capable of defending herself and of contributing to the cause of world freedom."

আন্দোলন দমনের প্রাথমিক ব্যবস্থা

প্রস্তাবটি পাশ হওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই মহাত্মাজী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দসহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে গ্রেপ্তার করা হইল—নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিকে ঘোষণা করা হইল বে-আইনী প্রতিষ্ঠানরূপে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও উহার শাখাসমূহকে দুই-একদিনের মধ্যেই বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ব'লয়া ঘোষণা করিলেন। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন, অরুণা আসফ আলি, রামমনোহর লোহিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার এড়াইয়া কোনও মতে আত্মগোপন করিতে সক্ষম হইলেন। "ভারত-ছাড়" আন্দোলনটি যাহাতে পরিচালিত করা সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা এইভাবে আত্মগোপন করিলেন।

নেতাদের অধিকাংশই তো গ্রেপ্তার হইলেন—বাহিরে পড়িয়া রহিল বিশাল ভারতের বিরাট জনসমষ্টি। যে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করার আশায় সকলে চঞ্চল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাতে সহসা কোথা দিয়া যেন কি ঘটিয়া গেল। সংবাদপত্রে নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়া জনসাধারণ যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল; কিন্তু সে বিমূঢ় ভাব যখন কাটিল, তখন একটা নিপীড়িত জাতির সকল রোষ গিয়া পড়িল বৈদেশিক শাসন-শক্তির উপর। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে —অদূরদর্শী বৈদেশিক শাসকবর্গের ক্ষমতা-প্রিয়তার নিকট নতি

স্বীকারেরও একটা মাত্রা আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অশুভ প্রভাব ইতি-মধ্যেই ভারতীয়দের জীবনকে বিষাক্ত করিতে সুরু করিয়াছিল—তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে ঘটাইতেছিল বিপর্য্যয়। অথচ যুদ্ধে তাহারা তো ইচ্ছা করিয়া যোগদান করে নাই—জোর করিয়া তাহাদের ঘাড়ে যুদ্ধ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রিয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করার ধৃষ্টতাকে তাহারা সহজে মার্জনা করিতে পারিল না। ক্ষুব্ধ জনরোষ চতুর্দ্দিকে ফাটিয়া পড়িল। গ্রেপ্তারের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিল ভারতের জনসাধারণ।

নেতৃহীন স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলন

নেতা নাই—নাই নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা। জনসাধারণ কেবলমাত্র "ভারত-ছাড়" প্রস্তাবের কথাই শুনিয়াছে—কিন্তু তাহাদিগকে উহা কার্য্যকরী করিতে কি কি যে করিতে হইবে, তাহা তখনও পর্য্যন্ত তাহারা সম্যকরূপে জানিতে পারে নাই ; কিন্তু তাহাতে কিছুই আটকাইল না। নেতৃহীন এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলনে অচিরাৎ সমগ্র ভারত সজীব হইয়া উঠিল। জনসাধারণ আপনাদিগকে পরিচালিত করার ভার লইল আপনারাই। গান্ধীজী এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,সম্ভবতঃ "ভারত-ছাড়" আন্দোলনই ভারতের শেষ স্বাধীনতার আন্দোলন হইবে। পরিকল্পনাটিকে সার্থক করিতে তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল,---"করিব—না হয় মরিব।" উহাই সম্বল করিয়া জনসাধারণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। এইরূপ নেতৃহীন স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলন ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। এই গণ-অভ্যুত্থান রোধ করিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। চতুর্দ্দিকে নির্ম্মম পীড়ন সুরু হইয়া গেল। যুদ্ধ উপলক্ষে তখন হাজার হাজার ইংরাজ সৈন্য ভারতের নানা স্থানে আসিয়া অবস্থান করিতেছিল—বিদ্রোহ-দমনে

তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা হইল। সরকারী অনুমোদন ব্যতীত আন্দোলনের কোনও সংবাদ প্রকাশ করা সংবাদপত্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। অশান্তির আভাষ পাইবামাত্রই দরাজভাবে গুলি চালাইবার জন্য প্রথম হইতেই নির্দ্দেশ দেওয়া রহিল।

বাংলায় অভ্যুত্থান

বাংলা গভর্ণমেণ্ট ১০ই আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং উহার শাখাসমূহকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। চতুর্দ্দিকে যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করিতে লাগিল। কলিকাতার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ছাত্র ১২ই আগষ্ট ক্লাস ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং নানা ধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া এক সভায় গিয়া মিলিত হইলেন। সভায় তাঁহারা গান্ধীজীর "করিব—অথবা মরিব" নীতিতে দৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন করিলেন। স্থির হইল যে, নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য পরদিন ১৩ই তারিখটি যথাযোগ্যরূপে পালিত হইবে। তদনুযায়ী মূলতঃ স্কুল-কলেজের ছাত্র লইয়া গঠিত অসংখ্য শোভাযাত্রা ১৩ই তারিখে সকাল হইতেই পথে পথে বাহির হইল। বৃটিশের ভারত-ত্যাগ এবং নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিয়া সকলে ধ্বনি দিতে লাগিলেন। সকল শোভাযাত্রা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। উক্ত পার্কটি শীঘ্রই এক বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত হইল। পুলিশ এতক্ষণ কিছু বলে নাই—কিন্তু সভা আরম্ভ হইবার উপক্রম হইতেই নির্ব্বিচারে উপস্থিত ব্যক্তিগণের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। ইহার ফলে অনেকেই আহত হইলেন। যাঁহারা সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছিলেন, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া

তিনজন ছাত্র কিছু বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে পুলিশ তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিল। কলিকাতায় সংঘর্ষের ইহাই হইল সূত্রপাত।

ইহার পর যুবকগণ কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথে ট্রাম ও বাস-যাত্রীদিগকে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে এবং চালকগণকে ট্রাম-বাস না চালাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীমানী বাজারের সম্মুখে অবস্থা চরমে উঠিল। সেখানে দুই রাউণ্ড গুলিবর্ষণের ফলে বৈদ্যনাথ সেন নিহত হইলেন। চতুর্দ্দিকে পূর্ণ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল।

১৬ই তারিখে ট্রামের দড়ি কাটিয়া দিয়া স্থানে স্থানে ট্রাম চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ডাষ্টবিনগুলি রাস্তার মাঝখানে টানিয়া আনিয়া ক্ষিপ্ত জনতা রাজপথসমূহে গাড়ী চলাচল বন্ধ করিয়া দিল। কত যে চিঠি ফেলার বাক্স, ফায়ার এলার্ম এবং ইলেকট্রিক ফিউস-বাক্স ভাঙ্গিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কয়েক স্থানে পোষ্ট অফিসের উপরও আক্রমণ চালান হইল। উত্তেজিত জনগণ কোথাও কোথাও দাহ করিল চার্চ্চিল এবং এমেরি সাহেবের কুশপুত্তলিকা। পুলিশ ও মিলিটারিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। লাঠি ও গুলি সমানেই চলিতে লাগিল। স্বাভাবিক অবস্থা কোথাও বজায় রহিল না। দোকান-পাট হামেশাই বন্ধ থাকিতে লাগিল। জনসাধারণ সুযোগ পাইলেই পুলিশ ও মিলিটারির গাড়ীতে আগুন লাগাইতে লাগিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইল। ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত ভারতীয়রাও অনেক সময় রাস্তায় রেহাই পাইত না। জনসাধারণ তাহাদের টুপি ও নেকটাই কাড়িয়া লইয়া যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিত। ছাত্রগণ এবং বহু কারখানার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিতে লাগিল।

আন্দোলনের সংবাদ এবং কার্য্যক্রমের নির্দ্দেশ দিবার জন্য প্রথমে বোম্বাই শহরে এবং পরে কলিকাতায় দুইটি গুপ্ত বেতার-কেন্দ্রও স্থাপিত

হয়। বহু প্রচারপত্রও বিলি করা হয় এবং স্থানে স্থানে দেওয়ালে মারিয়া দেওয়া হয়। বাংলা গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন যে, ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে এই আন্দোলন উপলক্ষে নিহতের সংখ্যা ২০ এবং আহতের সংখ্যা ১৫২। হাসপাতালে প্রাপ্ত সংখ্যা অবশ্য ইহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। কলিকাতায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা হাজার চারেক বলিয়া অনুমান হয়।

মেদিনীপুরের ঘটনা

কিন্তু মেদিনীপুরের আন্দোলন কলিকাতার আন্দোলনকেও ছাড়াইয়া গেল। ইহা এতই প্রবল ও কার্য্যকরী হইল যে সাময়িকভাবে অন্ততঃ ইহা মেদিনীপুরের অনেকাংশে বৃটিশ-শাসনের অবসান ঘটাইয়া নিজেদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিল। গভর্ণমেণ্টও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, মেদিনীপুরের বিদ্রোহে যথেষ্ট সতর্কতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল— পরিকল্পনাও ছিল অনেকটা ত্রুটহীন। বিদ্রোহীদিগের ছিল নিজস্ব গোয়েন্দা-বিভাগ এবং সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবার সময় দলের আহত ব্যক্তি-গণকে সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারী সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত।

বাংলা দেশের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অনেকগুলি জিলায় বাংলা গভর্ণমেণ্ট "পোড়ামাটি" নীতির প্রয়োগ করিতেছিলেন। পাছে জাপানী আক্রমণ হয় এবং জাপানীরা সুবিধা লাভ করে, এই আশঙ্কায় এই সকল জিলা হইতে বহু নৌকা ও বাইসাইকেল অপসারিত করা হয় এবং হাজার হাজার মণ ধান ঐ সকল এলাকা হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। মেদিনীপুরেও এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল এবং কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের অবস্থা উঠিতেছিল চরমে। বিশেষ করিয়া তমলুক এবং কাঁথি মহকুমায়

লোকের দুর্দ্দশার আর অন্ত ছিল না। সেখানে লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নূতন করিয়া 'সেস' ধার্য্য করা হয়—বিস্তীর্ণ এলাকা সামরিক প্রয়োজনে দখল করিয়া হাজার হাজার লোককে করা হয় গৃহহীন। জিনিষপত্রের দাম হু হু করিয়া বাড়িয়া যাওয়ায় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাইয়া তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয় অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইতেছিল, তাহার উপর আবার অনেককে বাধ্য হইয়া "War Bond" ক্রয় করিয়া গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-তহবিলে অর্থ সাহায্যও করিতে হইতেছিল। অধিকাংশ স্থলে মাত্র আট আনা হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়া গভর্ণমেণ্ট বহু বাইসাইকেল প্রভৃতি হস্তগত করেন। আসন্ন দুর্ভিক্ষের ছায়া মেদিনীপুরের চারিদিকে বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছিল। লোকের অসুবিধা ও অভিযোগের প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া নির্ব্বিকার বিদেশী শাসকরা তাঁহাদের ইচ্ছামত কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে মেদিনীপুর—মেদিনীপুর।

নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হওয়ার পর মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে বহু প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হইল। অবিলম্বে নেতাদের মুক্তি এবং গভর্ণমেণ্টের পীড়ন-নীতির অবসান দাবী করিয়া প্রায়ই বড় বড় শোভাযাত্রা মেদিনীপুরের আদালতগৃহ, সরকারী ভবনসমূহ ও থানার সম্মুখে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সকল শোভাযাত্রীদিগকে বলপ্রয়োগে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হইত। ইহাতে সকলেই এত উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য সকলে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নেতারাও আর তাহাদের দাবীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তখন বৃটিশ সরকারের উচ্ছেদের জন্য বিদ্রোহ ঘোষিত হইল এবং থানা ও সরকারী ভবনসমূহ দখল করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে জনগণকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। মহিষাদলে পোষাক পরিহিত প্রায় ২০,০০০ স্বেচ্ছাসেবকের এক বিরাট শোভাযাত্রা

২৯শে আগষ্ট তারিখে থানার সম্মুখস্থ এক প্রান্তরে গিয়া সমবেত হইল এবং সেখানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সম্মুখেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ক্ষিপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তখন সভার চারি জন প্রধান বক্তাকে গ্রেপ্তারের জন্য আদেশ দিলেন। পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া জনগণের নিকট হইতে বাধা পাইল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন জনতার উপর লাঠি-চার্জ্জের হুকুম দিলেন—কিন্তু কনষ্টেবলগণ সে আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল না। অগত্যা হতবুদ্ধি ম্যাজিষ্ট্রেট দলবল লইয়া প্রস্থান করিয়া কোনও মতে মান বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন।

মেদিনীপুরে চাউলের অভাব থাকা সত্ত্বেও "পোড়ামাটি" নীতি সফল করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন চাউল-কলের সহিত ব্যবস্থা করিয়া গোপনে সেখান হইতে বাহিরে চাউল চালান করাইতেছিলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর দানীপুর এবং তাহার আশ-পাশের অঞ্চলের লোকেরা এই বিষয় জানিতে পারিয়া চাউল রপ্তানী বন্ধ করাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল এবং প্রায় হাজার দুই লোক চাউল-কলের নিকট সমবেত হইল। তাহারা জানাইল যে, ধান্য চালান বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি না দিলে তাহারা স্থানত্যাগ করিবে না। মিল-মালিকগণকে এই রপ্তানীকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য একজন পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র কনষ্টেবলগণ তথায় হাজির ছিল, তাহারা তখন সমবেত জনগণের উপর গুলিবর্ষণ সুরু করিল। ইহার ফলে তিনজন নিহত এবং অনেকে আহত হইল। নিরস্ত্র জনতা গুলির মুখে তখনকার মত স্থানত্যাগ করিল এবং পরবর্ত্তী নির্দ্দেশ লাভের জন্য দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করিল দূরবর্ত্তী কংগ্রেস কার্য্যালয়ে। সংবাদ পাইয়া প্রায় জন পঞ্চাশ কংগ্রেসকর্ম্মী সহ হাজার ছয়েক গ্রাম্য লোকের এক বিরাট জনতা যাত্রা করিল ঘটনাস্থল

অভিমুখে। আরও সশস্ত্র পুলিশও ইতিমধ্যেই সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কংগ্রেসকর্ম্মিগণ সেখানে গিয়া ধান্য চালান বন্ধ করিবার দাবী জানাইলেন এবং পুলিশের গুলিবর্ষণে যে তিনজন নিহত হইয়াছিল, তাহাদের মৃতদেহ প্রার্থনা ক রলেন। বহু বাদানুবাদের পর পুলিশ মৃতদেহগুলি তমলুকে শব-ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার পর অর্পণ করিতে সম্মত হইল। শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ কিন্তু আপনাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া মৃতদেহগুলি নদীতে নিক্ষেপ করে। গ্রামবাসিগণ কে নও মতে উহা জানিতে পারিয়া নদী হইতে ঐগুলি উদ্ধার করিয়া এক শোকযাত্রার ব্যবস্থা করে। পুলিশ তখন পুনরায় বলপ্রয়োগে মৃতদেহগুলি ছিনাইয়া আনে এবং একটিমাত্র চিতায় সেগুলির সৎকার করে।

ইহার পরদিন এক বিরাট সশস্ত্র বাহিনী লইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত অঞ্চলের কয়েকখানি ম গিয়া হানা দিলেন এবং প্রায় দুইশত লোককে গ্রেপ্তার করিলেন। তাহাদিগকে আনিয়া কোনও খাদ্য ও পানীয় না দিয়া গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে সারাদিন বসাইয়া রাখা হয়। শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে ১৩ জনকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হয় এবং এই ১৩ জনের দেড় হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের হয় কারাদণ্ড। জনসাধারণ এই ঘটনা ভুলিয়া যায় নাই। তাহারা ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার পর মিল-মালিকগণকে ঘেরাও করে এবং তাহারা জনসাধারণের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। ধান্য চালান দেওয়ার জন্য তাহারা মাপ চায় এবং ভবিষ্যতে আর কখনও ঐরূপ না করিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। গণপঞ্চায়েৎ তাহাদের ২০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড করেন এবং উহা হইতে ১৫০০৲ টাকা নিহত ব্যক্তিগণের পরিবারবর্গকে প্রদান করা হয়।

তমলুক মহকুমা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক গুপ্ত বৈঠকে সমবেত হইলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে থানা,

আদালত-গৃহ প্রভৃতি সরকারী ভবনসমূহ দখল করিয়া তাহার উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক লইয়া গঠিত বিদ্যুৎবাহিনী ইহার পরদিনই কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিল। বড় বড় গাছ কাটিয়া রাস্তার উপর ফেলিয়া, সেতু ধ্বংস করিয়া এবং টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার কাটিয়া দিয়া, পোষ্টগুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া তমলুকের সহিত বহির্জগতের যোগাযোগ রহিত করা হইল। লাঠি চার্জ ও গুলিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া দিন দু'য়েকের মধ্যেই তিন-চারিটি থানা অধিকার করিয়া সেগুলির উপর উত্তোলিত করা হইল জাতীয় পতাকা। পাঁচটি বড় বড় শোভাযাত্রা ২৯শে তারিখে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন দিক হইতে মহকুমা-শহর তমলুকের দিকে অগ্রসর হইল। জনতা থানার নিকটবর্ত্তী হইলে পুলিশ তাহাদের উপর নির্দ্দয়ভাবে লাঠি চালাইতে থাকিলেও সঙ্কল্পবদ্ধ জনতা তাহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন শোভা-যাত্রীদিগের উপর পুলিশ ও মিলিটারি সুরু করিল গুলিবর্ষণ। ইহাতে কিছু লোক চলিয়া গেল বটে, কিন্তু যাঁহারা শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতেছিলেন, তাঁহারা পিছু না হটিয়া অগ্রসর হইতেই লাগিলেন। গুলিতে বহুলোক হতাহত হইল। রামচন্দ্র বেরাকে সাংঘাতিকভাবে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হইল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি থানায় পড়িয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে যখন তাঁহার সামান্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি টলিতে টলিতে রক্তাক্ত কলেবরে কোনও মতে থানার বাহিরের দিকের দরজার নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেলেন। সেখান হইতেই তিনি তাঁহার অপর সঙ্গীদিগকে ডাকিবার ভঙ্গীতে চীৎকার করিয়া বলিলেন--"এই যে আমি থানায় এসেছি—থানা দখল হয়েছে।" কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পড়িয়া যান এবং অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মাতঙ্গিনী হাজরা

এই সকল শোভাযাত্রার একটিতে ছিলেন ৭৩ বৎসর বয়স্কা মাতঙ্গিনী হাজরা। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁহার অভিনব আত্ম-বিসর্জ্জন এক অপূর্ব্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল। তমলুক মহকুমা-শহরের থানার দিকে উত্তর দিক হইতে যে শোভাযাত্রাটি অগ্রসর হইতেছিল—তিনি ছিলেন তাহারই মধ্যে। সৈন্যগণের প্রবল গুলিবর্ষণের মুখে শোভাযাত্রিগণ সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। সেই সময় লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নামক জনৈক বালক অগ্রসর হইয়া একজন সৈন্যের নিকট হইতে তাহার রাইফেল কাড়িয়া লইলে নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে প্রহার করা হয়। মাতঙ্গিনী হাজরা তখন ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা হস্তে লইয়া সৈন্যদলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পান। তাঁহার অটুট দৃঢ়তা ও সাহস দর্শনে সৈন্যগণ কিছুক্ষণের জন্য যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে এবং পিছু হটিয়া যায়, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার প্রতি তাহারা গুলিবর্ষণ করে। যে হস্তে মাতঙ্গিনী জাতীয় পতাকাটি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা গুলির দ্বারা সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। মাতঙ্গিনী তথাপি পতাকাটি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিয়া সৈন্যগণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যাহাতে ভারতীয় হইয়া তাহারা ভারতীয়গণের উপর গুলিবর্ষণ না করে এবং চাকুরি ত্যাগ করিয়া তাহারাও স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদান করে। ইতিমধ্যে নিক্ষিপ্ত আর একটি গুলি আসিয়া তাঁহার ললাট ভেদ করিয়া যায় এবং ভূপতিত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরও দেখা যায় যে পতাকাটি তিনি দৃঢ়হস্তে পূর্ব্বেরই মত ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার রক্তে চারিদিক প্লাবিত হইতে লাগিল। একজন সৈন্য ছুটিয়া গিয়া লাথি মারিয়া পতাকাটি ফেলিয়া দিল। দেখা গেল যে, মাতঙ্গিনীর প্রাণে-

পাশে লক্ষ্মীনারায়ণ দাস প্রভৃতি আরও কয়েকজনের মৃতদেহও পড়িয়া আছে। ইহার পর সৈন্যগণ সমগ্র স্থানটি পাহারা দিয়া রাখে এবং আহতগণের মধ্যে যাহারা যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছিল, তাহাদেরও শুশ্রূষা করিতে কাহাকেও নিকটে যাইতে দেয় না।

দুর্দ্ধর্ষ জনসাধারণ কিন্তু কিছুতেই শায়েস্তা হইল না। সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহারা কার্য্য চালাইতে লাগিল। মেদিনীপুরে আন্দোলনটা প্রবল হইল কাঁথি এবং তমলুক মহকুমাতেই। থানা, পুলিশ-ফাঁড়ি, ডাকঘর, ইউনিয়ন-বোর্ড অফিস, মদের দোকান প্রভৃতি জনসাধারণ আগুন দিয়া পুড়াইয়া দিল, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইন ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল, কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে লোকে গ্রেপ্তারও করিল। এই সময় ১৬ই অক্টোবর মেদিনীপুরের উপর দিয়া যে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইয়া যায় এবং তাহার সহিত যে বন্যার প্লাবন ঘটে, তাহাতেও— প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ এবং সরকারী অত্যাচারের মধ্যেও মেদিনীপুরবাসীদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অবস্থা শেষ পর্য্যন্ত এমন স্তরে গিয়া পৌছাইল যে, কোন কোন অঞ্চলে বৃটিশ-শাসন-কর্ত্তৃত্ব একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৯৪২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হইল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। উক্ত সরকারের জন্য একজন সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য একজন মন্ত্রীও নিযুক্ত হইলেন। এই সরকারের অধীনে বিভিন্ন থানা-এলাকায় আরও কতকগুলি অধীন শাসন-কেন্দ্র গঠিত হয়। পূর্ব্বে গঠিত বিদ্যুৎবাহিনী এই সরকারের নিয়মিত সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়। বিচারকার্য্য, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ই সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতে থাকে। আর্ত্ত ও দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধপত্র বিতরণ করিয়া জাতীয় সরকার জনগণের প্রকৃত সেবা করেন।

এই আন্দোলন দমনকল্পে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও ব্যাপকভাবে দমননীতি চালাইতে থাকেন। নানা স্থানে সৈন্যগণের ছাউনি পড়ে। পুলিশ ও মিলিটারির রাজত্ব সুরু হইয়া যায়। গুলি চালনা যেন সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় এবং বিভিন্ন স্থানে যে কত লোক হতাহত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। গুণ্ডাগণকে উৎসাহ দিয়া সৈন্যগণ তাহাদের সহিত একযোগে লুটপাট চালায়, লোকের ঘর-বাড়ীতে আগুন দিয়া পুড়াইয়া দেয়। এই-ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকাব সম্পত্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। পাইকারি জরিমানা আদায় করা হয় বহু স্থানে। প্রয়োজন হইলে বিমান হইতেও পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালান হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই এই পীড়ন হইতে রেহাই পায় নাই। সৈন্যগণ বহু স্থানে বহু নারীকে ধর্ষণ করে। মেদিনী-পুরে অনুষ্ঠিত নারকীয় অত্যাচার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মুখে চূণকালি লেপিয়া দিল।

আসামের বিপ্লব

আগষ্ট-বিপ্লব ভারতের সকল প্রদেশেই সুরু হয় এবং উহার ঢেউ গিয়া আসামেও পৌছায়। আসামের সকল কংগ্রেস নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হয়। শোভাযাত্রা প্রভৃতির উপর পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালাইতে থাকে। দারং জেলার অন্তর্গত গোপুর থানা-ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করিবার উদ্দেশ্যে ২০শে সেপ্টেম্বর একদল লোক অগ্রসর হইলে পুলিশ তাহাদের উপর গুলি চালায়। ইহার ফলে বহু লোক আহত এবং কনক-লতা নাম্নী জনৈকা মহিলা নিহত হন। কনকলতার হস্ত হইতে জাতীয় পতাকাটি লইয়া অপর একজন থানার দিকে অগ্রসর হইলে পুলিশ তাঁহাকেও গুলি করে। প্রবল গুলিবর্ষণকে অগ্রাহ্য করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কয়েকজন গিয়া থানার উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হন।

উক্ত দিবসেই ঢেকাইজুলি থানা অভিমুখেও একদল শোভাযাত্রী অগ্রসর হন। ফুলেশ্বরী নাম্নী একটি অল্প বয়স্কা বালিকা ও আরও জন কুড়ি লোক সেখানে গুলিতে প্রাণ হারায়। একজন যুবক সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসব হইয়া থানার উপর জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দেন -কিন্তু পুলিশের গুলিতে তিনিও সেইখানেই প্রাণ হারান।

আসাম প্রদেশেব চতুর্দ্দিকেই পুলিশের ও মিলিটারির অত্যাচার চলিতে থাকে—বহু নর-নারী গুলিবিদ্ধ হইয়া নিহত হয়। এই সকল অত্যাচাবেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য তেজপুর শহরের ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। পুলিশ ও সৈন্যগণ উক্ত সভা আক্রমণ করিয়া যথেচ্ছভাবে লাঠি ও গুলি চালায়; ইহার ফলে বহু লোক আহত হয়। শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও আসাম প্রদেশের অধিবাসিগণ আগষ্ট-বিপ্লবে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। আসামেও রেলের লাইন তুলিযা ফেলা হয়, সরকারী ভবনসমূহ আক্রমণ ও ধ্বংস করা হয় এবং সৈন্য-নিবাস ও বিমান-ঘাঁটি প্রভৃতি নষ্ট করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টায বিঘ্ন স্বষ্টির চেষ্টা করা হয়।

বোম্বাই প্রদেশের আন্দোলন

বোম্বাই প্রদেশের সাতরা জেলায় আন্দোলন বেশ ব্যাপক আকার গ্রহণ করে। উক্ত অঞ্চলে গ্রাম্য এলাকাগুলিতে কাছারি হইতে শাসন-কর্তৃত্ব পরিচালিত হয়। তথাকার জনসাধারণ অহিংস থাকিয়া শান্তিপূর্ণ উপাযে কাছারিগুলিতে সত্যাগ্রহ পরিচালিত করিতে সঙ্কল্প করেন। তদনুযায়ী ২৪শে আগষ্ট তারিখে বহু লোক করাদগ্রামের কাছারিতে গিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলে উহা বন্ধ হইয়া যায় এবং সত্যাগ্রহীরা তথায় জাতীয় পতাকা উড্ডীন করে। সরকারী কর্ম্মচারিগণকে অনুরোধ করা

হয় যে তাঁহারা যেন আপনাদিগকে জনগণের সেবক বলিয়া মনে করেন। নেতৃস্থানীয় একজন সত্যাগ্রহীকে সেখানে গ্রেপ্তার করা হয়। যাহা হউক, এইভাবে আরও কয়েকটি কাছারিতেও সত্যাগ্রহের কাজ নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়।

কিন্তু ভাদুজ নামক গ্রামের কাছারিতে একদল লোক সত্যাগ্রহ করিতে যাইলে কর্ত্তৃপক্ষ চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। সহস্রাধিক লোক লইয়া গঠিত শোভাযাত্রা যখন কাছারির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন পুলিশ তাহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুলির আঘাত পাইয়া সত্যাগ্রহীদলের নেতা পতাকা হস্তে শেষ শয্যা গ্রহণ করিলেন এবং আরও কয়েকজন হতাহত হইল। নিহতদের মধ্যে দুইটি বালকও ছিল। পুলিশ মৃতদেহগুলিতে পদাঘাত করে।

ইহার পর পুলিশ ব্যাপকভাবে উক্ত অঞ্চলে তল্লাসী চালায়, বহুলোককে গ্রেপ্তার করে এবং লোকের উপর অত্যাচার চালাইতে থাকে; কিন্তু তথাপি ইসলামপুর গ্রামের কাছারিতে পুনরায় সত্যাগ্রহ করিবার পরিকল্পনা করা হয়। সেখানে সত্যাগ্রহ করিতে গেলেও পুলিশ গুলি চালায় এবং বহু লোক হতাহত হয়। দলের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কয়েকজন নেতা আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া সাতারার আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন। ১৯৪২ সালের শেষ দিক হইতে সাতারার আন্দোলন অন্য পথ ধরিল। গ্রাম্য কাছারি, রেলষ্টেশন, ডাক-বাংলো ইত্যাদিতে আগুন ধরাইয়া সেগুলি পোড়ান হইতে লাগিল এবং সমগ্র সাতারা জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করা হইল। কয়েক স্থানে মালগাড়ীকে লাইনচ্যুতও করা হইল। এইরূপ কার্য্যকলাপ সাতারা জেলায় ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত চলে।

পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আন্দোলন-

পরিচালিত করিবার জন্য শত শত কর্ম্মীকে তখন আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। এই সকল আত্মগোপনকারী কর্ম্মীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট গুণ্ডা এবং দুষ্টপ্রকৃতির বহু লোককে চর নিযুক্ত করেন। বাবুরাও দেশমুখ নামক কুখ্যাত একজন গুণ্ডা এই সকল চরের অন্যতম ছিল। একদিন একজন কংগ্রেস কর্ম্মীর অন্বেষণে একদল পুলিশসহ সে তাঁহার বাটীতে যায় এবং উক্ত কংগ্রেস কর্ম্মীর পত্নীকে কয়েকটি অশ্লীল কথা বলিয়া অপমানিত করে। এইভাবে গুণ্ডা গুপ্তচরদের উৎপাতে সেখানকার ভদ্র অধিবাসীদের বসবাস দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কর্ম্মিগণ তখন এই গুণ্ডা-উৎপাত দমনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। উপরোক্ত ঘটনার দিনকয়েক পরেই একদিন বাবুরাও দেশমুখের মৃতদেহ পথের ধারে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহার হাত ও পা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

সাতারা জেলার নানা স্থানে বহু টাকা পাইবারি জরিমানা ধার্য্য করা হয় এবং তাহা আদায় করা হইতে থাকে পাশবিক পীড়নের দ্বারা। স্ত্রীলোকগণকে বেত্রাঘাত, জনগণকে গুলি করিয়া হত্যা করা সাতারা জেলায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এই অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্যেও সাতারার অধিবাসিগণ অটুট সঙ্কল্প লইয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। এই সরকার পরম যোগ্যতার সহিত কিছু দিন সাতারার শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত করেন।

বিহারের বিদ্রোহ

বিহারেও আগষ্ট-আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকে। ১১ই আগষ্ট সরকারী ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করিবার জন্য পাটনার

ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া রাস্তায় সমবেত হয় এবং পাটনা হাইকোর্টের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা হাইকোর্টের উপর হইতে বৃটিশ পতাকা নামাইয়া জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিবার দাবী জানায়। প্রধান বিচারপতি অপ্রীতিকর অবস্থা এড়াইবার জন্য তাঁহার এক কর্মচারীকে দিয়া ছাত্রদের অনুরোধ রক্ষা করেন। অতঃপর ছাত্রগণ বিহার প্রদেশের আইন-পরিষদ ভবনে পতাকা উড়াইবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়। একদল ছাত্র যখন জাতীয় পতাকা লইয়া পরিষদ-ভবনের উপর উঠিতে আরম্ভ করে, তখন পুলিশ গুলি চালায় এবং তাহার ফলে সাত জন নিহত হন।

ইহার পর জনগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং নানাস্থানে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। ১২ই আগষ্ট হাজার হাজার লোকের এক বিরাট বিক্ষুব্ধ জনতা পাটনার বিভিন্ন স্থানের টেলিগ্রাফ-টেলিফোন সংযোগ ধ্বংস করিয়া ফেলে। বাঁকিপুর জেলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই জনতা বৃটিশ-বিরোধী নানাপ্রকার ধ্বনি দিতে থাকে এবং পুলিশের সহিত তাহাদের কয়েক ঘণ্টাব্যাপী এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। নানাস্থানে ডাকঘর প্রভৃতি সরকারী ভবন আগুন ধরাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়। পুলিশ ও মিলিটারির গুলিবর্ষণে বিহার প্রদেশে বহুলোকের মৃত্যু ঘটে। আন্দোলন তথাপি চলিতেই থাকে। বহুস্থানে বৃটিশ-শাসন ভাঙ্গিয়া পড়ায় জনগণই আপনাদের গণরাজ প্রতিষ্ঠিত করে।

পাটনা শহরের কর্তৃত্ব সৈন্যগণের হস্তেই তুলিয়া দেওয়া হয়। পরিচয়-পত্র ব্যতিরেকে সান্ধ্য-আইন বলবৎ থাকার প্রাক্কালে লোক চলাচল নিষিদ্ধ হয়। শহরের বহু সম্মানার্হ ব্যক্তিকেও বন্দীশিবিরে আটক করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়, অথবা প্রয়োজনমত তাঁহাদিগকে বাধ্য করা হয় রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে। ঘটনার কোনও প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ না করিয়া মাত্র

সরকারী বিবৃতি মুদ্রিত করিবার নির্দ্দেশ দেওয়ার ফলে সংবাদপত্রগুলি সরকারী বিবরণ ছাপিতেও অস্বীকার করে।

বিহার প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও উৎপীড়নের দ্বারা বহু টাকা পাইকারি জরিমানা আদায় করা হয়। বহুলোককে অত্যাচারের ভয়ে স্থানে স্থানে ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেও হয়। নারীগণও সৈন্যদের হস্তে নিগৃহীতা ও লাঞ্ছিতা হন। আগষ্ট-আন্দোলন উপলক্ষে বিহাব প্রদেশে ছয় শতাধিক লোক গুলিতে প্রাণ হাবায়। জনসাধারণ তৎসত্ত্বেও সরকারেব নিকট নতি স্বীকার করে নাই।

যুক্তপ্রদেশে এই আন্দোলন দমনকল্পে ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া লুটপাট চালান হয়, মহিলাদিগকে পথে ছাড়িযা দেওয়া হয় বিবস্ত্র কবিয়া। বালিয়া ও বাইরিয়ায় গুলি চালাইয়া পুলিশ যথাক্রমে ৪০ ও ২০ জনকে নিহত করে।

আগষ্ট-বিপ্লব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও তীব্র আকার ধারণ করে এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা তাহা দমন করিতে চেষ্টা করেন। বিয়াল্লিশের বিপ্লবের সম্যক ক্ষয়-ক্ষতির ইতিহাস আজিও রচিত হয় নাই। সংবাদ প্রকাশেব পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ইহার বিস্তৃতি ও প্রচণ্ডতা রোধেব জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন অপূর্ব্ব গণ-অভ্যুত্থান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বৃটেনের যুদ্ধকালীন প্রধান-মন্ত্রী মি: চার্চ্চিল ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মহাসভাকে তৎকালে আশ্বাস দিযা সদম্ভে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ উপলক্ষে বহুসংখ্যক ইংরাজ সৈন্য ভারতে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং কংগ্রেসনেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার এবং আগষ্ট-আন্দোলনের জন্য ইংরাজজাতির চিন্তিত হইবার কোনও কারণ নাই; অর্থাৎ কিনা প্রয়োজন হইলে ঐ বহুসংখ্যক সৈন্য অশান্ত ভারতবাসীদিগকে শায়েস্তা করিতে পারিবে। যাহা হউক, বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিতেই লাগিল—আর ভারতে

চলিতে লাগিল শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা। এদিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা সুভাষচন্দ্র গোপনে ভারত ত্যাগ করিয়া গিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আজাদ-হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সর্ব্বাধিনায়কত্বে আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে আঘাত হানিতে থাকে। সে এক গৌরবময় ইতিহাস।

আজাদ-হিন্দ ফৌজ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান-এর যোগদান

অক্ষ-শক্তির অন্যতম অংশীদার জাপান যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদান করিল, মহাযুদ্ধ তখন বিস্তৃত হইয়া পড়িল পৃথিবীর অন্যতম সুদূর প্রান্তে। ১৯৪১ সালের শেষ দিকে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিল ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে। সুদূর প্রাচ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার স্বার্থ ও প্রভাব ছিল যথেষ্ট এবং তাহার ফলে জাপানের আশানুরূপ স্বার্থ ও প্রভুত্ব বিস্তারে বিঘ্ন ঘটিতেছিল। তাই ইউরোপের যুদ্ধ যখন এক সঙ্কটপূর্ণ অধ্যায়ে উপনীত হইয়াছে এবং মিত্রশক্তি যখন সেখানে অস্তিত্ব রক্ষায় বিপন্ন, তখন সেই সুযোগে জাপানও সুদূর প্রাচ্যে তাহার কাজ গুছাইয়া লইতে চাহিল। সিঙ্গাপুরে সুদৃঢ় ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়া ইংলণ্ড ভাবিয়াছিল যে, প্রাচ্যে তাহার স্বার্থ ও অধিকার সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ও সুরক্ষিত হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের যে সহজে পতন ঘটানো যাইবে, একথা ইংলণ্ডের সমরবিদ্গণ বিশ্বাস করেন নাই; কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরই তাঁহাদের ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হইল। জাপানীরা যুদ্ধ সুরু করিয়াই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় অগ্রসর হইতে লাগিল দ্রুতগতিতে এবং একের পর আর এক

করিয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহের পতন ঘটিতে লাগিল। এ অঞ্চলের যুদ্ধের প্রথম দিককার ইতিহাস ইংরাজগণের অনবরত পশ্চাদপসরণের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নহে। 'প্রিন্স-অফ-ওয়েলস্' এবং 'রিপালস্' নামক ইংলণ্ডের দুইটি সুবৃহৎ রণতরী জাপানী বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত বোমায় বিদীর্ণ হইয়া ১৯৪১ সালের ১০ই ডিসেম্বর নিমজ্জিত হইল। এখানে-সেখানে কয়েক স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি লড়াইয়ের পর ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজ সেনা-নায়ক জেনারল এ-ই পার্সিভ্যাল সিঙ্গাপুরে বিনাসর্ত্তে জাপ-সেনাপতি জেনারল তোমোয়ুকি ইয়ামাসিটার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট-এর প্রথম ব্যাটালিয়ানের কিছু সংখ্যক সৈন্য লেঃ কর্ণেল এল-ভি ফিজপ্যাট্রিক সহ জিত্রা রণাঙ্গনে জাপানী আক্রমণের মুখে তাহাদের মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উক্ত বিচ্ছিন্ন দলে মোহন সিং এবং হাবিলদার শরণ সিং প্রভৃতিও ছিলেন। মেজর ফুজিয়ারার নিকট উক্ত দলটি আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রথম পরিকল্পনা

বৃটিশের আন্তর্জাতিক সঙ্কট-মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে চরম আঘাত হানিয়া ভারতের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চিন্তা এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যে অবস্থিত বহু ভারতীয় নেতার মনেই উদিত হইয়াছিল এবং জাপানীদের অগ্রগতির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যুদ্ধ-বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণকে লইয়া ভারতকে মুক্ত করিবার জন্য একটি আজাদ-হিন্দ ফৌজ বাহিনী গঠনের সম্ভাব্যতার বিষয়ও তাঁহারা চিন্তা করিতেছিলেন। জাপানীরা থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ করিলে এই উদ্দেশ্যে স্বামী সত্যানন্দ পুরী, জ্ঞানী প্রীতম সিং প্রভৃতি ব্যাঙ্ককের নেতৃস্থানীয় ভারতীয়গণ এ সম্বন্ধে

জাপানীদের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন। জাপ-অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে যাহাতে ভারতীয়গণের সম্মান, নিরাপত্তা ইত্যাদি বজায় থাকে, সে জন্য ভারতীয়গণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার মানসে ইহার পর জ্ঞানী প্রীতম সিং জাপানী অগ্রবর্ত্তী সৈন্যবাহিনীর সহিত অবস্থান করিতে থাকেন। টোকিওতে রাসবিহারী বসুও এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে চেষ্টিত হন।

মোহন সিংকে পাইয়া জাপ-কর্তৃপক্ষ উৎফুল্ল হইলেন এবং তাঁহারা মোহন সিংকে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধে জাপানীদের সহিত পাশাপাশি সংগ্রাম চালাইতে অনুরোধ করিলেন। স্বাধীনভাবে এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যই কেবলমাত্র এইরূপ করা সম্ভব হইলে মোহন সিং ইহাতে সম্মত হইলেন। যে সকল ভারতীয় সৈন্য বৃটিশ-কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া এখানে-ওখানে বনে-জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পুনরায় একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এ সম্বন্ধে প্রাথমিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন। এইভাবে মালয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী কুয়ালালামপুর জাপানীদের দ্বারা অধিকৃত হইবার পূর্ব্বেই তিনি প্রায় ১০,০০০ ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন এবং ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি কুয়ালালামপুরে একটি অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ ফৌজ বাহিনী সংগঠিত করিলেন।

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে এবং সিঙ্গাপুর রণাঙ্গনের বিভিন্ন স্থান হইতে ভারতীয় সৈন্য ও অফিসারদিগকে বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য ও অফিসারগণ হইতে পৃথক্ করিয়া ১৭ই ফেব্রুয়ারি ফ্যারার পার্কে সকলকে সমবেত করা হয়। এই সকল ভারতীয় সৈন্য ও অফিসারের সংখ্যা প্রায় ৪৫,০০০ হাজার আন্দাজ ছিল। মালয় সমর-বিভাগের একজন ইংরাজ ষ্টাফ-অফিসার কর্ণেল হাণ্ট সেখানে আনুষ্ঠানিক-ভাবে উক্ত ভারতীয় সৈন্য ও অফিসারগণকে জাপ সামরিক-কর্ত্তৃপক্ষের

প্রতিনিধি মেজর ফুজিওয়ারার হস্তে অর্পণ করেন এবং মেজর ফুজিওয়ারা আবার তাহাদিগকে অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হস্তে অর্পণ করেন। অতঃপর উক্ত পার্ক-এ এক সভা হয়। তাহাতে মোহন সিং তখনকার আন্তর্জাতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে জানান যে, ইংরাজকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার সুবর্ণ সুযোগ সমুপস্থিত; সুতরাং সকল ভারতবাসীরই ইংরাজকে বিতাড়িত করার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। ভারতবাসীদের চেষ্টা-যত্ন এবং জাপানীদের সহায়তায় যে এরূপ একটি কঠিন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাসও তিনি ব্যক্ত করিলেন। জ্ঞানী প্রীতম সিংও এই বিষয়ে তাঁহার সর্ব্ববিধ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সেদিনের সভা শেষ হইল।

ইহার পর ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর অধীনে এই সকল সৈন্য ও অফিসারগণকে বিভিন্ন ক্যাম্প-এ প্রেরণ করা হয়। সিঙ্গাপুরে প্রায় ৬০,০০০ হাজার এবং সমগ্র মালয়ে আরও প্রায় ১৫,০০০ হাজার ভারতীয় সৈন্য ও অফিসার এই সময় ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর অধীনে থাকে।

মার্চ্চের প্রথম দিকেই মালয়ের নেতৃস্থানীয় ভারতীয় অধিবাসী ও সামরিক কর্ত্তাগণের মধ্যে সিঙ্গাপুরে এক বৈঠক হয় এবং উহাতে জাপানী-দের সাহায্য-প্রস্তাব এবং টোকিওতে একটি সম্মেলনে যোগদানের জন্য রাসবিহারী বসুর আমন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। স্থির হয় যে, একটি প্রতিনিধিদল টোকিও-সম্মেলনে যোগদান করিতে যাইবে। ইহার পর মার্চ্চের শেষভাগে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে টোকিওতে জাপান, চীন, থাইল্যাণ্ড, মালয়, ব্রহ্ম ইত্যাদি স্থানের ভারতীয় অধিবাসীদের প্রতিনিধি-দের এক সম্মেলন হইল। ২৮শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত এই সম্মেলন চলে। ইহাতে স্থির হয় যে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনকল্পে 'ভারতীয় স্বাধীনতা

সঙ্ঘ' (Indian Independence League) নামে একটি সঙ্ঘ গঠিত হইবে। এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয় অধিবাসিগণের একটি পূর্ণ প্রতিনিধি-সম্মেলন জুন মাসে ব্যাঙ্কক-এ অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হয়।

রাসবিহারী বসুর প্রথম জীবনের কার্য্যকলাপ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ছদ্ম-নামে ১৯১৫ সালে তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া জাপানে গমন করেন। চীন দেশ হইতে তিনি একবার ভারতবর্ষে অস্ত্র-শস্ত্র প্রেরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষ তাহা পূর্ব্বেই জানিতে পারায় সে সমুদয় আর ভারতবর্ষে পৌঁছিতে পারে নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহার পর জাপ-গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন যে, রাসবিহারীকে যেন জাপ-সাম্রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। ইহার ফলে জাপ-গভর্ণমেণ্টের আদেশে তিনি পাঁচ দিনের মধ্যে সাংহাই ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং প্রায় দশ বৎসর কাল তিনি আত্মগোপন করিয়া থাকেন। ইহার পর তাঁহাকে পুনরায় দেখা যায় জাপানে আত্মপ্রকাশ করিতে। জনৈক জাপানী দেশ-প্রেমিকের নিকট হইতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেন। জাপানে রাসবিহারী একটি "Indian Independence League" প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জাপানী ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার-কার্য্য সুরু করেন। জাপানী ভাষায় তিনি সংবাদ-পত্রও পরিচালিত করিতে থাকেন এবং তাহাতেও ভারতবর্ষ সম্পর্কেই অধিকাংশ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড-এর লেখা বিখ্যাত "India in Bondage" গ্রন্থখানিও তিনি জাপানী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার পর বৃটিশ-শক্তিকে চরম আঘাত হানার জন্য বৃদ্ধ বয়সেও তিনি পুনরায় উদ্যোগী হইলেন।

টোকিও-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুন মাসের মাঝামাঝি ব্যাঙ্কক-এ

পুনরায় ভারতীয় প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলন হইল। চীন, জাপান, ব্রহ্ম, মালয়, মাঞ্চুকুয়ো, জাভা, বর্ণিও, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিরা উহাতে যোগদান করিলেন এবং মোহন সিং-এর অধীন ভারতীয় ফৌজ-এর প্রতিনিধিরাও উহাতে যোগদান করিলেন। এই সম্মেলনেই রাসবিহারী বসুকে সভাপতি করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা হইল এবং উহার অধীনে আজাদ-হিন্দ ফৌজ-এরও সৃষ্টি হইল।

মোহন সিং ও জাপ-কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ

ইহার পরই কিন্তু মোহন সিং ও তাঁহার অধীন অন্যান্য অফিসারদের সহিত জাপানীদের বিরোধ বাধিয়া উঠিল। ব্যাঙ্কক-সম্মেলনে জাপানীদিগকে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিতে বলা হয়, কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়াই আজাদ-হিন্দ ফৌজকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং, আজাদ-হিন্দ ফৌজের আরও কয়েকজন অফিসার এবং 'ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ'-এর বহু নেতাই কিন্তু ইহাতে সম্মত হইলেন না।

রাসবিহারী বসু দেখিলেন যে, এই বিরোধের ফলে বুঝি সকল কিছুই পণ্ড হইয়া যায়। বিরোধ যাহাতে চরম পর্য্যায়ে না পৌঁছিতে পারে, সেজন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিচক্ষণতা এবং ধৈর্য্যের দ্বারা তিনি উভয়পক্ষের মধ্যে যখন কোনও মীমাংসাই সংঘটিত করিতে পারিলেন না, তখন জাপানীদিগকে সাময়িকভাবে খুসি করিয়া যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায়, তিনি সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। জাপ-কর্তৃপক্ষের চাপে পড়িয়া তিনি অবশেষে মোহন সিংকে গ্রেপ্তারেরও আদেশ দিলেন এবং জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ মোহন সিংকে গ্রেপ্তার

করিলেন। গ্রেপ্তারের সময় মোহন সিং ঘোষণা করিয়া গেলেন যে, তাঁহার অধীন আজাদ-হিন্দ বাহিনী তিনি ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইতেছেন এবং জাপানীরা যাহাতে আপনাদের স্বার্থ সাধনের জন্য তাঁহাদিগকে ব্যবহার করিতে না পারে, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে তিনি ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতে অনুরোধ জানাইলেন।

আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈন্য ও সেনানীবৃন্দের অধিকাংশেরই গভীর বিশ্বাস ছিল মোহন সিং-এর উপর, সুতরাং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইলে আজাদ-হিন্দ ফৌজে থাকিতে অনেকেই অসম্মত হইলেন। রাসবিহারী বসু ও আরও কয়েকজন নেতা উক্ত বাহিনীকে পুনরায় সংগঠিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইল না। জাপানীদের দেওয়া অর্থে রাসবিহারী বসু সকলের বেতন দিতেছেন, এইরূপ ধারণায় বেতন গ্রহণেও অনেকে সম্মত হইলেন না। এইভাবে আজাদ-হিন্দ ফৌজের সংগঠন যখন নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে, তখন সহসা সুভাষচন্দ্রের অপ্রত্যাশিত আগমনে সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল।

সুভাষচন্দ্রের ভারত-ত্যাগ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় উপস্থিতি

সুভাষচন্দ্র চির-যোদ্ধা—শত্রুর সহিত আপোষহীন বিরামহীন সংগ্রামের তিনি মূর্ত্ত-প্রতীক। ভারতের কোটি কোটি নরনারীর অসীম দুঃখ-দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। দেশ-সেবার অপরাধে জীবনের অনেকগুলি বৎসর তাঁহাকে ইংরাজের কারাগারে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের শেষভাগেও তাঁহার বিরুদ্ধে বৃটিশের আদালতে দুইটি মামলার বিচার চলিতেছিল—তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল জেল-হাজতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতেই ভারতের বাহিরে গিয়া ইংরাজের শত্রুপক্ষের আনুকূল্যে ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া

উহা বৃটিশের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিবার পরিকল্পনা তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল, যাহার দ্বারা ভারতে এই অভিশপ্ত বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটানো যায়। ভারতে থাকিয়া বৃটিশের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন বিশেষ কার্য্যকরী হইবে না—তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভারত ত্যাগ করিতে হইলে জেল-হাজত হইতে বাহিরে আসা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জেল-হাজতে থাকা কালেই অনশন সুরু করিলেন। কয়েকদিন নির্ব্বিকার থাকিবার পর কর্ত্তৃপক্ষ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটিতেছে, তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন—মামলা চলিতেই লাগিল। সুভাষচন্দ্র জেলের বাহিরে আসিয়াই গোপনে ভারত-ত্যাগের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। যুদ্ধকালে ভারতে থাকিয়া বৃটিশের বিচারে আরও কয়েক বৎসর কারাদণ্ড লাভ করিয়া অযথা জীবনের আরও কতকগুলি বৎসর অপব্যয় করার কোনও সার্থকতা তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। সকলের সহিত ইহার পর তিনি দেখা-সাক্ষাৎ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিলেন এবং আপনার এলগিন রোডস্থ বাস-ভবনে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। এই সময় তিনি দীর্ঘ চুল ও শ্মশ্রুও রাখিতে শুরু করেন। কেহই তখন তাঁহার এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ ও গূঢ় অভিসন্ধির বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই। এই অবস্থায় সহসা ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারি সংবাদ প্রকাশিত হইল যে, সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। দেশবাসী ইহাতে যথেষ্ট কৌতূহলী হইয়া উঠিল—কিন্তু ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন।

সুভাষচন্দ্রের এইরূপ অপ্রত্যাশিত অন্তর্ধান এবং গোপনে দেশত্যাগ করিয়া বার্লিনে গিয়া উপস্থিতি এক পরম রহস্যজালে আবৃত। এ সম্বন্ধে এইরূপ শুনা যায় যে, ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি তিনি

মোটরযোগে গোপনে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যান এবং বর্দ্ধমানে গিয়া পাঞ্জাব মেলে তাঁহার জন্য রিজার্ভ করা একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আরোহণ করিয়া বাংলা ত্যাগ করেন। পেশওয়ারে পৌছিয়া তিনি এক ব্যক্তির সহিত কখনও টাঙ্গায় চড়িয়া আবার কখনও বা হাঁটিয়া কোনও মতে কাবুলে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে একজন গোয়েন্দার পাল্লায় পড়িলে তাহাকে কিছু ঘুস দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করা হয়। তিনি কাবুলে রুশ-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত করেন, কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তখন যেরূপ দাঁড়াইতেছিল, তাহাতে তাঁহারা সুভাষচন্দ্রকে প্রত্যক্ষভাবে আশ্রয় দিয়া বৃটিশের বিরাগভাজন হইতে চাহেন নাই। অতঃপর জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সংযোগ স্থাপন করিলে তাঁহারা সুভাষচন্দ্রকে রাশিয়ার ভিতর দিয়া বিমানযোগে বার্লিনে লইয়া যান। বার্লিনে হিটলার তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। যে সকল ভারতীয় সৈন্য ও অফিসার বৃটিশপক্ষে লড়াই করিয়া ইতিমধ্যে জার্ম্মাণদের হস্তে বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের লইয়া তিনি সেখানে এক আজাদ-হিন্দ বাহিনী গঠন করিলেন এবং নিজেও উত্তমরূপে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

জাপান যখন ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে উদ্ভব হইল এক নূতন পরিস্থিতির; সুভাষচন্দ্র জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের মাধ্যমে জাপ-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় একটি আজাদ-হিন্দ বাহিনী গঠনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় "ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ" এবং তাহার অধীন একটি আজাদ-হিন্দ বাহিনী গঠিতও হইল; কিন্তু জাপানীদের আচরণে মতানৈক্যের সৃষ্টি হওয়ায় উহা তেমন কার্য্যকরী হইল না। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বার্লিন হইতে সুভাষচন্দ্রকে আনাইবার জন্য জাপ-

কর্তৃপক্ষকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কারণ একমাত্র তাঁহারই বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ভারতের উপর বৃটিশ-শক্তিকে আঘাত হানা সম্ভব হইতে পারে এবং জাপানীদের সহিতও উপযুক্ত বোঝাপড়া হইতে পারে। জাপ-কর্তৃপক্ষও যখন দেখিলেন যে, মোহন সিং প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করিয়াই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইল না এবং সমগ্র আজাদ-হিন্দ সংগঠনই ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে, তখন তাঁহারাও জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া সুভাষচন্দ্রকে আনয়নের ব্যাপারে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহাকে আনিবার তোড়জোড় সুরু হইয়া গেল।

১৯৪৩ সালের ২৮শে এপ্রিল রাসবিহারী সিঙ্গাপুরে একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি জানাইলেন যে, সুভাষচন্দ্রের শীঘ্রই বার্লিন হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আগমনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এবং তাঁহারই উপর আন্দোলন-পরিচালনার সকল দায়িত্ব অর্পণ করিতে প্রতিনিধিগণকে তিনি অনুরোধও করিলেন। ইহাতে প্রতিনিধিগণ সকলেই বিশেষ খুসি হইলেন এবং রাসবিহারীর আন্তরিকতায় সকলেরই বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল।

সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে সুভাষচন্দ্র জার্ম্মাণ ও জাপ-সাবমেরিণে করিয়া বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া তিন মাসে সুমাত্রায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তথা হইতে বিমানযোগে যাত্রা করিয়া ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি টোকিও পৌছিলেন। সেখানে জাপানী প্রধান মন্ত্রী জেনারল তোজোর সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া এবং বেতারে একটি ভাষণ দান করিয়া সুভাষচন্দ্র ২রা জুলাই সিঙ্গাপুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। "ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ"-এর প্রধান কেন্দ্র তখন ব্যাঙ্কক হইতে স্থানান্তরিত হইয়া সেইখানেই স্থাপিত ছিল।

নেতাজী কর্তৃক কর্তৃত্বভার গ্রহণ

৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরে এক বৃহৎ সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় রাসবিহারী বসু নিজে পদত্যাগ করিয়া সুভাষচন্দ্রকে "ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ"-এর সভাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের সমুদয় কর্তৃত্বও তাঁহারই উপর অর্পণ করিলেন। অনুষ্ঠানটি অতিশয় মর্মস্পর্শী হইয়াছিল। বৃদ্ধ রাসবিহারীর বিচক্ষণতা এতদিনে প্রমাণিত হইল। তাঁহার স্বদেশপ্রেমের গভীরতা সকলকে মুগ্ধ করিল।

সুভাষচন্দ্রের দর্শনে এবং তাঁহার দ্বারা কর্তৃত্বভার গ্রহণে উপস্থিত প্রতিনিধিমণ্ডলী ও বিরাট জনতা তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া উচ্ছ্বাসের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেইদিন হইতেই সকলে তাঁহাকে "নেতাজী" বলিয়া জানিল। সুভাষচন্দ্র অতঃপর দণ্ডায়মান হইয়া এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করিলেন। অন্যান্য কথার সহিত তিনি বলিলেন—

"In the interests of the Indian Independence movement and of the Azad Hind Fouz, I have taken over the direct command of our Army from this day. This is a matter of joy and pride to me, because for an Indian there can be no greater honour than to be Commander of India's Army of Liberation. The Azad Hind Fouz has a vital role to play. To fulfil this role we must weld ourselves into an army that will have only one goal—the freedom of India—and only one will—to do or die in the cause of India's freedom."

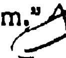
যথাসম্ভব সত্বর একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করিবার সিদ্ধান্তও ঐ সভায় তিনি ঘোষণা করিলেন।

যাহা হউক, সুভাষচন্দ্রের আগমন এবং তাঁহার দ্বারা দায়িত্ব গ্রহণের পর সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং কর্ম্ম-প্রতিভাই হইল সকল সমস্যা সমাধানের সহায়ক। সকলের প্রাণেই জাগিয়া উঠিল উৎসাহ আর উদ্দীপনা।

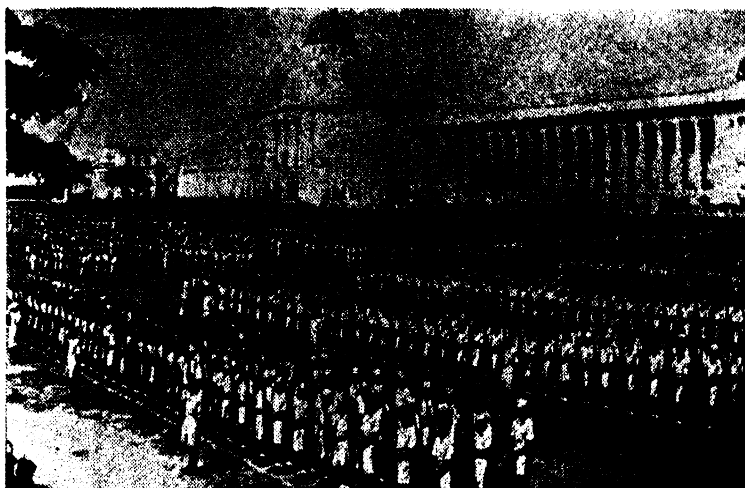
৯ই জুলাই সিঙ্গাপুরে আর একটি সভা হইল—তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য এই সভায় সুভাষচন্দ্র সামগ্রিকভাবে ধন-সম্পদ সমাবেশের দাবী জানাইলেন। আজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্ব্বময় অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া ২৫শে আগষ্ট একটি ভাষণে তিনি ভারতে বৃটিশ-শক্তিকে আক্রমণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অভিভাষণটি অতিশয় উদ্দীপনাপূর্ণ ছিল। তাহাতে তিনি বলিলেন—

"Comrades, Officers and Friends,—

There in the distance beyond that river, beyond those jungles, beyond those hills and dales, lies the promised land, the sacred land from which we sprang—the land to which we shall now return. Hark, India is calling···Blood is calling to blood. Rise, we have no time to lose. Take up your arms···We shall make our way through the enemy's ranks or if God wills we shall die a martyr's death. And in our last sleep we shall kiss the road that will bring our Army to Delhi. The road to Delhi is the road to Freedom."



আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈন্য ও অফিসারদের শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি শিক্ষা-কেন্দ্র খুলা হইল। বহু প্রবাসী ভারতীয়ও সৈন্য-বাহিনীতে যোগদান করিতে লাগিলেন। সৈন্যবিভাগে কোনও শ্রেণী বা সাম্প্রদায়িক বৈষম্য রহিল না। আন্দোলন যাহাতে সাফল্য লাভ করে,



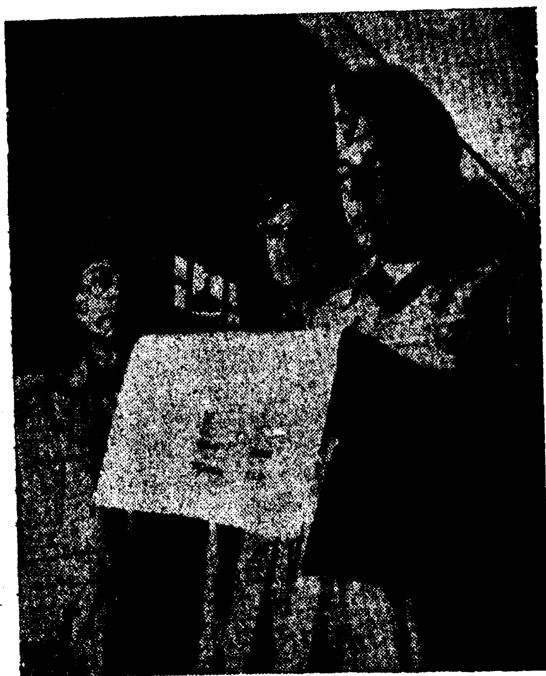
সিঙ্গাপুরে আজাদ-হিন্দ ফৌজ পরিদর্শনরত নেতাজী সুভাষচন্দ্র

তজ্জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ মুক্তহস্তে অর্থ-সাহায্য করিতে লাগিলেন।

আজাদ-হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে ক্যাথে বিল্ডিং-এ আর একটি সভা হইল। তাহাতে "ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ" এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রতিনিধিবৃন্দ, জাপ সরকার ও সামরিক বিভাগের অফিসারগণ

এবং অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় সুভাষচন্দ্র এবং আজাদ-হিন্দ সরকারের অন্যান্য সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করার পর আজাদ-হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয় ঘোষণা করা হইল। ঘোষণায় অন্যান্য কথার সহিত বলা হইল :—



১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর নেতাজী আজাদ-হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিতেছেন

"In the name of God, in the name of bygone generations who have welded the Indian people into one nation,

and in the name of dead heroes who have bequeathed to us a tradition of heroism and self-sacrifice—we call upon the Indian people to rally round our banner and to strike for India's freedom. We call upon them to launch the final struggle against the British and their allies in India and to prosecute that struggle with valour and perseverance and with full faith in final victory—until the enemy is expelled from Indian soil and the Indian people are once again a Free Nation."

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া আজাদ-হিন্দ সরকারের মন্ত্রি-মণ্ডলী গঠিত হইল :—সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু, লেঃ কর্ণেল শাহ্-নওয়াজ, লেঃ কর্ণেল এ-সি চট্টোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন, করিম গণি, দেবনাথ দাস, ডি-এম খান, এ-ইয়ালাপ্পা, জে-থিভি, সর্দ্দার ঈশ্বর সিং, এ-এন সরকার, এস্-এ আয়ার, লেঃ কর্ণেল আজির আহম্মদ, লেঃ কর্ণেল এন্-এস্ ভগৎ, কর্ণেল জে-কে ভোঁস্লা, লেঃ কর্ণেল গুলজারা সিং, লেঃ কর্ণেল এম্-জেড্ কিয়ানি, লেঃ কর্ণেল এ-ডি লোকনাথন, লেঃ কর্ণেল এহ্সান কাদির, এ-এম্-সাহা। স্বয়ং সুভাষচন্দ্র হইলেন রাষ্ট্রের প্রধান, প্রধান-মন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্র সচিব এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধি-নায়ক। আজাদ-হিন্দ সরকার ও ফৌজের প্রধান কেন্দ্র প্রথমে সিঙ্গা-পুরেই স্থাপিত হয়—পরে উহা ব্রহ্মদেশে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

ঝান্সীর রাণী বাহিনী

ক্যাপ্টেন ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নেত্রীত্বে ক্রমশঃ এক নারী-বাহিনীও গঠিত হইল। উহার নাম দেওয়া হইল "ঝান্সীর রাণী বাহিনী"। উক্ত

বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত মহিলাগণকে ড্রিল, অস্ত্র-চালনা এবং রণ-কৌশল হইতে আরম্ভ করিয়া সেবা-শুশ্রূষা এবং জনকল্যাণমূলক কার্য্য প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হইত। এইভাবে পুরুষদের সাথে সাথে নারীগণও তাঁহাদের যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ৯ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের বালকদের লইয়া একটি বাল-সেনাদলও গঠিত হয়। ইহারাও সামরিক কুচ-কাওয়াজ এবং বেয়নেট্ চালনা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিত।

২৫শে অক্টোবর আজাদ-হিন্দ সরকার কর্ত্তৃক বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষিত হইল।

আজাদ-হিন্দ সরকার গঠিত হওয়ার পর জাপানী পার্লামেণ্টে এক বক্তৃতায় ২৩শে তারিখে জাপ প্রধান-মন্ত্রী জেনারল তোজো সরকারীভাবে উহাকে স্বীকার করিয়া লইলেন এবং উভয় সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক সদস্য বিনিময়েরও ব্যবস্থা হইল। একে একে ফিলিপাইন, মাঞ্চুকুয়ো, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্ম, জার্ম্মাণী, ইতালী, ক্রোশিয়া প্রভৃতির স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট-সমূহ আজাদ-হিন্দ সরকারকে স্বীকার করিয়া লইলেন।

'শহীদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপ

নভেম্বর মাসে টোকিওতে যে বৃহত্তর পূর্ব্ব এশিয়া জাতিসঙ্ঘ-সম্মেলন হয়, সুভাষচন্দ্র তাহাতে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে ৬ই নভেম্বর জেনারল তোজো ঘোষণা করেন যে, ভারতীয়দের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি জাপ-গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্যের নিদর্শন স্বরূপ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ শীঘ্রই আজাদ-হিন্দ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ইহার পর নেতাজী সুভাষচন্দ্র উক্ত দ্বীপমালা পরিদর্শন মানসে ডিসেম্বর মাসে তথায় গমন করেন। ১৯৪৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বীপ দুইটি আজাদ হিন্দ সরকারকে অর্পণ করা হয়।

তখন আন্দামান ও নিকোবরের নূতন নামকরণ করা হয় "শহীদ দ্বীপ" ও "স্বরাজ-দ্বীপ"। নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর্ণেল লোকনাথনকে উক্ত দ্বীপগুলির চীফ কমিশনার নিযুক্ত করেন।

সাফল্যলাভের জন্য ধন-সম্পদের যে সামগ্রিক সমাবেশের দাবী সুভাষচন্দ্র জানাইলেন, তাহা ব্যর্থ হইল না। আন্দোলনের সহায়তাকল্পে প্রবাসী ভারতীয়গণ মুক্তহস্তে অর্থ দান করিতে লাগিলেন। এই সকল অর্থ জমা রাখিবার জন্য রেঙ্গুণে একটি আজাদ-হিন্দ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইল এবং পরে রেঙ্গুণের উপকণ্ঠে আরও দুইটি এবং টাঙ্গিতে একটি এই ব্যাঙ্কের শাখাও খোলা হইল। সুভাষচন্দ্র যে সকল সভায় যোগদান করিতেন, তথায় তাঁহাকে যে মাল্য দান করা হইত, সেই সকল মালা নীলামে বিক্রয় করিয়াও প্রচুর অর্থ পাওয়া যাইত। প্রবাসী ভারতীয়গণ সুভাষচন্দ্রকে কয়েকবার স্বর্ণদ্বারা ওজন করেন এবং সেই স্বর্ণ আজাদ-হিন্দ সরকারকে দান করেন। হবিব সাহেব তাঁহার প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি আজাদ-হিন্দ সরকারকে দান করায় তাঁহাকে "সেবক-ই-হিন্দ" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শ্রীমতী বেতাইও তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব এই সরকারকে দান করায় তাঁহাকেও উপাধি দেওয়া হয় "সেবিকা-ই-হিন্দ"।

আরাকান-সীমান্তে অভিযান

১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি আজাদ-হিন্দ ফৌজ আরাকান সীমান্তে বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করিল। ২৭শে মার্চ্চ তারিখে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক ঘোষণায় জানাইলেন যে, দিন দুই পূর্ব্বে আজাদ-হিন্দ ফৌজ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই অঞ্চলের যুদ্ধে বিশেষভাবে কৃতিত্ব প্রদর্শন করার জন্য মেজর মিশ্র নামক আজাদ-হিন্দ

ফৌজের একজন অফিসারকে সর্ব্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র "সর্দ্দার-ই-জঙ্গ" নামক উপাধিতে ভূষিত করেন।

আসাম-সীমান্তে আক্রমণ

ইহার পর আসাম-সীমান্তের দিকে একটি বড় রকমের অভিযান সুরু করার জন্য জোর প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। সৈন্যবাহিনীকেও নূতনভাবে সংগঠিত করা হইল। আরাকান-সীমান্তে অভিযানের কয়েক মাস পরেই ১৯৪৪ সালের বসন্তকালে আজাদ-হিন্দ ফৌজ ও জাপ-বাহিনী সম্মিলিতভাবে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আসামের পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া একদিকে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল ও অপরদিকে কোহিমা আক্রমণ করিল। আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণ দুর্গম পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অতি সামান্য রসদ-পত্র ও খাদ্য-সম্ভার সঙ্গে লইয়া আসাম-সীমান্তের যুদ্ধে যে অমিত বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহা তাহাদের নৈতিক দৃঢ়তার পরিচায়ক। নেতাজীর আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সৈন্যগণ আপনাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার মানসে জীবন-পণ সংগ্রামে লিপ্ত হইল। সাফল্যও লাভ হইতে লাগিল আশাতিরিক্তভাবে। সে দুর্ব্বার ও প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে ইংরাজের প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সেই সময় মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্র প্রভৃতি অপর মিত্র-রাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীও ভারতে উপস্থিত না থাকিলে হয় তো যুদ্ধের ফলাফল অন্যরূপই দাঁড়াইত।

যাহা হউক, অভিযান সুরু করিয়াই আজাদ-হিন্দ ফৌজ অতি অল্প-দিনের মধ্যেই মণিপুর রাজ্যের এক সুবিস্তৃত এলাকা দখল করিয়া ফেলিল। অধিকৃত অঞ্চলে জাতীয় পতাকা উড্ডীন ও অস্থায়ী সরকার গঠিত হইল। প্রবল বাধা-বিপত্তির মধ্যেও সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন অন্ততঃ আংশিকভাবেও

সফল হইল। আজাদ-হিন্দ ফৌজের এই অভিযান ও সাফল্যের সংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়িলে পাছে ভারতব্যাপী এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেজন্য ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সংবাদ-প্রকাশ সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ভারতবাসীরা তখন এ. সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে না।

প্রতিকূল অবস্থায় আজাদ-হিন্দ বাহিনীর বিপর্য্যয়

কিন্তু এত সাফল্যের পরও বিপর্য্যয় বাধিল বর্ষা নামার পরই। মূল বাহিনী হইতে বহু দূরে আসিয়া সামান্য অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যেও কেবলমাত্র অটুট মনোবলের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে আজাদ-হিন্দ বাহিনী সাফল্য লাভ করিতেছিল। খাদ্যের সরবরাহও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। পুরাদমে বর্ষা সুরু হওয়ার পর জুলাই মাসে সর্ব্বপ্রথম আজাদ-হিন্দ ফৌজের অগ্রগতি ব্যাহত হইল। বিনা আহারে, অপ্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যে সেই দুর্গম অঞ্চলে অবস্থান করা আর সম্ভব হইল না; কাজেই বাধ্য হইয়া পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করিতে হইল। বহু দুঃখ-কষ্টে যে স্থান তাহারা দখল করিয়াছিল, প্রতিকূল অবস্থায় তাহাই তাহাদের ত্যাগ করিতে হইল। তাহারা পিছাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য ব্রহ্মের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আজাদ-হিন্দ ফৌজ যদিও অবস্থাগতিকে ইম্ফল ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইল, তথাপি নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার এক বাণীতে সৈন্য ও অফিসারগণের অপূর্ব্ব বীরত্ব, দৃঢ়তা ও রণ-কৌশলের প্রশংসা করিলেন। পুনরায় নূতনভাবে সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করিয়া আক্রমণ সুরু করার অভিলাষও তিনি ব্যক্ত করিলেন।

কিন্তু জাপানীদেরও যুদ্ধ-ক্ষমতা দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল। বিভিন্ন

রণাঙ্গনে তাহারা প্রায় যুদ্ধ না করিয়াই পশ্চাদপসরণ সুরু করিল। ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনী এক প্রকার বিনা প্রতিরোধেই ব্রহ্মের অভ্যন্তরে অবাধে অগ্রসর হইয়া চলিল। সকলেই স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, জাপানীদের যুদ্ধ-বিমুখতা ও সামর্থ্যের অভাব এবং মিত্রপক্ষের অবাধ অগ্রগতি দ্রুত বিপর্য্যয় ডাকিয়া আনিতেছে। সুভাষচন্দ্র কিন্তু তাহাতেও হতাশ হইলেন না।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনী যখন দ্রুতগতিতে রেঙ্গুণের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখনও নেতাজী সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুণেই অবস্থান করিতেছিলেন। আজাদ-হিন্দ সরকার এবং ফৌজের সকলেই তাঁহাকে রেঙ্গুণ ত্যাগ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে তিনি সম্মত হইলেন না। অবশেষে ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনী রেঙ্গুণের অনতিদূরে আসিয়া পৌছিলে ২৪শে এপ্রিল সকলে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে রেঙ্গুণ ত্যাগ করাইলেন। জাপানীরা ২৩শে তারিখেই রেঙ্গুণ ত্যাগ করিয়াছিল। অরাজকতার সুযোগ লইয়া যাহাতে যথেচ্ছ লুঠ-পাট, খুন-জখম এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষভাবে ভারতীয় অধিবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য কর্ণেল লোকনাথনের অধিনায়কত্বে আজাদ-হিন্দ ফৌজের একটি দলকে রেঙ্গুণে রাখিয়া যাওয়া হইল।

ইংরাজ সৈন্য রেঙ্গুণ অধিকার না করা পর্য্যন্ত নাগরিকগণের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করার ভারই কেবলমাত্র কর্ণেল লোকনাথনের অধীন বাহিনীর উপর অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপেই পালন করেন এবং বৃটিশ-বাহিনী আসিয়া বিনা বাধায় রেঙ্গুণ দখল করিলে পর পূর্ব্ব-পরিকল্পনামত তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সুভাষচন্দ্র ব্যাঙ্কক হইয়া পরে সিঙ্গাপুরে চলিয়া যান।

জাপানের আত্মসমর্পণ

মিত্র-পক্ষীয় বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার চতুর্দ্দিকেই সাফল্য লাভ করিতে লাগিল। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে ইউরোপে জার্ম্মাণীর সম্পূর্ণরূপে পতন ঘটে এবং ইউরোপের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। তখন একা জাপানের পক্ষে আর লড়াই চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। রুশিয়াও উপরন্তু জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর প্রচণ্ড আণবিক বোমা বর্ষণের পর জাপ-সম্রাট হিরোহিতো ১৫ই আগষ্ট আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। জাপানের আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তে আজাদ-হিন্দ ফৌজেরও আত্মসমর্পণের পালা আসিল। জাপ-কর্ত্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রকে জানাইলেন যে, তাঁহাকে মাঞ্চুরিয়ায় লইয়া গিয়া হারবিনস্থ রুশ-সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে।

তাইহোকু বিমান-দুর্ঘটনা

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র, আজাদ-হিন্দ সরকারের কয়েকজন বিশিষ্ট মন্ত্রী এবং কয়েকজন জাপ-সামরিক অফিসার তিনখানি বিমানে আরোহণ করিয়া ১৬ই আগষ্ট সিঙ্গাপুর হইতে যাত্রা করেন এবং ১৭ই তারিখে ব্যাঙ্কক-এ পৌছান। তথা হইতে সাইগন গমন করিয়া তাঁহারা সেইখানেই রাত্রি অতিবাহিত করেন। সেখানে সুভাষচন্দ্রকে জানান হয় যে, ১৮ই তারিখে সাইগন হইতে একখানি বিশেষ বিমান টোকিও যাইবে এবং তাহাতে সুভাষচন্দ্রের দলের মাত্র দুই জনের স্থান হইতে পারে। তিনি তখন কর্ণেল হবিবুর রহমানের সহিত সেই বিমানখানিতে যাত্রা করেন এবং দলের অবশিষ্ট লোকদের জন্য অন্য বিমানের ব্যবস্থা হয়।

ইহার পরই ২৩শে আগষ্ট তারিখে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়—তাহা যেমনই অপ্রত্যাশিত, তেমনই মর্ম্মন্তুদ। জাপানী সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিমান-দুর্ঘটনার ফলে গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিস্তৃত সংবাদে প্রকাশ পায় যে, টোকিও যাত্রার পথে বিমানগুলি নাকি ফরমোসার অন্তর্গত তাইহোকু বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করে। পুনরায় সেখান হইতে যাত্রা করিয়া বিমানগুলি আকাশে উঠিলে ভোর রাত্রি আন্দাজ চার ঘটিকার সময় সুভাষচন্দ্র যে বিমানখানিতে ছিলেন, তাহার এঞ্জিন বিগড়াইয়া যায় এবং বিমানখানি প্রবলভাবে পাক খাইতে খাইতে ভূমিতে পতিত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। সুভাষচন্দ্রের শরীর নাকি এমনভাবে অগ্নিদগ্ধ ও আহত হয় যে, তাঁহার আর বাঁচিবার কোন আশাই থাকে না। আহত অবস্থায় তাঁহাকে তাইহোকুর এক হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেখানে কয়েকঘণ্টা পরেই ১৯শে আগষ্ট নাকি তাঁহার জীবনাবসান হয়। কর্ণেল হবিবুর রহমানও আহত অবস্থায় হাসপাতালে গিয়া পরে আরোগ্যলাভ করেন।

ইতিপূর্ব্বেও আর একবার ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ্চ সুভাষচন্দ্রের অলীক মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। উহা যে মিথ্যা—পরে তাহা প্রমাণিত হয়। ভারতের প্রতিটি অধিবাসী তাই আজ পর্য্যন্ত তাইহোকু বিমান-ঘাঁটিতে দুর্ঘটনায় তাহাদের প্রিয় নেতাজীর পরলোকগমনের কথা বিশ্বাস করিতে পারে না। তাঁহার ভারত-ত্যাগের মতই এই বিমান-দুর্ঘটনার ব্যাপারও তাই আজও রহস্যাবৃতই রহিয়া গিয়াছে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আজাদ-হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণ সুরু হওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বেই রাসবিহারী বসুও পরলোক গমন করেন।

মিত্র-পক্ষের জয়লাভের পর, দিল্লীর লাল কেল্লায় সামরিক-আদালতে

আজাদ-হিন্দ ফৌজের কয়েকজন অফিসারের বিচার অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত এই বিচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেও উহাতে কর্ণপাত করা হয় না। সুভাষচন্দ্রকে জাপানীদের হাতের পুতুল এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজকে জাপানের তাঁবেদার বাহিনীরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইংরাজ-কর্তৃপক্ষ যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেন; কিন্তু তথাপি আসল সত্যকে তাঁহারা চাপা দিতে পারেন না। প্রয়োজন হইলে যে সুভাষচন্দ্র জাপানীদের যে কোনও কার্যক্রমও প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন এবং দৃঢ়ভাবে আজাদ-হিন্দ সরকার ও ফৌজের কার্য্যের উপর তাহাদের অযথা হস্তক্ষেপ নিবারণ করিয়া আপনাদের স্বাধীনতা ও ভারতের স্বার্থকেই সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা প্রমাণিত হয়। স্বাধীন সরকারের সুযোগ্য কর্ণধাররূপে যে অসাধারণ সংগঠন-ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, ন্যায়পরায়ণতা, সমদর্শিতা, সহানুভূতিশীলতা এবং মহানুভবতার ইতিহাস তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে তাঁহার প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় মস্তক আনত হইয়া পড়ে।

দিল্লীর লাল কেল্লায় সামরিক-আদালতে বিচারে আজাদ-হিন্দ ফৌজের কোন কোন অফিসারকে শেষ পর্য্যন্ত মুক্তি দেওয়া হয়, কাহারও কাহারও দণ্ডবিধান করা হয়। ইহা লইয়াও সমগ্র ভারতে তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়।

নৌ-বিদ্রোহ

মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত মিত্রপক্ষই জয়লাভ করিলেন এবং অক্ষ-শক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি একে একে পরাজয় বরণ করিলেন। ১৯৪৫ সালে মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিল।

মিত্রশক্তির অংশীদাররূপে ইংলণ্ডেরও জয় হইল—কিন্তু শক্তি, আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা এবং অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া তাহার অবস্থা পরাজিত দেশগুলি অপেক্ষা বিশেষ উৎকৃষ্ট হইল না। মহাযুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে তাহার পূর্ব্বক্ষমতা বজায় রাখা আর সম্ভব হইল না। চতুর্দ্দিকে অশান্তি সৃষ্টি হইতে লাগিল—পৃথিবীর সুদূরপ্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলিতে পর্য্যন্ত দেখা দিল গণজাগরণ। মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদ তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। যুদ্ধকালে মিঃ চার্চ্চিল বৃটিশজাতিকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, বৃটিশ-সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া করিয়া দিবার জন্য তিনি সম্রাটের প্রধান-মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই। যুদ্ধশেষে কিন্তু তাঁহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৃটিশ-সাম্রাজ্য দেউলিয়া হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে কারাগারে থাকা অবস্থাতেই মে মাসে মহাত্মা গান্ধী অনশন সুরু করেন এবং তখন তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেল হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি জনাব মহম্মদ আলি জিন্নার সহিত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে কয়েকদিনব্যাপী আলোচনা চালাইলেন, কিন্তু তাহা সফল হইল না।

সিমলা-বৈঠক

১৯৪৫ সালে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মহাসভার যে নূতন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে শ্রমিকদল বিপুল সংখ্যায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করেন এবং ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁহাদের মধ্যে খানিকটা আন্তরিকতা দেখা দেয়। ঐ বৎসরের ১৫ই জুন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে ভারতীয় সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ঐ সময় সিমলায় এক নেতৃ-সম্মেলন আহ্বান করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সম্মেলনে যোগদান করিতে সিদ্ধান্ত করেন।

কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন নেতা লইয়া বড়লাটের সভাপতিত্বে ২৫শে জুন হইতে সিমলায় বৈঠক সুরু হইল; কিন্তু বৈঠক শেষ পর্য্যন্ত ফলপ্রসূ হইল না—কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে লীগ ও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মতানৈক্যের ফলে ১৪ই জুলাই বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল। এক কথায় বলিতে গেলে, সিমলা-সম্মেলনে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা রহিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের হাতে।

কিন্তু বৈঠক ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই সমস্যার সমাধান হইল না। সমগ্র ভারতে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছিল, যাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কোটি কোটি লোকের অসহযোগিতা ও বিরুদ্ধ মনোভাব লাভ করিয়া একটা বিরাট দেশকে কেবলমাত্র সৈন্য-সাহায্যে শাসন করিতে গেলে যে বিপুল ব্যয় বহন করিতে হয়, তাহা সঙ্কুলান করিবার শক্তি মহাযুদ্ধবিধ্বস্ত বৃটেনের ছিল না। সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিই চিরদিনের মত সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু-সময় নির্দ্দেশ করিতেছিল। অধীন

ভারত অপেক্ষা স্বয়ং-শাসিত বন্ধুভাবাপন্ন স্বাধীন ভারত যে পরোক্ষে বৃটেনের শক্তি যোগাইতে পারে, তাহা ইংলণ্ডের বিচক্ষণ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ক্রমশঃ উপলব্ধি করিলেন। স্বেচ্ছায় চুক্তির দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তর করিলে ভারতে বৃটেনের বাণিজ্য ও ব্যবসায়-স্বার্থও বজায় থাকার সম্ভাবনা, সুতরাং ভারতীয় সমস্যা লইয়া তাঁহারা যথেষ্ট মাথা ঘামাইতে লাগিলেন।

আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনানীবৃন্দের বিচারে গণ-বিক্ষোভ

ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদ তাহার মরা কামড় দিতে কসুর করিল না। আজাদ-হিন্দ ফৌজের যে সকল সেনাধ্যক্ষ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছিলেন অথবা ধৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েক-জনকে কয়েক দফায় দিল্লীর লাল কেল্লায় সামরিক-আদালতে অভিযুক্ত করিয়া ১৯৪৫ সালের শেষ দিক হইতে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তাঁহাদের বিচার সুরু হইল। আজাদ-হিন্দ ফৌজের গৌরবজনক কার্য্যকলাপের বিষয় ভারতবাসিগণ যুদ্ধের সমাপ্তির পর বিশেষভাবে জানিতে পারেন এবং তাহার ফলে তাঁহারা এই সময় যথেষ্ট অনুপ্রাণিতও হন। নেতাজীর প্রিয় সহকর্ম্মিগণের এইভাবে বিচার-ব্যবস্থা হওয়ায় ভারতের জনমত অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং চতুর্দ্দিক হইতে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ত্তারা কিন্তু তাঁহাদের জিদ ত্যাগ করিলেন না—নীতির দোহাই দিয়া বিচার-কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আজাদ-হিন্দ ফৌজের অভিযুক্ত সেনাধ্যক্ষগণের পক্ষ সমর্থনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ভুলাভাই দেশাই, সার তেজবাহাদুর সপ্রু, জনাব আসফ আলি ও ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের

পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন। মুস্‌লিম লীগও কাহারও কাহারও পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীর লাল কেল্লায় সামরিক-আদালতে বিচার-প্রহসন চলিতে লাগিল। কাহারও কাহারও গুরুতর দণ্ডবিধান করিয়া পরে আবার সেই দণ্ড মকুব করা হইল—কাহারও কাহারও দণ্ড বজায় রাখা হইল। সমগ্র ভারতে নানা স্থানে এইভাবে আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনানীবৃন্দের বিচার এবং তাঁহাদের প্রতি প্রদত্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই উপলক্ষে কোথাও কোথাও গুলিও চলিল এবং কেহ কেহ আহত ও নিহত হইলেন। সমগ্র ভারত আবার যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কিন্তু আঘাত দিতে গিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও এক প্রচণ্ড আঘাত পাইলেন। সেই আঘাত হইল ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত নৌ-বিদ্রোহ।

অভ্যুত্থানের পটভূমিকা

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজগণ ইহা বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে বাঙ্গালীরা বিশেষভাবে দেশপ্রেমিক ও চিন্তাশীল এবং সেনাবাহিনীতে তাহাদিগকে রাখা মোটেই নিরাপদ নহে। ইহার ফলে "বেঙ্গল আর্মি" ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং হীনবল করিবার জন্য বাঙ্গালীদিগকে অসামরিক জাতিতে পরিণত করা হয়। বিদ্রোহের পর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অতঃপর মূলতঃ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অঞ্চলবিশেষ হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন সম্পন্ন করেন এবং তাহাদের মধ্যে যাহাতে ঐক্যবোধ জাগ্রত না হয় ও একদল আর এক দলকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন

থাকেন। ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত সৈন্যবলের সাহায্যেই প্রকৃতপক্ষে ইংরাজগণ ভারতবর্ষ শাসন করিতেন—সামান্য গোরা সৈন্য যাহা থাকিত, তাহা দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষ মাত্র সামরিক শক্তির জোরে শাসন করা যাইত না। ইংরাজের এই দুর্ব্বলতার বিষয় যাহাতে ভারতবাসীদের নিকট যতদূর সম্ভব গোপন থাকে, সে সম্বন্ধেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন।



সৈন্যগণ ষ্টেনগান লইয়া বোম্বাই নগরীর রাজপথে পাহারা দিতেছে

অতএব দেখা যায় যে, ভারতীয় সৈন্যগণের পূর্ণ আনুগত্যের উপরই ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব ছিল প্রধানতঃ নির্ভরশীল এবং ইহাকেই মূলধন করিয়া ইংরাজগণ নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষ শাসন করিতেন; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রয়োজনের তাড়নায় ব্যাপকভাবে সৈন্যবাহিনীতে লোক-সংগ্রহ করার ফলে সৈন্যবাহিনীতে বহুদিনের সযত্ন-রক্ষিত শৃঙ্খলা অনেকখানি বিপর্য্যস্ত হয় এবং যুদ্ধের প্রথম দিকটায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটেশের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে এই শৃঙ্খলা একেবারেই নষ্ট

হইয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রণক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণের সময় ইংরাজ সৈন্যগণের অপসরণই অগ্রাধিকার লাভ করে এবং ভারতীয় সৈন্যগণের একটা বৃহৎ অংশকে পশ্চাতে ঘাঁটি আগলাইবার জন্য রাখিয়া অধিকাংশ ইংরাজ সৈন্যই নিরাপদে স্থানত্যাগ করে। ভারতীয় বাহিনী বিপদ ও অনাহারের মধ্যে পরিত্যক্ত হয়। পরবর্ত্তীকালে মূলতঃ এই সকল ভারতীয় সৈন্য ও অফিসারদের লইয়াই আজাদ-হিন্দ ফৌজ সংগঠিত হয় এবং এতদিনের সামান্য বেতনভুক্ পেশাদার সৈন্যগণ আপনাদের জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যোগ্য নায়কের নেতৃত্বাধীনে জাতীয় বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়।

হাজার হাজার সৈন্যের এইভাবে পরিত্যক্ত হওয়া এবং তাহাদের দ্বারা আজাদ-হিন্দ ফৌজ সংগঠিত হওয়ার ফলে যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে এক গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সৈন্যগণ ইহা উপলব্ধি করিতে সুরু করে যে, রণক্ষেত্রে কামানের গোলার খোরাক হিসাবেই কেবলমাত্র তাহাদের প্রয়োজন—তাহাদিগকে দরকার কেবল ইংরাজ সৈন্যগণের স্থানত্যাগ নিরাপদ করিবার জন্য পশ্চাতের ঘাঁটি আগলাইতে। তাহাদের সুখ-সুবিধা এবং মঙ্গলের জন্য ইংরাজ-সরকারের কোনও দায়িত্ব নাই। এতদ্ব্যতীত সৈন্য ও অফিসার হিসাবে ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বেতনের তারতম্য ছিল গভীর। ইংরাজ-গণের তুলনায় অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য ভারতীয়গণকে দেওয়া হইত। ইংরাজ অফিসারদের নিকট হইতে অত্যন্ত আপত্তিকর ও অসম্মানজনক আচরণ লাভ করা ছাড়া ভারতীয় সৈন্যদের আর কিছুই লাভ হইত না। এইরূপ অভিযোগও শুনা যায় যে, কমাণ্ডার কিং "তলোয়ার" নামক জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীদের নাকি "কুলীর বাচ্চা" ইত্যাদি সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন। যুদ্ধ শেষে প্রয়োজন না থাকায়

সেনা-বিভাগে ব্যাপকভাবে ছাঁটাইয়ের উদ্যোগ চলিতেছিল। তাহার ফলেও অনেকের সহসা বেকার হইবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনানীবৃন্দের বিচারকার্য্য সুরু করার ফলেও সেনা-বিভাগের ভারতীয়গণের মধ্যে প্রবল অসন্তোষের সঞ্চার হয়।

নৌ-শিক্ষার্থীরা তাহাদের বিবিধ অভাব-অভিযোগের বিষয় প্রথমে কর্তৃপক্ষের গোচর করে, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় না। কোনও ব্যবস্থাবলম্বনের চেষ্টামাত্র না করিয়া কর্তৃপক্ষ উহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ভারতীয় নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি ভাইস-এ্যাড্মিরাল গডফ্রে যখন বোম্বাই পোতাশ্রয়ে "তলোয়ার" নামক জাহাজটি পরিদর্শন করিতে যান, তখন পি-সি-দত্ত নামক জনৈক টেলিগ্রাফিষ্ট জাহাজের দেওয়ালে "ভারত-ছাড়" "জয় হিন্দ" প্রভৃতি লিখিয়া রাখেন। এই অপরাধের জন্য পি-সি-দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিদ্রোহের প্রসার

কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিলে পি-সি-দত্তের আচরণের মধ্যেই নৌ-শিক্ষার্থিগণের মনোভাবের পরিবর্ত্তন অনুধাবন করিতে পারিতেন। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের পাকা বনিয়াদে যে ঘুণ ধরিয়াছে—সাধারণ ভারতবাসী-দের "ভারত-ছাড়" দাবী যে সমর-বিভাগের ভারতীয়গণেরও দাবীতে দাঁড়াইয়াছে—তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহারা চেষ্টা করিলেন না। চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদীসুলভ মনোভাব লইয়াই তাঁহারা ঘটনাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। ফল যাহা হইবার তাহাই হইল—রুদ্ধ রোষ প্রথমে ধর্ম্মঘটের আকারে, পরে প্রচণ্ড বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করিল।

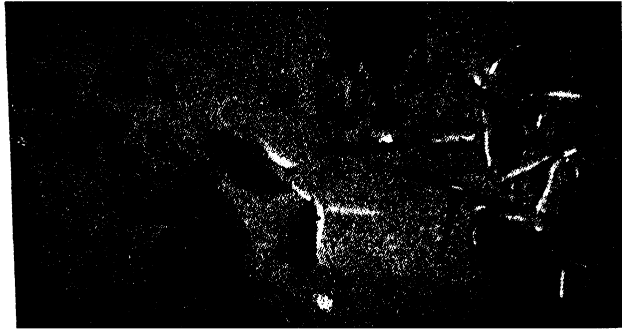
"তলোয়ার" জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্ম্মঘট প্রথম সুরু হইল ১৮ই ফেব্রুয়ারি হইতে। প্রায় ১১০০ নৌ-শিক্ষার্থী এই ধর্ম্মঘটে অংশ গ্রহণ করিল।

অসন্তোষ দ্রুত বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। "কলাবতী," "আউধ," "নাসিক" ও "নিলাম" জাহাজও পরের দিনই যোগদান করিল এই ধর্ম্মঘটে। ইহাতে ধর্ম্মঘটী নৌ-সৈন্য ও নৌ-শিক্ষার্থিগণের সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় ২০,০০০। ইহার পর ক্রমশঃ "আকবর," "মাচলিমার," "ফিরোজ" প্রভৃতি জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীরা এবং বিভিন্ন ডকের শ্রমিকরাও ধর্ম্মঘটে যোগদান করার ফলে ধর্ম্মঘটীদের শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। বোম্বাই শহরের রাজপথে ধর্ম্মঘটীদের এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইল। যে সকল লরি তাহাদের দখলে ছিল, সেগুলির উপরে কংগ্রেস ও লীগের পতাকা এবং লালঝাণ্ডা উড়াইয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হইল। বিক্ষুব্ধ ধর্ম্মঘটীরা যে সর্ব্বসময়ই শান্তিপূর্ণ রহিল, তাহা নহে। কোথাও কোথাও তাহারা ইংরাজ-সৈনিক অথবা পুলিশ-অফিসারদিগকে প্রহার করিতেও দ্বিধা করিল না। কতকগুলি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানও তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইল। ধর্ম্মঘটীদের মধ্যে কোনও শৃঙ্খলাই বজায় রহিল না। ২১শে তারিখের মধ্যে বোম্বাই পোতাশ্রয়ের প্রায় কুড়িখানি জাহাজ বিদ্রোহীদের দখলে চলিয়া গেল—এমন কি, প্রধান সেনাপতি স্বয়ং যে জাহাজখানিতে থাকেন, সেই ফ্লাগসিপ "নর্ম্মদা" পর্য্যন্ত বাদ পড়িল না। সবগুলি জাহাজের উপরই বৃটিশ পতাকার পরিবর্ত্তে কংগ্রেস ও লীগের পতাকা শোভা পাইতে লাগিল।

নৌ-বিদ্রোহ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বাই শহরের অধিবাসীরাও চঞ্চল হইয়া উঠিল। ধর্ম্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নাগরিকগণ ক্ষিপ্ত হইয়া বোম্বাইয়ের গিরগাঁও ও কলবাদেবী অঞ্চলে ট্রাম-বাস ভাঙ্গিয়া আগুন

ধরাইয়া দিতে লাগিল, সরকারী অফিস প্রভৃতি আক্রমণ ও লুঠ করিতে লাগিল, বৃটিশ সৈন্য ও পুলিশের সহিত লড়াই করিবার জন্য স্থানে স্থানে ব্যারিকেড রচনা করিল। সমগ্র বোম্বাই শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়ায় পূর্ণমাত্রায় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ কবিতে লাগিল। পুলিশ ও সৈন্যগণ বিভিন্ন স্থানে বহুবার গুলি চালাইল।

নৌ-ধর্ম্মঘটীদেব প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনেব জন্য বোম্বাইয়েব মেরিন-ড্রাইভ ও আন্ধেরী এলাকাব ভারতীব বৈমানিকগণও ধর্ম্মঘট সুরু করিল।



নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাই-এ গণ-বিক্ষোভকালে মিলিটারির গুলিতে নিহত কয়েকজন

বাংলায় কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত বেহালার নৌ-শিক্ষার্থীরা, মাঝেরহাটের নৌ-সৈন্যগণ এবং "হুগলী" জাহাজের নৌ-শিক্ষার্থীরাও ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিল। মাদ্রাজে "আদিয়ার" রণপোতের নৌ-সৈন্যেরাও কাজ বন্ধ করিয়া দিল। বিদ্রোহ কিন্তু প্রবল আকারে দেখা দিল করাচীর বন্দরে। সেখানকার "হিমালয়," "বাহাদুর," "চমক" এবং "হিন্দুস্থান" প্রভৃতি জাহাজ বিদ্রোহে যোগদান করিল এবং তাহাদের নেতৃত্ব করিতে লাগিল

"হিন্দুস্থান"। "হিন্দুস্থান" জাহাজের নৌ-সৈন্যেরা একেবারে চরম-পত্র দিয়া বসিল। তাহারা সোজাসুজি জানাইয়া দিল যে, সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার মধ্যে তাহাদের দাবী স্বীকার করিয়া না লইলে তাহারা সৈন্যদের উপর গুলি চালাইবে। ইহার পর সামরিক পুলিশ "হিন্দুস্থান"-এর উপর গুলিবর্ষণ করিল—"হিন্দুস্থান" তাহার প্রত্যুত্তর দিল দুইটি কামান হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া। সিগন্যালের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া "হিন্দুস্থান" করাচীর অন্যান্য বিদ্রোহী জাহাজগুলিকে আবশ্যক নির্দ্দেশাদি দান করিতে লাগিল।

আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভারতীয় সৈন্য-বিভাগে যে ভাঙ্গন ধরাইয়াছিল, নৌ-বিদ্রোহে তাহা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিল। সামরিক সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগে ভারতীয়গণের যে ঐকান্তিক আনুগত্যের উপর বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় ছিল, ইংরাজ কূটনীতিবিদ্ ও সমরনীতি-বিদ্গণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাহা আর বিন্দুমাত্র নির্ভরযোগ্য নহে। যে বিদ্রোহ নৌ-বিভাগে সুরু হইয়াছে, যে কোন মুহূর্ত্তে অন্যান্য বিভাগেও তাহার সংক্রমণ সংঘটিত হইতে পারে। অসন্তুষ্ট জনসমষ্টি, বিরুদ্ধ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বিদ্রোহী সৈন্যদল লইয়া তাঁহারা বারুদের স্তূপে বসিয়া আছেন—যে কোনও মুহূর্ত্তে বিস্ফোরণ আরও ভয়াবহরূপে প্রচণ্ড হইতে পারে। অতএব সত্য সত্যই ভারত হইতে বৃটিশ-সিংহের সসম্মানে প্রস্থানের সময় সমাগত হইয়াছে। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্বন্ধে তখনও কর্ত্তৃপক্ষের মনে যেটুকু ইতস্ততঃ ভাব ছিল, নৌ-বিদ্রোহ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা দূরীভূত করিয়া বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইল।

ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে শ্রমিক-সরকারের ঘোষণা

নৌ-বিদ্রোহ সুরু হওয়ার একদিন পরেই ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি বিলাতের শ্রমিক-গভর্ণমেন্ট ভারত সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা

করিলেন। তাহাতে বলা হইল যে, ভারতে শীঘ্রই এক মন্ত্রি-মিশন প্রেরিত হইবে এবং ভারত যাহাতে দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারা ভারতের নূতন শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন।

কয়েকদিন যাবৎ নৌ-সৈন্যগণ ক্যাস্‌ল ব্যারাকের মধ্যে ঘাঁটি করিয়া বৃটিশ সৈন্যগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে রত রহিল। ব্যারাকের অভ্যন্তরস্থ অস্ত্রাগারটি রহিল তাহাদেরই দখলে। ২১শে তারিখে রাত্রে ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এ্যাটলি কমন্স সভায় এক বিবৃতি দিয়া জানাইলেন যে, ঘটনাকে আয়ত্তে আনিবার জন্য বৃটিশ নৌ-বহরের একটা বড় দল বোম্বাই বন্দর অভিমুখে ইতিমধ্যেই যাত্রা করিয়াছে। নয়াদিল্লীর প্রধান-কেন্দ্র হইতেও ঘোষণা করা হইল, শক্তিশালী নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনী বোম্বাই, পুণা ও করাচীতে প্রেরিত হইয়াছে। ভারতীয় নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি ভাইস্‌-এ্যাডমিরাল গডফ্রে ঐ ২১শে তারিখেই বোম্বাই বেতার-কেন্দ্র হইতে নৌ-বিদ্রোহীদের উদ্দেশে এক ভাষণে জানাইলেন, বিদ্রোহীদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে এবং ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি পূরণ করারও চেষ্টা করা হইবে—কিন্তু বিদ্রোহীদিগকে করিতে হইবে বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ। তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন, গভর্ণমেণ্টের শক্তি অল্প নহে এবং প্রয়োজন হইলে সমগ্র শক্তি বিদ্রোহ-দমনে নিয়োজিত হইবে; এমন কি, সেজন্য প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের গৌরবের নৌ-বহরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতেও তাঁহারা দ্বিধা করিবেন না।

২১শে ফেব্রুয়ারি রাত্রেই ভারতীয় নৌ-বহরের একটা দল গিয়া বোম্বাই বন্দরে প্রহরায় নিযুক্ত হইল এবং কয়েকখানি জঙ্গী ও বোমারু বিমান উপর হইতে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালাইতে লাগিল। উভয়-পক্ষ হইতেই সারা রাত্রি গুলি ও গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল।

বোম্বাই শহরের অবস্থা আরও চরমে উঠিল। ২২শে তারিখে জনসাধারণ কতকগুলি অঞ্চলে এতই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল যে, পুলিশ ও মিলিটারি নানা স্থানে বহুবার গুলি চালনা করিল। সেদিনের গুলিবর্ষণে নিহত হইল প্রায় ৬০জন এবং আহত হইল প্রায় ৬০০ ব্যক্তি। জনসাধারণ সেদিন আন্দাজ ৪০খানি সামরিক লরি আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিল, ১২টি ডাকঘর ও ৩০টি র‍্যাশন দোকান লুঠ করিল এবং ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের ৩টি শাখা আক্রমণ করিয়া জিনিষ-পত্র ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা এতই প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল যে, কয়েক স্থলে মিলিটারি ও পুলিশের সহিত জনতার রীতিমত লড়াই হইয়া গেল। সরকারী পক্ষে নিহত হইল একজন কনষ্টেবল এবং আহত হইল ৯০জন কনষ্টেবল এবং ৩৭জন অফিসার।

বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি

বেতার মারফত নৌ-সেনাপতির ভীতি-প্রদর্শনে কোনও ফল ফলিল না। ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় ধর্ম্মঘট কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ জাতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমদাস ত্রিকমদাস, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জনাব মহম্মদ আলি জিন্না প্রভৃতি নেতাগণ বিদ্রোহীদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া শান্তির জন্য আবেদন জানাইলেন। সর্দ্দার প্যাটেল আরও জানাইলেন যে, নৌ-সৈন্যগণের অভাব-অভিযোগ পূরণের ব্যাপারে এবং তাহারা যাহাতে শাস্তি না পায় সে বিষয়ে কংগ্রেস যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

ইহার পর ২২শে ফেব্রুয়ারি রাত্রে "তলোয়ার" জাহাজে কেন্দ্রীয় ধর্ম্মঘট কমিটির যে অধিবেশন হইল, তাহাতে জাতীয় নেতৃবৃন্দের উপদেশ ও আবেদন অনুযায়ী বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করারই সিদ্ধান্ত গৃহীত

হইল। পরদিন ভোর ৬টা ১৩ মিনিটের সময় আত্মসমর্পণের নির্দেশমূলক সাঙ্কেতিক বার্তা বিদ্রোহী ঘাঁটিগুলিতে প্রেরণ করা হইল। বিভিন্ন ঘাঁটির বিদ্রোহী নৌ-সৈন্যগণ এবং জাহাজগুলি ইহার পর একে একে আত্মসমর্পণ করিল। করাচীতে ইহার একদিন পূর্ব্বেই বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে। ২২শে তারিখে উভয়পক্ষে প্রবলভাবে গোলাগুলি বিনিময়ের পর বৃটিশ ছত্রীবাহিনীর আক্রমণে নিরুপায় হইয়া সকাল ১১টা ১৫মিনিট সময়ে "হিন্দুস্থান" এবং অন্যান্য জাহাজ আত্মসমর্পণ করে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর নৌ-বিদ্রোহের মত এতবড় বিদ্রোহ সমরবিভাগে আর ঘটে নাই। পতনশীল বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি ইহার দ্বারা যেন কম্পিত হইয়া উঠিল।

আমাদের স্বাধীনতা

সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয় ডঙ্ক,
এলো মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গ-তোরণ যত
ধূলিতলে হ'য়ে গেল ভগ্ন।

—রবীন্দ্রনাথ

মন্ত্রি-মিশন

১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ্চ ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এ্যাটলি ভারত সম্পর্কে আর একটি ঘোষণা করিলেন। উহাতে তিনি জানাইলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহকে আর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়গুলির অগ্রগতি ব্যাহত করিতে দেওয়া হইবে না। মন্ত্রি-মিশন প্রেরণ সম্পর্কে তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষ যাহাতে দ্রুত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্যই তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ভারতে গমন করিতেছেন। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, ভারতবাসীদের দ্বারাই তাহা স্থিরীকৃত হইবে। তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, ভারতের জনগণ সত্বর এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিবার অধিকার তিনি স্বীকার করিলেন এবং যথাসম্ভব দ্রুত ও সহজভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

ইহার পর মন্ত্রি-মিশনের তিনজন সদস্য—ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য-সচিব সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ এবং নৌ-সচিব মিঃ এ-ভি-আলেকজাণ্ডার—২৩শে মার্চ্চ করাচীতে আসিয়া পৌছাইলেন। মিশনের নেতা ছিলেন লর্ড পেথিক লরেন্স। ভারতে আসিয়াই মিশনকে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সম্পর্কীয় মিঃ এ্যাটলির ঘোষণার ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইল। উহা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁহারা বলিলেন যে, উক্ত ঘোষণায় মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করা হয় নাই; অর্থাৎ তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ দাঁড়াইল যে, ভারতকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিচার করিলে যে সব এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সকল স্থানে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবেই পরিগণিত হইবেন। এইভাবে ভারতকে অখণ্ডভাবে বিচার না করিয়া মুসলমান-গণকে সমগ্র ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচিত হওয়ার

আশঙ্কা হইতে মুক্ত করা হইল। ইহার পূর্ব্বে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল একবার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভৌগোলিক, সামরিক এবং অর্থ-নৈতিক দিক দিযা ভারত অখণ্ড—ইহার উপর পাকিস্তানী-অস্ত্রোপচার চলিবে না। মন্ত্রি-মিশনের ব্যাখ্যায কিন্তু পাকিস্তানের আভাষই যেন উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

ভারতে উপস্থিত হইযা বিভিন্ন সম্প্রদায এবং দলকে তাঁহাদের বক্তব্য এবং প্রস্তাবসমূহ মন্ত্রি-মিশনের নিকট উপস্থাপিত করিবার জন্য মিশন আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সহিত মন্ত্রিত্রয আলাপ-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। আলোচনার প্রথম পর্য্যায শেষ করিযা তাঁহারা বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে কযেক দিনের জন্য ১৯শে এপ্রিল তারিখে কাশ্মীরে গমন করিলেন। তাঁহাদের কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ৫ই মে হইতে মন্ত্রি-মিশনের সদস্যগণ, বড়লাট এবং কংগ্রেস ও লীগনেতৃবৃন্দের ত্রিদলীয় বৈঠক সুরু হইল সিমলায; কিন্তু মুস্‌লিম লীগের পাকিস্তান দাবী এবং কংগ্রেসের অখণ্ড-ভারত দাবীর টানা-হেঁচড়ায় ১২ই মে সন্ধ্যায় বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল।

মন্ত্রি-মিশনের সহিত আলাপ-আলোচনায প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোনও মীমাংসা সম্ভব না হইলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শ্রমিক-গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে; সুতরাং বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেলেও মন্ত্রি-মিশনের কার্য্য শেষ হইল না। উভয় দলের মধ্যে কোনও মীমাংসা সম্ভব না হওয়ায় এক বিবৃতি মারফত বড়লাট এবং মন্ত্রিত্রয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় সকল উদ্যোগ শেষ হইল না; পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শীঘ্রই এক ঘোষণা করা হইবে।

মন্ত্রি-মিশনের পরিকল্পনা

সেই ঘোষণা প্রকাশিত হইল ১৬ই মে। উহাতে গণ-পরিষদ গঠন এবং ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় রূপ সম্বন্ধে সুপারিশের আকারে এক পরিকল্পনা প্রচারিত হইল। পরিকল্পনার দুইটি অংশ ছিল—একটি দীর্ঘমেয়াদী ও অপরটি স্বল্পমেয়াদী। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা এবং যানবাহন ব্যতীত অপর সমুদয় ক্ষমতা প্রাদেশিক ও দেশীয়রাজ্য গভর্ণমেণ্টসমূহের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বৃটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যের সমবায়ে এক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হইল। পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যানবাহনের পুরাপুরি কর্ত্তৃত্ব কেবল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হস্তে থাকিবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের সদস্যগণ কর্ত্তৃক সাম্প্রদায়িক অনুপাতে একক হস্তান্তর-যোগ্য ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে প্রতি দশ লক্ষে একজন হিসাবে মোট ৩৮৫ জন সদস্য লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক শাসনতন্ত্র-রচনাকারী গণ-পরিষদ গঠিত হইবে। ৩৮৫ জন সদস্যের মধ্যে বৃটিশ-ভারত হইতে থাকিবেন ২৯২ জন এবং দেশীয় রাজ্য হইতে ৯৩ জন। মুস্‌লিম লীগের পাকিস্তান দাবী আংশিকভাবে পূরণের জন্য বৃটিশ-ভারতের প্রদেশগুলিকে এভাবে তিনটি মণ্ডলীতে ভাগ করার ব্যবস্থা হইল, যাহাতে মুসলমানগণ যে যে অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান গঠন করিতে চাহেন, সেই সেই অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসন-তন্ত্র প্রণয়নে তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে, গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই ক, খ ও গ প্রদেশ-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিনিধিবর্গ পরিকল্পনায় উল্লিখিতমত তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের স্ব স্ব মণ্ডলীর অন্তর্গত প্রদেশসমূহের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন এবং ঐ সমুদয় প্রদেশ লইয়া

মণ্ডলী গঠিত হইবে কি না এবং হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ের ভার ঐ মণ্ডলী গ্রহণ করিবে, তাহা স্থির করিবেন। নূতন শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পর কোনও প্রদেশ ইচ্ছা করিলে উহা যে মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত আছে, তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে। আলোচনা-কমিটির মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে এবং যোগদানের জন্য সর্ত্ত স্থির করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল।

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় বলা হইল, যে সকল প্রধান দল উপরোক্ত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা মানিয়া লইবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী কালের জন্য ভারতগভর্ণমেণ্ট পুনর্গঠিত হইবে।

২৯শে জুন তারিখে মন্ত্রি-মিশনের সদস্যগণ ভারত ত্যাগ করিলেন।

পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগ

মন্ত্রি-মিশনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কংগ্রেস সর্ত্তসাপেক্ষভাবে দীর্ঘ-মেয়াদী প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন—কিন্তু স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাব স্বীকার করিয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী-সরকার গঠনে রাজি হইলেন না। মুস্‌লিম লীগ প্রথমে উভয় প্রস্তাবই গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট একমাত্র তাঁহাদের লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী-সরকার গঠনে উদ্যোগী না হওয়ায় এবং দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনায় মণ্ডলী-গঠন প্রভৃতির ব্যাখ্যা লইয়া মতান্তরের ফলে তাঁহারা পরে আবার বাঁকিয়া বসিলেন। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে প্রদেশসমূহ হইতে গণ-পরিষদের সদস্য-নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইলে দেখা গেল যে, উহাতে কংগ্রেস দলের ২১১ জন এবং লীগের মাত্র ৭৩জন সদস্য স্থান পাইয়াছেন; সুতরাং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা (জনাব জিন্নার ভাষায় Brute Majority) থাকার ফলে গণ-পরিষদে কংগ্রেসের প্রভাব বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তখন ২৯শে জুলাই তারিখের এক অধিবেশনে লীগ কাউন্সিল মন্ত্রি-

মিশনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন, সার্ব্বভৌম পাকিস্তানের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ১৬ই আগষ্ট তারিখটি প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম-দিবস হিসাবে পালন করা স্থির হইল।

অন্তর্ব্বর্ত্তী-সরকার—লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

ইংরাজ-কর্তৃপক্ষের সহিত একটা বুঝা-পড়ার ফলে পণ্ডিত নেহেরু ইতিমধ্যে অন্তর্ব্বর্ত্তী-সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রিত হইলেন। লীগও যাহাতে অন্তর্ব্বর্ত্তী-সরকারে যোগদান করেন, পণ্ডিত নেহেরু তজ্জন্য জনাব মহম্মদ আলি জিন্নার সহিত বোম্বাই নগরীতে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ-আলোচনা চালাইলেন—কিন্তু লীগের মনোভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হইল না। এদিকে ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম-দিবসে নানা স্থানে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হইল—তন্মধ্যে কলিকাতার দাঙ্গাই হইল ভয়াবহ। উহার পর হইতেই অদ্যাপি নানাস্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিয়া আসিতেছে।

পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে ২রা সেপ্টেম্বর অন্তর্ব্বর্ত্তী-সরকার গঠিত হইল। ইহার পর বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সহিত লীগ-সভাপতি জনাব জিন্নার গোপন আলোচনার ফলে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা মানিয়া না লইলেও লীগের পাঁচ জন সদস্যকে ২৬শে অক্টোবর অন্তর্ব্বর্ত্তী-সরকারে গ্রহণ করা হইল; কিন্তু ইহার ফল শুভ হইল না। দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের আদর্শগত পার্থক্যের জন্য সদস্যগণের মধ্যে মত-বিরোধ এবং অসহযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করিল।

গণ-পরিষদ

৯ই ডিসেম্বর হইতে গণ-পরিষদের অধিবেশন সুরু হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল; কিন্তু অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে থাকিয়াও লীগের উক্ত গণ-পরিষদ

বর্জ্জন করার সিদ্ধান্তে উদ্ভব হইল এক জটিল পরিস্থিতির। তখন লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দকে লইয়া মিঃ এ্যাটলির আমন্ত্রণে আলোচনার জন্য লণ্ডনে গমন করিলেন। কংগ্রেসের তরফে গেলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং লীগের তরফে জনাব জিন্না। আলোচনায় কিছুই মীমাংসা হইল না। দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা সম্পর্কে লীগের ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়া মিঃ এ্যাট্‌লি ৬ই ডিসেম্বর এক বিবৃতি দিলেও এবং কংগ্রেস সেই ব্যাখ্যাই মানিয়া লইতে সম্মত হইলেও লীগ গণ-পরিষদে যোগদান করিতে রাজি হইল না। লীগ সদস্যগণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ৯ই ডিসেম্বর কিন্তু গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসিল।

দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের অভিপ্রায় ঘোষণা

১৯৪৭সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি মিঃ এ্যাট্‌লি ভারত সম্পর্কে কমন্স-সভায় এক চূড়ান্ত ঘোষণা করিলেন। উহাতে বড়লাট হিসাবে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগ ঘোষণা করা হইল এবং বলা হইল যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত-শাসনের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ অবিলম্বেই আরম্ভ করা হইবে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ যাহাতে ঐ সময়ের মধ্যে ক্ষমতা গ্রহণের উপযুক্ত হন, তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হইতে থাকিবে। সমগ্র বৃটিশ-ভারত উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐকামত হইয়া ক্ষমতা গ্রহণে ইচ্ছুক না হইলে, কাহার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে, সে বিষয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট চিন্তা করিয়া দেখিবেন। তখন বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার বা অঞ্চল বিশেষে প্রাদেশিক সরকার অথবা ভারতের স্বার্থ ও ন্যায়-পরায়ণতার দিক হইতে অপর কাহার হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়।

বস্তুতঃ এই ঘোষণার দ্বারা মন্ত্রি-মিশনের পরিকল্পনা কার্য্যতঃ পরিত্যাগ করা হইল।

ভারত-বিভক্তি

ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব লইয়া মার্চ্চ মাসের শেষ দিকে বড়লাট হইয়া আসিলেন লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন। কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার পর তাঁহাদের সম্মতিতে তিনি ৩রা জুন তারিখে ভারত-বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক উহা গৃহীত হইল। ইহার ফলে বাংলা ও পাঞ্জাবও বিভক্ত হইল—আসামের শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট গ্রহণের পর উহা পূর্ব্ববঙ্গের সহিত যুক্ত হইল। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশেও গণ-ভোট লইয়া উহার পাকিস্তানে যোগদান সাব্যস্ত হইল।

ভারত-স্বাধীনতা আইন—১৯৪৭

১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মহাসভায় হাউস-অফ-কমন্স-এ 'ভারত-স্বাধীনতা আইন' উত্থাপন করা হয় এবং আলোচনান্তে অতি দ্রুত ১৪ই জুলাই তাহা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়। বিলটি লর্ড-সভায় অনুমোদিত হয় ১৬ই জুলাই তারিখে। রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ ১৮ই জুলাই বিলে সম্মতি দান করিলে উহা আইনে পরিণত হয়।

উক্ত আইন অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বৃটিশ-শাসিত ভারতকে দুই ভাগ করিয়া ভারত ও পাকিস্তান নামে স্বয়ং-শাসিত দুইটি নূতন ডোমিনিয়ন গঠিত হয় এবং উক্ত দুইটি ডোমিনিয়নের উপর বৃটিশ মন্ত্রি-সভার সর্ব্ববিধ কর্ত্তৃত্ব লোপ পায়। দেশীয় রাজ্যগুলির উপরও ইংলণ্ডেশ্বরের সার্ব্বভৌমত্বের অবসান ঘটে এবং অভিপ্রায়, সংস্কৃতি ও নৈকট্য অনুযায়ী ঐগুলিকে দুইটি ডোমিনিয়নের যে কোন

একটিতে যোগদানের অধিকার ও পরামর্শ দেওয়া হয়। পাকিস্তানের জন্য ব্যবস্থা হয় স্বতন্ত্র গণ-পরিষদের।

স্বাধীন সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

ভারতীয় গণ-পরিষদ শাসন-তন্ত্র প্রণয়নের কার্য্য চালাইয়া যাইতে থাকেন। ইতিমধ্যে ভারত-রাষ্ট্রের সংলগ্ন দেশীয় রাজ্যগুলিও একে একে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণ-পরিষদের শাসনতন্ত্র-প্রণয়ন কার্য্য সমাপ্ত হইয়া ঐদিন উহা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়। গণ-পরিষদে রচিত শাসন-তন্ত্র অনুযায়ী ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি ভারতে মহান্ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং ভারত স্বেচ্ছায় উপনিবেশ-গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিলেও ইংলণ্ডের রাজার প্রতি তাহার সর্ব্ববিধ আনুগত্যের সমাপ্তি ঘটিয়াছে।

আমাদের স্বাধীনতা-লাভের ইহাই ইতিহাস। যাঁহাদের বিপুল স্বার্থত্যাগ এবং আত্মবিসর্জ্জনের উপর এই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা—তাঁহারা চিরদিন পূজিত হউন।

সমাপ্ত



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬